রামনাথ বিশ্বাসের ভ্রমণকাহিনীগুলি ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে এটাও যেমন ঠিক—তেমনি তা সংখ্যাতেও বাড়ছে, অর্থাৎ তাদের আয়তন অনেক পাঠকের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। সেই জন্যই বোধ হয়, বহুদিন ধরে বহু পাঠক আমাদের অনুরোধ করছেন যে, সারা পৃথিবীরই এক চাউনি ক'রে আভাস পাওয়া যায় এমন একখানা বই বার করতে। সেই চাহিদা মেটাবার জন্যই বিশ্বাস মহাশয়ের লেখা বইগুলি থেকে বাছাই করা অংশ নিয়ে এই সঞ্চয়নগ্রন্থটি বার করা হ'ল। এতে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই একটা ছবি পাবেন পাঠকরা। অবশ্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি, এমন দু-একটি লেখাও এর মধ্যে আছে। ইতি—

বিনীত

প্রকাশক

এই লেখকের

বিদ্রোহী বলকান

জার্মানী ও মধ্য ইউরোপ

ভয়ঙ্কর আফ্রিকা

অন্ধকারের আফ্রিকা

আজকের আমেরিকা

দ্বিচক্রে কোরিয়া ভ্রমণ

প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তি

মরণবিজয়ী চীন

লাল চীন

তরুণ-তুর্কী

আফগানিস্থান ভ্রমণ

জুযুৎসু জাপান

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

ভবঘুরের গল্পের ঝুলি

বেদুইনের দেশে

আফগানিস্থান

আফগানিস্থান ও তার বাসিন্দা সম্বন্ধে আমাদের মনে অনেক উদ্ভট ধারণা আছে। আমাদের ধারণা আফগানিস্থান দেশটা যেমন কর্কশ ও পর্বতসংকুল, তেমনি তার অধিবাসীরাও বুঝি সব দয়ামায়াহীন অর্থলোভী এবং হিংস্র। বস্তুত তা নয়। আফগানিস্থান সম্বন্ধে এ প্রকার বিকৃত ধারণা পোষণ করার মত কোন হেতু আমি পাইনি।

লাহোর, রাওলপিণ্ডি এবং পেশোয়ারে আমাকেও সেরূপ গল্প শোনানো হয়েছিল, কিন্তু আমি তাতে কান দিইনি। তারপর যখন আফগানিস্থানে গেলাম তখন দেখলাম কাবুলিরাও আমাদের মতই মানুষ, এবং তাদের দেশটাও আমাদের মতই 'মাটির'।

কলকাতা হতে পেশোয়ারের পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি, শুধু গুজরাত শহরে একদিন সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে বুঝেছিলাম শরীরের দুর্বলতাই এই পতনের একমাত্র কারণ। রোড-পুলিশ দয়া করে আমাকে উঠিয়ে পাশেই আর্যসমাজীদের পরিচালিত একটি মেয়েদের স্কুলে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, মাতৃজাতির একজনও এই হতভাগ্যের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হননি। এমন দুর্ঘটনা যদি ইউরোপের কোথাও ঘটত তবে মায়ের জাতই সর্বপ্রথম আমার সাহায্যার্থ এগিয়ে আসতেন।

পেশোয়ার হ'তে নানা জায়গা ঘুরে আমি কাবুলে উপস্থিত হই। সমতল ভূমির উপর অবস্থিত নয়, কাবুল ক্রমেই পাহাড়ের গা বেয়ে পরের দিকে উঠছে। কাবুলিরা সমতল ভূমিতে বাস করা পছন্দ করে না,

সেজন্যই বোধ হয় শহরের পরিসর ক্রমে উঁচু হতে আরও উচ্চে
চলেছে।

কাবুল পুরাতন শহর। শুধু পুরাতন বললেই হবে না।
পাঠান আমলের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি আমরা বৌদ্ধযুগের কথা বা
কুলাবে না। আর্য সভ্যতার কথা পেছনে রেখে আরও এক
অতীতের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখতে পাওয়া যায় প্রাগৈতিহ
যুগের দ্রাবিড় জাতের সভ্যতার নিদর্শন। সেই প্রাগার্য সভ্যতার নিদ
এখনও এই শহরের বহু স্থানে বর্তমান রয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ, ব
পুরাতন শিবমন্দিরগুলি এখনও দাঁড়িয়ে আছে পুরাতনের অস্তিত্বের সাক্ষ
দেবার জন্য। আফগানিস্থান একদিন যে পুরাতত্ত্ববিদ এবং ঐতিহাসিকদে
মক্কা হয়ে দাঁড়াবে তা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

কাবুল ছোট শহর। সাইকেলে চার ঘণ্টায় সমুদয় শহর, মায়
অলিগলি পর্যন্ত বেড়িয়ে আসা যায়। শহরের লোকসংখ্যা কত হবে
আমি জানবার চেষ্টা করিনি। তবে আমাদের দেশের শহরগুলিতে যে
পঙ্গপালের মত মানুষের ভিড় পথে-ঘাটে দেখতে পাওয়া যায়, কা
সেরূপ কখনও দেখিনি, এমন কি ঈদের দিনেও নয়।

পথে চলবার সময় আমাকে যেমন সবাই দেখছিল, আমিও
পদচারীদের লক্ষ্য করেই পথ চলছিলাম। পথে নানারূপ লোকই
পেয়েছিলাম কিন্তু মোংগল জাতীয় কয়েকটি লোককে দীনদরিদ্র
গাধার পিঠে জ্বালানি কাঠ বোঝাই করে বিক্রয়ার্থ বাজারে যেতে
মনে বেশ কৌতূহল জেগেছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম, পথের মাঝে
কোনরূপ চিৎকার করে না। বাড়ি হতে যদি কেউ ওদের দেখে জ্বা
কাঠ ক্রয় করার জন্য ডাকে তবেই তারা দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়,
সোজা জ্বালানি কাঠের বাজারে গিয়ে একসঙ্গে সমুদয় কাঠ বিক্রি ক

আসে। পথের মাঝে আর একশ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায়, তারা হ'ল ইহুদী। ইহুদী পথের পাশে দাঁড়িয়ে জুতা বুরুশ করে এবং ছুরিতে শান দেয়। মনে হল এই দুটি কাজ করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করে। এই দুই শ্রেণীর লোক ছাড়া আরও অনেক ধরণের লোক পথে দেখলাম তবে ইউরোপীয়দের সংখ্যা খুব কমই দেখতে পেলাম। পথে অনেক ভিখিরিও চলেছিল। তারা কিন্তু আমাদের দেশের ভিখিরির মত পথিককে বিরক্ত করে না। কেউ যদি দয়া করে কিছু দেয় তবেই তারা হাত পেতে নেয়।

কাবুলের কালী-মন্দিরেই প্রথম যাব স্থির করেছিলাম। কালীমন্দিরে যাবার একমাত্র কারণ হল, সেখানে নাকি একটা সরাই বা ধর্মশালা আছে। ভেবেছিলাম ধর্মশালাতেই গিয়ে কয়েকদিন থাকি, তারপর টাকাকড়ি যোগাড় হলে হোটেলে যাব। পদচারীদের জিজ্ঞাসা করে কালী-বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়ে দরজার কড়া নাড়লাম। কয়েকবার কড়া নাড়তেই পূজারী দরজা খুলে দিলেন। লোকটিকে দেখে মনে হল তিনি মন্দিরে হয়তো কোন কারণে এসেছেন, পূজারী নন। লোকটির পোশাক মামুলী ধরণের পাঠানদের মতই ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে কিন্তু জানলাম তিনিই পূজারী। তখন আমিও তাঁকে আমার পরিচয় দিলাম। মুসাফিরখানার কথা জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এখানে পৃথক কোন ধর্মশালা নাই। পূজারী মন্দির-সংলগ্ন একটা ঘর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন যে, অতিথি কেউ এলে ঐ ঘরটাতেই জায়গা করে দেওয়া হয়। সারাদিন সাইকেল চালিয়ে বড়ই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, নতুন করে আস্তানা খোঁজার তখন আর উৎসাহ মোটেই ছিল না। কাজেই পূজারীর প্রস্তাব প্রত্যাখান করলাম না।

পূজারী আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই ঘরে চলে গেলেন। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘরের গড়ন, মন্দিরের নির্মাণ-কৌশল এসব ভাল করে

দেখতে লাগলাম। কতক্ষণ পর পূজারী ফিরে এসে আমাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন। আমি ঘরে গিয়ে প্রজ্বলিত সন্দলের কাছে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। আমাকে ঘরের ভেতর বসিয়ে রেখে পূজারী আবার বাইরে চলে গেলেন।

মন্দিরে তিন খানা মোটে ঘর। একটি উত্তরে, অপর দুটি পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিত। প্রত্যেক ঘরের বারান্দার সঙ্গেই পরস্পরের যোগাযোগ রয়েছে। শীতের দেশের ঘরগুলি এরূপ করেই তৈরী হয়ে থাকে। উত্তরের ঘরখানা কালী-মন্দির। পূর্ব দিকের ঘরে রান্না করা হয় এবং পশ্চিম দিকের ঘর অতিথির জন্য। ঠাকুর রান্নাঘরেই ঘুমোন বলে মনে হল। সন্দলের কাছে বেশীক্ষণ বসে থাকতে ভাল লাগল না, পাশেই একটা বড় বালিশ ছিল, তাতেই হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম জানি না, যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখলাম পূজারী আমার ভোজনের বন্দোবস্ত করছেন। ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো আমাকে বিছানার বাইরে বসে খেতে বলবেন, কিন্তু তা তিনি বলেন নি। বিছানার ওপর বসেই খেয়ে নিলাম। আফগানিস্থানে এঁটোর বালাই নেই। যত এঁটোর বালাই শুধু ভারতেই। পৃথিবীর আর কোথাও এঁটো বলে কিছু নেই। আমাদের দেশের জ্ঞানীগণ বলেন, এঁটো মেনে চলা ভাল, তাতে নাকি স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কিন্তু যে দেশের লোক অজ্ঞ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার দরুণ এবং সরকারের ঔদাসীন্যের ফলে নানা ভাবে স্বাস্থ্য হারাচ্ছে, তাদের মাঝে স্বাস্থ্যরক্ষার অজুহাতে এঁটোর গোঁড়ামিকে বজায় রাখার সার্থকতা কি তা বোঝা আমার পক্ষে শক্ত।

আহারের পর একবার কালীমূর্তিটি দেখতে গিয়েছিলাম। কালীমূর্তির কাছে নারায়ণের একটি বিগ্রহ রাখা হয়েছে। আমি যখন বিগ্রহগুলিকে মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছিলাম তখন নিশ্চয়ই পূজারী ভাবছিলেন

আমি একজন মহা ভক্ত। কিন্তু তিনি জানতেন না, আমি ভক্তির প্রেরণায় মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে থাকি নি, আমি দেখছিলাম তাদের গঠনপ্রণালী।

কতকদিন ধরে ক্রমাগত চলার ফলে শরীরটা নেতিয়ে পড়েছিল। তাই খেয়ে-দেয়েও আর বাইরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, সন্দলের কাছেই বসে আফগানিস্থানের ম্যাপখানা দেখতে লাগলাম।

বেলা বোধ হয় তখন ছ-টা। এরই মাঝে পূজারী তাঁর সহকারীসহ আমার কাছে এসে বললেন, রাত্রে আমাকে মন্দিরে থাকতে দেওয়া হবে না। আমি তাঁদের কথা শুনে আস্তে ধীরে বললাম, যে-পর্যন্ত আমার থাকার অন্য বন্দোবস্ত না হচ্ছে সে পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ব না এবং আমার অন্যত্র থাকার বন্দোবস্ত তাদেরই করতে হবে। আমার দৃঢ়তা দেখে পূজারী জন বাইরে চলে গেলেন। কতক্ষণ পর আবার যখন তাঁরা ফিরে এলেন খন তাঁদের সঙ্গে আরও একজন দীর্ঘকায় বৃদ্ধ লোক ছিলেন। বৃদ্ধ এসেই ামাকে নমস্কার করে বললেন—তিনি বিষ্ণু মন্দিরের পূজারী এবং তাঁর ন্দিরেই আমার রাত কাটাবার সুবন্দোবস্ত হয়েছে। আমি কোন কথা না বলে সাইকেলটা টেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গে চললাম।

আমাদের পথের বাঁদিকে রুশিয়ার কনসালের বাড়ি। কনসালের বাড়ির ওপর মস্তবড় একখানা আধুনিক রুশিয়ার পতাকা পত পত করে উড়ছিল। তারপরই ডানদিকে পড়ল জাপানী কনসালের বাড়ি। ছোট একটা সূর্য-মার্কা পুরাতন ময়লা কাপড় ঘরের দরজার কাছে ঝুলছিল। তারপরই শুরু হল উঁচু ভূমি। দুদিকে সারি দিয়ে মেটে ঘরগুলি দাঁড়িয়ে ছিল। প্রত্যেকটি ঘরের দরজা বন্ধ। পথে লোকের চলাচল নাই বললেই চলে।

মেটে ঘরের সারি দেখে দেখে কতক্ষণ চলার পর বিষ্ণু-মন্দিরের পূজারীর বাড়ির সামনে এলাম। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পূজারী দরজার কড়া নাড়লেন। দরজা খুলে দিল একটি যুবক। যুবকটিকে দেখে বেশ সরল বলে

মনে হল। পরে জানলাম এই যুবক পূজারীর কনিষ্ঠ ছেলে। ছেলেটির গালভরা হাসি দেখে আপনা হতেই তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হল এবং তারই সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করলাম।

বিষ্ণু-মন্দিরের পূজারী শ্রেণীতে সাহা—মানে বৈশ্য। এখানেও তিনখানা ঘর এবং সেই একই ধরণে তৈরী। বসবার ঘরে এসে দেখলাম আমার অপেক্ষায় অনেকগুলি লোক বসে আছে। তারা প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েই বোধ হয় বসে ছিল। একজন ব্রাহ্মণও সেখানে ছিলেন। তাঁর একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি তাঁর প্রতিটি বক্তব্য শেষ করে উপসংহারে বলতেন, যারা ধর্ম বজায় রেখে চলতে পারে না, তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করাই উচিত।

দিনের অবসান হয়ে রাত্রি এল। পরদিন প্রভাতে চা-পানের পর লক্ষ্য করলাম এখানকার পূজারীর মনও যেন আমার ওপর বিরূপ। তাঁর সে ভাবটি বুঝতে পেরে আমি তাঁকে বললাম, ঠাকুরমশায়, এখান হতে আমাকে তাড়াতে পারবেন না, আমি একমাস এখানে থাকব। খরচ যা লাগে তা দেব, কিন্তু এখান হতে চলে যাও, অথবা এখানে এক দিনের বেশি থাকবার নিয়ম নেই—এসব কথা বললেই, হয়তো আপনাকেই এখান থেকে তল্পীতল্পা গুটাতে হবে। এটা দেবমন্দির, সকল হিন্দুর অর্থ-সাহায্যে এটা তৈরী হয়েছে, আমার এতে অধিকার আছে। জানেন তো হিন্দুস্থানের অনেক হিন্দু-মন্দিরই সর্বজনীন হয়ে গেছে। আফগানিস্থানেও যদি আমি সেরূপ কিছু করতে প্রয়াসী হই তবে দরিদ্র হিন্দুরা নিশ্চয়ই আমার সহায় হবে। এরূপ অবস্থায় ভেতরের কথাটা আমাকে খুলে বলাই আপনার পক্ষে ভাল হবে। আমার অনুমান হয় আপনারা সরকারী হাঙ্গামাকে এড়াবার জন্যই এরূপ করছেন। তাই যদি হয় তবে আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়ে বলছি, সরকারের তরফ থেকে আপনার উপর কোন বিপদ আসবে না।

পূজারীর সঙ্গে আর কথা হল না। ঘরে বসে থাকতেও আর ইচ্ছা হচ্ছিল না, তাই শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। কাবুল শহরের বুকের উপর যে প্রসিদ্ধ রাজপথ আছে তার নাম আমি তখনও জানতাম না, এখনও জানি না। তবে পথটির প্রসিদ্ধির কারণ আমাকে জানতে হয়েছিল। এই পথের ওপর হোটেল কাবুল। কাবুল হোটেল বলা উচিত ছিল। কিন্তু পোস্ত ভাষার ওপর ইরানি ভাষার প্রভাব পড়াতে কাবুল হোটেল হয়ে গেছে হোটেল কাবুল।

মন্দির হতে বের হয়েই এক বৃদ্ধ পাঠানের দোকান থেকে এক প্যাকেট রুশীয় সিগারেট কিনলাম! দোকানী আমার মুখের দিকে একটু তাকাল, তারপর সিগারেট দিয়ে বিদায় করল। আর একটু এগিয়ে গিয়ে একটি চায়ের দোকান দেখতে পেলাম। আমার অভ্যাসই হল চায়ের দোকানে যাওয়া এবং সেখানে বসে নানারূপ সংবাদ সংগ্রহ করা। এই দোকানটি উচ্চ শ্রেণীর ইউরোপীয় ধরণের। সুন্দর এক একটি গোল টেবিলের চারপাশে ভেলভেট মোড়া সোফা। টেবিলের ওপর ছাইদান এবং দেশলাই ছাড়া আর কোন বস্তু নাই। ডিপ্লোমেটরা টেবিলের ওপর বাজে জিনিস কিছুই পছন্দ করেন না। সেজন্যই মনে হয়েছিল এটাও বোধ হয় ডিপ্লোমেটদেরই একটা আড্ডা হবে।

আফগানিস্থানে দু রকমের চা-এর প্রচলন আছে, যথা, ইংলিশ চা এবং "চায়"। দারজিলিং, সিংহল এবং আসাম হতে আফগানিস্থানে যে চা যায় তাকে ইংলিশ চা বলা হয়। ইংলিশ চা-তে দুধ এবং চিনির দরকার হয়। "চায়" আসে চীন দেশ থেকে। সেই পাতা গরম জলে ভিজিয়ে দিলেই ক্বাথ বের হয়ে আসে। সেই ক্বাথকেই বলে "চায়"। এই দোকানে "চায়"-এর প্রচলন ছিল না। আমি চা-এর আদেশ দিয়ে একটি সিগারেট ধরিয়েছি এমন সময় আমার গরিবানা পোষাক দেখে বয় এসে বললে,

হুজুর এখানের চায়ের দাম খুব বেশী এবং এখানে "চায়" বিক্রি হয় না। আমি বললাম, চায়ের যদি বেশি দাম হয় তবে কাফি নিয়ে এস, দু কাবুলির বেশি বোধ হয় হবে না। লোকটি বুঝল আমার কাছে টাকাপয়সা আছে। সে ফের বলল, চা আনব না কাফি আনব হুজুর? কাফিই নিয়ে এস—বলে পকেট হতে কতকগুলি কাগজ বের করে সে দিকে মন দিলাম। অনেক দিনের জমানো কথা ডায়েরিতে লিখে উঠতে পারিনি। এমন নিরিবিলি এবং এত আরামদায়ক স্থানে বসেই লিখতে ইচ্ছা হয়। আফগানিস্থানে কাফি মোটেই ব্যবহার হয় না, তাই বয় চা আনতেই বাধ্য হল। সে চা নিয়ে এলে, তার মুখের দিকে একটু ভাল করে তাকিয়ে বুঝলাম লোকটি পাঠান নয়, বিদেশী। ছদ্মবেশে এখানে আছে। পরে বুঝতে পেরেছিলাম এই লোকটি সত্যসত্যই পাঠান নয়, সে একজন শিক্ষিত ভারতবাসী। পরে এই লোকটির সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতে হবে সুতরাং এখন তার কথা থাক; যা বলতে যাচ্ছিলাম তাই বলি। এক কাপ চা খেয়ে আমার চায়ের পিপাসা মিটল না। ফের আর এক কাপ চা আনতে বলার পূর্বেই প্রথম কাপের দাম চুকিয়ে দিতে যাব এমন সময় বয় বলল, "এক সঙ্গে দিলেই হবে।" কথা কয়টি শুনে আশ্চর্য হলাম। একেবারে খাঁটি বাংলা ভাষা। একজন বাঙ্গালী এই সুদূর দেশে চায়ের দোকানে বয়ের কাজ করছে দেখে যদিও চমৎকৃত হলাম তথাপি মুখে কিছুই প্রকাশ করলাম না। বয় দ্বিতীয়বার চা নিয়ে এলে বললাম, এক প্যাকেট সিগারেট আনিয়ে দিতে পারেন? লোকটি হঠাৎ যেন আকাশ হতে পড়ল, তারপর বলল—"আপ ক্যা বোলা?" আমি বললাম, "হাম বলা ইদার মে সিগারেট মিলেগা?"

—জরুর জনাব, পয়সা দিজিয়ে—বলেই লোকটি হাত পাতল। পাঁচটি কাবুল মুদ্রা তার হাতে দিয়ে বললাম, এই নাও। লোকটি সিগারেট

নিয়ে এল এবং বাকি পয়সা ফিরিয়ে দিল।

চায়ের দোকান হতে বেরিয়ে আসার পর শুনলাম দুজন লোক হো হো করে হাসছে; যাকগে, বিদ্রূপের হাসি হাসল তো বয়েই গেল। এখন একবার বৈদেশিক সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে ভাল হয় ভেবে বেরিয়ে পড়লাম। অলিগলি পথ ধরে চলে যখন বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করলাম তখন ভাবলাম এখন আর বৈদেশিক সচিবের বাড়িতে গিয়ে দরকার নেই, চায়ের দোকানটাতেই গিয়ে আর এক পেয়ালা চা খেয়ে পুরোহিত মশায়ের আশ্রয়ে গিয়ে বিশ্রাম করি।

কিন্তু চায়ের দোকানের পথটার কোন হদিসই পেলাম না। শেষে পথচারীদের জিজ্ঞেস করে কাবুল হোটেলে এলাম। কাবুল হোটেল পূর্বোক্ত চায়ের দোকানের কাছেই। দ্বিতীয়বার আমাকে চায়ের দোকানে ফিরে আসতে দেখে ছদ্মবেশী বয় একটু থতমত খেয়ে গেল। আমি ইংলিশে বললাম, চা খেতে আমার বড়ই ভাল লাগে। এখানে আপনারাই সব চেয়ে সেরা চা প্রস্তুত করেন। আমাকে এখানে বারবার আসতে হবেই। আর এক কাপ চা দিন দয়া করে। বয় চা নিয়ে এল। চা পানান্তে আমি মন্দিরে ফিরে এলাম। পথে বার বার শুধু মনে পড়তে লাগল সেই কথাটি—"এক সঙ্গে দিলেই হবে।"

মন্দিরে এসে দেখলাম পূজারী আমার জন্যও রান্না করেছেন, কিন্তু তাঁর মনের কোণে ঝড় উঠেছে। সেই ঝড় কোন্ দিকে বইবে তিনিই জানেন। যাহোক, আমি হাত মুখ ধুয়ে বসলাম। রান্না হয়েছিল খিচুড়ি। খিচুড়িতে প্রচুর ঘি দেওয়া হয়েছিল। এদেশেও ঘি দরিদ্র লোকের ভাগ্যে জোটে না। ঘি খান ধনীর দল। বিষ্ণু মন্দিরের পূজারীও একজন ধনী লোক। তাঁর বাড়িতেও বস্তা বস্তা চাউল চিনি এবং টিন ভর্তি ঘি মজুত ছিল।

পূজারী ঠাকুর ভোজনের পূর্বে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, তারপর ধীরে ধীরে আঙ্গুলের সাহায্যে খেতে লাগলেন। অন্যান্যরাও সেরূপ ভাবে খেতে লাগল। শুধু আমি চামচের সাহায্যে খাওয়া সুরু করলাম। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পূজারী প্রত্যেকের থালা পরীক্ষা করে দেখলেন, খাদ্যের এক কণাও কারো থালাতে লেগে আছে কি না। পরিদর্শন হয়ে গেলে তিনি ভৃত্যকে থালাগুলি নিয়ে যেতে বললেন। চা তৈরীই ছিল। ভাত খাওয়ার পর চা খাওয়া হল। আহারাদির পালা শেষ হলে নাক ডাকিয়ে সবাই ঘুমাতে লাগলাম।

বিকাল বেলা স্থানীয় হিন্দু-প্রতিনিধি বলে কথিত একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। মুখ দেখলেই লোকটিকে খল প্রকৃতির মনে হয়। কায়দামাফিক নমস্কারের আদান-প্রদান সারা হলে প্রৌঢ় বললেন, আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি, কিন্তু বড়ই দায়ে পড়ে কয়েকটি কথা বলতে হচ্ছে, আপনি কথাগুলি মন দিয়ে শুনুন। এখানকার নিয়মমতে যে-কোন ভারতবাসী এদেশে আসুক, কাবুলে পৌছানোর পর তাদের প্রত্যেকেরই আমার কাছে রিপোর্ট করতে হয়, আপনি তা করেননি আমার এখন কর্তব্য হল, আপনাকে পুলিশ অফিসারের কাছে হাজির করা। তাঁর আদেশ অনুসারে প্রত্যেক কুড়ি দিন অন্তর আপনাকে পুলিশ স্টেশনে গিয়ে অথবা আমার কাছে এসে আপনি কি ভাবে জীবন কাটাচ্ছেন তার রিপোর্ট দিতে হবে। এ কথাটা পুলিশ অফিসারের সামনেই আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। আমি দোভাষীরও কাজ করি। আপনি কাবুলে আসার পর আমার কাছেও যাননি, কোন পুলিশ অফিসারের কাছেও যাননি; সেজন্য হয়তো আপনাকে কষ্ট পেতে হবে। উপরন্তু আপনি আফগানিস্থানে পৌছেই পল্টনি অফিসার, ছাত্র এবং জনসাধারণে

সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করছেন। এসব আফগান সরকারের মনঃপূত হবে কিনা জানি না। যা হোক আপনাকে কাল আমার সঙ্গে পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে।

প্রৌঢ় যদিও আফগানিস্থানেরই বাসিন্দা এবং কোনও উপজাতিরই লোক হবেন, তবুও তাঁর কথায় গোলামি ভাবের বেশ একটা ছাপ ছিল। এত কষ্ট করে একটা স্বাধীন দেশে এসেছি, সেখানেও দেখছি গোলামির প্রভাব। কিন্তু আমি পাঠান ছেলেদের সঙ্গে থেকে থেকে মনের ভাব অনেকটা পরিবর্তন করে ফেলতে পেরেছিলাম। আমি বললাম, মশাই, আমি এসব আইন-কানুনের ধার ধারি না, কাল সকালে যদি আমাকে পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে তবে আপনি টমটম (এক-ঘোড়ার গাড়ি) নিয়ে আসবেন। নতুবা যাব না। আপনার শক্তি অনুযায়ী যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

প্রৌঢ় একটু কুপিত হয়ে বললেন, আপনার মত অনেক লোক দেখেছি সাহেব। এইতো কয়েক বৎসর পূর্বে পাঞ্জাব হতে কতকগুলি মুসলমান ছাত্র এসেছিল। তারা গোঁ ধরে বললেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। তারা মুসলমান অফিসার ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথা বলবে না। কিন্তু তারা জানত না এদেশে ধর্মের হিসাবে কর্মচারী নিয়োগ হয় না। রাষ্ট্রগত ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি এখানে ভারতবর্ষের লোকজনের তদ্‌বির করি, সে যে-কোন ধর্মের লোকই হোক। কিন্তু তারা তা চায় না। তারা চায় আমার স্থলে একজন মুসলমান নিযুক্ত হোক্। আমি হলাম তিন যুগের ভূষণ্ডী কাক। আমান উল্লা, বাচ্চা-ই-সাকো, নাদির শা এই তিন জনকেই আমি দেখেছি। বর্তমান রাজা জাহির শা আমাকে নতুন নিযুক্তিপত্র দিয়েছেন। এর পূর্বেও আমি এ কাজই করতাম। আপনি বলছেন আমার কথা শুনবেন না, কালই দেখব আপনার কত শক্তি।

আমি বললাম, আমার প্রসঙ্গ এখন বাদ দিয়ে বলুন তো ঐ পাঞ্জাবী মুসলমান যুবকদের কি হয়েছিল ?

—তাদের হবে আর কি। এখানে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন নাই, আমি আমার স্থানেই রয়ে গেলাম, তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হল।

'আমি বললাম, আমাকেও না হয় তাড়িয়ে দেবেন, আর কি করতে পারেন বলুন ?

প্রৌঢ় হেসে বললেন, তবে এদেশে না এলেই পারতেন।

পরদিন ভোরবেলায় আবাব তিনি এসে হাজির হলেন। আমি তখনও লেপের নিচেই ছিলাম। অনিচ্ছায় লেপ ছাড়তে হল। মুখ হাত ধুয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে বসলাম গিয়ে টমটমে। টমটম প্রবল বেগে পুলিশ স্টেশনের দিকে চলল। সকালবেলা যারা পথে বের হয়েছিল, আমাকে ঐ প্রৌঢ় রাজকর্মচারীটির সঙ্গে দেখে তাদের অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিল। আমার মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নীচাশয়, নতুবা যে তাকে দেখছে সে-ই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কেন ? আমি মনের ভাব গোপন না করে জিজ্ঞাসা করলাম, দেখছেন কি, যে আপনাকে দেখছে সে-ই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ? তার কারণ কি বলুন তো ?

উত্তর হল, এসব কারণ এখন বলা হবে না, তোমাকে একবার পুলিশ স্টেশনে হাজির করি তারপর অন্য সময় এসব কথা হবে।

লক্ষ্য করলাম, লোকটির কথাবার্তায় ক্রমেই শিষ্টাচার লোপ পাচ্ছে।

পুলিশ অফিসারের অফিস শহরের একটু বাইরে। বাড়িখানা একতালা মেটে ঘর। বর্তমান সভ্যতার ছাপ তাতে একটুও পড়েনি। বাড়ির বাইরে একটিও লোক ছিল না। এখানেও দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে হল। কড়া নাড়তেই একজন দরজা খুলে দিল, আর আমরা একটি ছোট ঘরে গিয়ে বসলাম। ঘরটির সামনেই একটা লম্বা ঘর। সেই

ঘরটার বিপরীত দিকেও আর একটা ঘর। সেই ঘরটাতে অফিসার বসে ছিলেন। কাবুল শহরের সবচেয়ে বড় অফিসারের বাসস্থান এবং তাঁর অফিসের সঙ্গে আমাদের দেশের যে কোন থানার দারোগার অফিস এবং তাঁর থাকবার ঘরের তুলনা করতে পারা যায়। কাবুলী দারোগার অফিস এবং থাকবার ঘর আমাদের দেশের থানা ও অফিসারের বাসগৃহের মত হয়তো তত ভাল নয়, কিন্তু কাবুলের পুলিশ আমাদের দেশের দারোগা মশায়দের মত উগ্রস্বভাব নন, তারা শান্ত এবং ভদ্র। তারা ভাল করেই জানেন, রাজার রাজত্ব যে কোন সময় যেতে পারে, কিন্তু সর্বসাধারণ থাকবে। সর্বসাধারণের দেওয়া মাইনে আবার নতুন করে পেতে হলে সর্বসাধারণকেই সন্তুষ্ট রাখা দরকার।

পুলিশ অফিসার কয়েক মিনিটের মাঝেই এসে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন আমি ফরাসী ভাষা জানি। আমি জানালাম, ফরাসী ভাষায় আমার ব্যুৎপত্তি নেই তবে হিন্দুস্থানী এবং ইংলিশ বলতে পারি। অফিসার ইংলিশ জানতেন কিন্তু ইংলিশ বলতে তিনি মোটেই রাজী নন। আমার কাছে কিন্তু ইংলিশ এবং ফ্রেঞ্চ উভয়ই বিদেশী। ফরাসী ভাষা আমার জানা না থাকায় এবং পুলিশ অফিসার ইংলিশ ভাষায় কথা বলতে অনিচ্ছুক হওয়ায় আমরা হিন্দুস্থানী ভাষাকেই বাহন করে কথা বলতে লাগলাম। প্রৌঢ় রাজকর্মচারী আমাদের কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবেননি আফগানিস্থানের একজন উচ্চতম পদের পুলিশ অফিসার আমাকে এত সম্মান ও প্রীতি দেখাবেন। তিনি দাঁড়িয়েই ছিলেন। আমরা বসে কথা বলছিলাম এবং চা-ও খাচ্ছিলাম। কথা প্রসঙ্গে পুলিশ অফিসার বললেন, আপনাকে প্রত্যেক কুড়িদিন অন্তর এখানে এসে অথবা নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে।

—আমাদের দেশে হাজার হাজার কাবুলি বসবাস করছে, তারা তো পুলিশ স্টেশনে কুড়িদিন অন্তর হাজিরা দেয় না!

—সে সংবাদ আমরা রাখি। আমরাও চাই না আপনারা আমাদের দেশে এসে কুড়িদিন অন্তর পুলিশ স্টেশনে হাজিরা দেন। লক্ষ্য করে দেখবেন, যখনই আপনি কোন পুলিশ স্টেশনে হাজিরা পরওয়ানা নিয়ে হাজির হবেন, তখনই পুলিশ অফিসার আপনাকে সত্বর বিদায় দিতে পারলেই যেন রক্ষা পায় এমনি ভাব দেখাবে। আমরা এসব চাই না, তবে কিনা—

—আর বলতে হবে না, আমরা মানুষ নই বলেই এই ব্যবস্থা।

—আপনারা আমাদের মত হন, এই আমাদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা। নিন আর এক পেয়ালা চা খান।

—আর চা খেয়ে লাভ নেই ; এখন বিদায় হতে চাই। কিছুই ভাল লাগছে না।

—আপনার ইচ্ছা। এখানে আটকে রাখার জন্য আপনাকে আনা হয়নি। যখনই দরকার হবে তখনই উর্দু ভাষাভাষীদের তত্বাবধায়ককে বলবেন, তাঁর সাধ্যায়ত্ত হলে তিনি সাহায্য করবেন, নতুবা আমার কাছে চলে আসবেন।

—এই ভদ্রলোক কি হিন্দু-তত্বাবধায়ক নন ?

—না, ইনি তো হিন্দু নন, ইরানি।

—তবে তিনি হিন্দু-প্রতিনিধি বলে পরিচয় দেন কেন ?

—প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থানের যত লোক এখানে বসবাস করে তাদের ভালমন্দ তিনি দেখে থাকেন। হিন্দুস্থানের বাসিন্দাকে বৃটিশরা বলে ইণ্ডিয়ান, ফরাসীরা হিদূঁ। আমরা এখানে বৈদেশিক ভাষা ফ্রেঞ্চ ব্যবহার করি, সেজন্যই এঁকে হিন্দু-প্রতিনিধি বলা অসঙ্গত হয়নি।

—আপনি বললেন হিন্দুস্থানের বাসিন্দা উর্দুতে কথা বলে, আমরা কিন্তু উর্দু বলতে অন্য আর একটা ভাষা বুঝি।

—আপনারা যাই বুঝুন, আমরা বুঝি ভারতের সর্বসাধারণ যে মিশ্র-ভাষা বলে তারই নাম উর্দু, উর্দু মানেই হল মিশ্রভাষা।

পুলিশ অফিসারের সদ্ব্যবহার দেখে হিন্দু-তত্ত্বাবধায়কের মনের পরিবর্তন হল। পথে এসে তিনি আমার সঙ্গে মধুর বচনে আলাপ করতে লাগলেন এবং দুএকবার আমাকে বললেন যে পূজারীকে বলে-কয়ে তিনি আমার আরও ভালভাবে থাকবার বন্দোবস্ত করবেন। বিষ্ণু মন্দিরে এসেই তিনি আমার সামনেই পোস্ত ভাষায় পূজারী ঠাকুরকে কি বললেন। দেখতে দেখতে পূজারী ঠাকুরেরও মনোভাবের আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেল। আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম!

কয়েক দিন হল আমার স্নান হয়নি। কাবুলে আসার পর স্নানাগারের সন্ধানও কারো কাছে জিজ্ঞাসা করিনি। পূজারীকে স্নানাগারের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, মন্দিরে স্নানাগার নাই, সরকারী স্নানাগারে গেলেই সুবিধা হবে। তারপরই বললেন, হিন্দুরা সাধারণত রাত্রিবেলাই স্নানাগারে স্নান করতে যায়, আমিও যেন তাই করি। আমি বললাম, দিনের বেলা হিন্দুরা স্নানাগারে যায় না কেন? পূজারী বললেন, যায় না কেন তা হিন্দু-প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করুন। হিন্দু-প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই তিনি বললেন, মুসলমানেরা দিনের বেলায় যায় বলেই আমরা রাত্রে যাই। আমি বললাম, এই জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার ফুরসৎ আমার নেই। ইচ্ছা করলে দিনের বেলাও স্নান করা যায়, এইটেই হচ্ছে আপনার কথার সার-মম নয় কি? হিন্দু প্রতিনিথি আমতা আমতা করতে লাগলেন দেখে আমার মেজাজ চটে গেল। বললাম, স্নানাগারটি

কোথায় দেখিয়ে দেবার জন্য একজন লোক দিলেই হবে, এখনই আমি স্নান করতে যাব।

পূজারীর বড় ছেলে কাছেই বসে ছিল, সে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজী হল। আমরা উভয়ে ঘর হতে বেরিয়ে স্নানাগারের দিকে রওনা হলাম।

পথে মাংসের, মাছের এবং সব্জির বাজার হয়ে গেলাম। কতক-গুলি মাংসের দোকানে দেখলাম ইহুদীরাই শুধু মাংস কিনছে, হিন্দু অথবা মুসলমান সেখানে যাচ্ছে না। পূজারীর ছেলে বলল, এখানে ইহুদীদের জন্য পৃথক কসাইখানা আছে, ইহুদীরা মুসলমানদের জবাই-করা জীবের মাংস খায় না। ইহুদীদের জীবহত্যার পদ্ধতি মুসলমানদের মত নয়, তারা শুধু কণ্ঠনালীটাই কাটে, মুসলমানরা তা না করে গলার দুদিকের দুটা রগ পর্যন্ত কেটে দেয়। দুরকমের কসাই-খানা দেখে মনে হল ইচ্ছা করলেই এখানে আচার-ব্যবহারের পার্থক্য বজায় রাখতে পারা যায়। স্নানাগারের কাছে এলাম। পূজারীর বড় ছেলে আমাকে স্নানাগারের দরজার কাছে রেখেই নিকটস্থ একটি হিন্দু দোকানে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে বসে রইল।

স্নানাগারে প্রবেশ করেই স্নানাগার-রক্ষককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম মাথার টুপিটা কোথায় রাখা যায়। সে কাছেই একটা ঘর দেখিয়ে দিল। সেখানে কোট টুপি মাফলার ইত্যাদি রেখে স্নানাগারের দিকে যাচ্ছি এমন সময় দারোয়ান বললে, আপ মুসলমান হ্যায় ?

আমি বললাম, নেহি। সাবুন কিদার হ্যায়, টাওয়েল কিদার হ্যায় ? তুম্ বহুত বুদ্ধু আদমি হ্যায়, মুসলমানিসে তোমারা কিয়া জরুরত ?

—হুজুর কুছ নেই, এবি সব চিজ লে আতাহে।

—জলদি লে আও।

সাবান, টাওয়েল নিয়ে এসে বাথরুমটা বেশ পরিষ্কার করে দিয়ে আদাব

বলে সে অপেক্ষাগারে গিয়ে দাঁড়াল। এক ঘণ্টা সময় কাটিয়ে যখন স্নানাগার হতে বের হলাম তখন আমি নতুন মানুষ। কাপড় চোপড় পরে স্নানাগারের ফি এক কাবুলি দারোয়ানের হাতে দিয়ে আর এক কাবুলিকে বকশিস দিলাম এবং বললাম, ফের তিন রোজ বাদ আয়েঙ্গে। হাম মুসলমান নেই হ্যায়, হিন্দুস্থানকা বাঙ্গালি হিন্দু।

দারোয়ান আমার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

যতদিন কাবুলে ছিলাম, প্রত্যেক তিন দিন অন্তর স্নান করতে যেতাম। দারোয়ান আমার ধর্ম সম্বন্ধে আর কখনও প্রশ্ন করেনি। তাকে আর বকশিসও দেইনি। একদিন একজন উচ্চশ্রেণীর অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হিন্দুদের দিনের বেলা স্নান করতে দেওয়া হয় না কেন?

তিনি বলেছিলেন, আপনাকে স্নান করতে দেয়নি?

—আমাকে দেবে না কেন, স্থানীয় হিন্দুদের কথা বলছি।

—ওদের কথা বলবেন না, ওরা নিজেরাই এজন্য দায়ী। গেলেই হয়, কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু এরা এত ভীরু এবং কাপুরুষ যে কেউ কিছু বলবার পূর্বেই সরে পড়ে। এজন্যই এদের এই দুর্দশা।

স্নান করে বাইরে এসে নিকটস্থ একটি চায়ের দোকানে প্রবেশ করলাম। এই দোকানে "সবজ্ চা" বিক্রি হয়। তবে তাতে চিনি ব্যবহার হয়। চায়ের এতই পিপাসা হয়েছিল যে চার পেয়ালা চা খাবার পর আমার তৃষ্ণা মিটল। দোকানি এবং অন্যান্য লোক আমার দেশ কোথায় জিজ্ঞাসা করে যখন শুনল আমি কলকাতা হতে কাবুলে সাইকেলে করে এসেছি তখন তারা প্রত্যেকেই আমার করমর্দন করল। এদের কথা শুনে মনে হল বাংলা দেশে কোন ধর্মের প্রভাব নেই, আছে শুধু তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাব। একজন বললে, বাঙ্গালীদের ভয়ের কোন কারণ নেই, ওরা যাদুশক্তির প্রভাবে বাঘকে কুকুর বানিয়ে রাখে। এদের এসমস্ত আজগুবি

কথার প্রতিবাদ করে ফায়দা নেই, আমার বেশ আমোদই বোধ হচ্ছিল।

পরের দিন বেলা তিনটার সময় প্রধান মন্ত্রীর বাড়ির দিকে রওনা হলাম! অবশ্য এর পূর্বে চায়ের দোকানে গিয়ে পূর্ব পরিচিত বয়টির কাছ হতে প্রধান মন্ত্রীর বাড়ির অনেক কথাই জেনে নিয়েছিলাম।

পথের উপর বরফ জমে পাথর হয়ে রয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস প্রবল বেগে বইছে। পথে গরিব লোক ছাড়া আর কেউ চলছে না। দুপাশের বাড়ির দরজাগুলি দেখলে মনে হয় অনেকদিন কেউ বুঝি ঘর হতে দরজা খুলে বের হয়নি। আমি নীরবে পথ চলচি। প্রধান মন্ত্রী আমার সঙ্গে কথা বলবেন কি না, সে কথা ভাবছিলাম না। অনেক বড় লোকই সময়ের অভাবে কথা বলেননি, এখনও অনেকে দেখা করতে গেলে প্রথমেই ভাবেন হয়তো ভিক্ষা চাইতে গিয়েছি। পর্যটকের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে দুনিয়ার মানুষ আজো হয়ত কুণ্ঠিত কিন্তু এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে যখন পৃথিবীর সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তাদের অবদান যোগ্য সমাদর লাভ করবে।

পথে চলতে চলতে হঠাৎ চোখের জ্যোতি লোপ পেতে লাগল। অন্ধ হয়ে যাচ্ছি বলে মনে হল। আমার ভ্রমণ বুঝি এখানেই শেষ হতে চলল। মহাবিপদ। যারা ভগবান বলে কিছু আছে বিশ্বাস করে তারা বেশ সুখী। তারা হয়তো এ অবস্থায় পড়ে ভগবানের নাম নিয়ে কান্না জুড়ে দিত। কিন্তু আমার সে পথ বন্ধ। মাথার মাঝে চিন্তা-স্রোত বইছিল। সেই চিন্তাধারার গতি যে কত দ্রুত তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। ভাবছিলাম কি করে শরীরটাকে ধ্বংস করে এই দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। হঠাৎ মনে হল সঙ্গে কিছু বিষাক্ত দ্রব্য বা প্রাণ ঘাতী অস্ত্র থাকলে হয়তো বা তখনকার যা মনের অবস্থা, ভবলীলা সাঙ্গ করতে দেরী হত না। কিন্তু হঠাৎ অন্ধ হয়ে যাবার কারণ কি ? কেন চোখে দেখতে

াচ্ছি না? শীতের জন্য নয়তো? সেদিন তাপমান যন্ত্রে উত্তাপ শূন্য-ডিগ্রী তে সতেরো ডিগ্রী নীচে নেমে গিয়েছিল। মনে হল প্রবল ঠাণ্ডাই চোখের জ্যোতি লোপ হবার একমাত্র কারণ। চোখ দুটাকে গরম করার জন্য দুহাতে াগড়িয়ে দিলাম। তারপর হাতের তেলো দুটোকে ঘষে গরম করে চোখে ার-বার লাগাতে লাগলাম। একটু একটু করে যদি বা দৃষ্টি ফিরে আসতে াগল, কিন্তু এদিকে পা দুখানা অবশ হয়ে যেতে লাগল। এরূপভাবে পা াণ্ডা হয়ে অবশ হতে শুরু হলেই মনে করতে হবে মৃত্যু আসন্ন। ক্ষীণপ্রভ চক্ষুদৃষ্টি মেলে স্মুখের পানে তাকালাম। সব কিছুই ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছিল, মনে হল যেন প্রায় কুড়ি হাত দূরে একটা চায়ের দোকান রয়েছে। এই দোকানে যেতে পারলেই আমার প্রাণ বাঁচবে। কিন্তু পা নড়ছে না। তখন চিৎকার করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। চিৎকার করে লোক ডাকতে লাগলাম। চায়ের দোকান হতে কয়েকজন পাঠান বেরিয়ে এসে আমাকে টেনে চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে পায়ের জুতা খুলে ফেলে বরফ ঘষে ডলতে লাগল। কিছুক্ষণ দলাই-মলাই হওয়ায় পা দুটাতে শক্তি ফিরে এল। তারপর তারা আমাকে উপর্যুপরি কয়েক পেয়ালা চা খাওয়ালে। চা খেয়ে শরীরে শক্তি এল, চোখের দৃষ্টি ভাল করেই ফিরে পেলাম। অবশেষে পা দুটোকে আগুনের কাছে রেখে একটা কাষ্ঠাসনের উপর চুপ করে বসে রইলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পর সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করলাম। তখন আমার মনে কি আনন্দ, যে সকল পাঠান আমাকে সাহায্য করেছিল এবং যতগুলি াঠান ঘরে বসে ছিল, তাদের প্রত্যেককে চা-এর নিমন্ত্রণ করলাম। দোকানী প্রত্যেককে চা দিল। প্রত্যেকটি পাঠান আমার ব্যবহারে খুশী য়েছিল। একজন বলেছিল, আপনাকে আমরা সাহায্য করেছি, কর্তব্যের খাতিরে। আমরা সবাই খোদার বান্দা, খোদারই অনুগ্রহে আজ আপনি বেঁচে গেছেন। খোদার দয়ায় আমরা না থাকলে আপনার মরণ আজ

অনিবার্য ছিল।

আমি লোকটির কথার জবাবে শুধু বললাম, আপনাদেরই অনুগ্রহ।

প্রচুর পরিমাণে চা খেয়ে পাঠানদের শরীর বেশ গরম হয়েছিল, সেজন্যই বোধহয় গল্পও জমে উঠেছিল বেশ। গল্প হল নানা রকমের। রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র সবাই এই গল্পস্রোতে ভেসে যাচ্ছিলেন। আমি বাচ্চা-ই-সাক্কোকে সেই গল্পস্রোতে ভাসাতে চেষ্টা করলাম। আমার চেষ্টা সফল হল, তার একটি কারণ ছিল। এই পাঠানগুলি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিল। পাঠানরা সকল সময়ই কতকগুলি নিজস্ব নিয়ম মেনে চলে। নানা পরিবর্তনের মাঝেও তারা ঐ নিয়মগুলি পালন করে আসছে। যার প্রাণরক্ষা করা হয় তার সামনে কোনও গোপনীয় কথা প্রকাশ করলেও উভয় পক্ষেরই কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। প্রাণরক্ষকের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কেউ দাঁড়ায়নি। এটিই আফগান হিন্দু এবং স্থন্নিদের একটা মস্ত জাতীয় বৈশিষ্ট্য। বাচ্চা-ই-সাক্কোর সম্বন্ধে এদের কাছ হতে যা শুনেছিলাম তা কখনও আফগানিস্থানে থাকার সময় কারো কাছে বলিনি। আজও আমার ভ্রমণ-কাহিনীতে এই ঘটনাটি স্থান পেত না, কিন্তু আফগানিস্থান এমনই এক স্তরে এসে আজ পৌঁছেছে যে, যদি আমি যা শুনেছি এখন তা প্রকাশ করি তবে আমার প্রাণরক্ষকদের কোন ক্ষতি হবে না। তারপর এটাও মনে রাখতে হবে, যা বলতে যাচ্ছি তা চায়ের দোকানের গল্প।

মানুষে মানুষে ভেদ ঘুচিয়ে দেবার জন্য যিশু ক্রুশবিদ্ধ হলেন, বুদ্ধ এত ত্যাগ স্বীকার করলেন, নানক সকল ধর্ম মিলিয়ে নতুন ধর্ম তৈরী করা কিন্তু মানুষ সমান স্তরে এল না। মানুষের মাঝে ছোটজাত বড়জাত গেল, ছোটলোক বড়লোকের তারতম্য রয়ে গেল। বাচ্চা-ই-সাক্কো ছো জাত! তাঁর অভ্যুদয়ের দরকার ছিল। যখন দেখা গেল বাচ্চা-ই-সাক্কো হবিব উল্লা হয়ে আর্থিক জগতে পুঁজিবাদী এবং উঁচু জাতের উপর

দিয়েছে তখনই আবার উঁচু জাতের মাথা ঘুলিয়ে গেল, নাদির শাহের দরকার হল।

বাচ্চা-ই-সাক্কো আট মাস রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্ব-সময়ে আফগানিস্থানের কি অবস্থা ছিল সে সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেননি। আমি পর্যটক মাত্র। ঐতিহাসিক-জ্ঞান অর্জন করবার জন্য সে দেশে যাইনি। সে দেশের লোকেও বাচ্চা-ই-সাক্কোর সম্বন্ধে তখন অনেকটা নীরব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গোপনে যারা বাচ্চা-ই-সাক্কোর সম্বন্ধে কথা বলত তাদের কথা শুনতে আমার বেশ ভাল লাগত। যারা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, বাচ্চা-ই-সাক্কো এদেরই সমশ্রেণীর লোক। কুহীস্থান নামক জায়গা হতে এরা কাবুলে এসে বসবাস করছে। কুহীস্থানই বাচ্চা-ই সাক্কোর জন্মস্থান। বাচ্চা-ই-সাক্কো হিলজাই সম্প্রদায়ের লোক।

কাংড়া জেলা নিবাসী চেলারাম গত মহাযুদ্ধের চাকুরি শেষ ক'রে তৃতীয় আফগান যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। আফগান যুদ্ধ শেষ হলে তাঁকে খারিজ করা হয়। তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। বাড়ীতে এসে বেশিদিন তিনি থাকেন নি। ফের আফগানিস্থানে চলে যান। আফগানিস্থানে যাবার পর তাঁর মতিগতি ভাল ছিল না। কোনও কারণবশতঃ তাঁকে জেলে যেতে হয়। তখন আমান-উল্লার রাজত্ব কাল বলেই চেলারাম বিকলাঙ্গ না হয়েই জেলে গিয়েছিলেন। আজও আফগানিস্থানে চোরের হাত কেটে ফেলা হয়।

আমান উল্লা সমাজ সংস্কারে মন দিয়েছিলেন। জেল-সংস্কার করবার তাঁর ফুরসৎ হয়নি। তখন জেলে গেলে কয়েদীদের বাইরে থেকে খাদ্য গ্রহ করে আনতে হত! এখনও সে নিয়ম আছে বলেই মনে হয়, তবে ৫ চার বৎসরের সংবাদ আমি সঠিক জানি না। চেলারামও বাইরে থেকেই খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। একদিকে জেলের খাটুনি

তারপর খাদ্য সংগ্রহ করে আনা ভয়ানক পরিশ্রমের কাজ। বেশি পরিশ্রম করলে সুনিদ্রা হয়। একদিন সকালবেলা চেলারাম যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মাথার টিকি দেখে, তিনি যে হিন্দু তা অনেকেই বুঝতে পেরেছিল। হিন্দুরা খুব কমই জেলে যায়। সেজন্য বোধহয় হিন্দুদের জেলে দেখলে অন্যান্য কয়েদীরা সকলে মিলে খামকা তার উপর অত্যাচার করে। চেলারামকেও খামকা নাজেহাল করার জন্য অন্যান্য কয়েদীরা একজোট হল। চেলারাম বুঝলেন এবার তাঁর প্রাণান্ত হবে। যখন তাঁর উপর সত্যই অত্যাচার সুরু হল তখন কাছে দণ্ডায়মান এক গম্ভীর প্রকৃতির লোকের পায়ে ধরে চেলারাম প্রাণভিক্ষা চাইলেন। সেই লোকটিই বাচ্চা-ই-সাক্কো।

চেলারামের মনের পরিবর্তন হয়ে গেল। চেলারাম বুঝলেন টাকাই পরমার্থ নয়। তারপর বিদ্রোহ হল। বিদ্রোহে বাচ্চা-ই-সাক্কো কৃতকার্য হয়ে হবিবুল্লা নাম নিলেন। কিন্তু তাঁরও মতিগতি বদলে গেল। চেলারাম ধর্মের গোঁড়ামি আফগানিস্থান হতে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হলেন। বাচ্চা-ই-সাক্কো ছোট জাত বড় জাত দুটো কথা পৃথিবী হতে লোপ করতে উদ্যোগী হয়ে দেখলেন, এ যাবার নয়, যে পর্যন্ত রুশ দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা না যায়। চেলারাম এবং বাচ্চা-ই-সাক্কো উভয়ে একমত হয়ে কাজে ব্রতী হলেন, কিন্তু পেরে উঠলেন না। নাদির শা এসে তাঁদের সোনার সংসারে আগুন ধরিয়ে দিলেন। চেলারাম পালালেন। বাচ্চা-ই-সাক্কো ধরা দিলেন। বাচ্চা-ই-সাক্কোকে ফাঁসি দেওয়া হল। ছোট লোকের রাজত্ব আট মাসের মাঝেই শেষ হল। ইউরোপীয় লেখকগণ বলেন, বাচ্চা-ই-সাক্কোকে গুলি করে মারা হয়েছিল। আমি কিন্তু সে কথা শুনিনি। ইউরোপীয় লেখকগণ বলেছেন বাচ্চা-ই-সাক্কো উত্তর হতে এসে কাবুল আক্রমণ করেছিলেন। আমি শুনেছি বাচ্চা-ই-

সাক্কো জেল থেকে বের হয়ে বিদ্রোহ করেন।

বাচ্চা-ই-সাক্কোর কাহিনী শ্রবণ করে মন্দিরে আসতে হল, কারণ সন্ধ্যার পর আর প্রধান মন্ত্রীর বাড়ী যাওয়া চলে না এবং এত শীতের মাঝে পথে চলাও সমীচীন নয়। আসামাই মন্দিরে ফিরে গিয়ে পূজারীকে সেদিনকার বিপদের কথা বলাতে পূজারী খুশী এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, প্রাণটা তাহলে রক্ষা পেল এবারের মত। পাঠানরা কিন্তু হিন্দুদের মোটেই সাহায্য করে না।—পূজারীর কথা শুনে মনে মনে বেশ একটু হাসলাম।

সাহায্য না করারই কথা। অতীত যুগ হতে এদেশের নীচ জাতের প্রতি এরাই অর্থাৎ তথাকথিত অভিজাতরাই অত্যাচার করেছে বেশি। ধর্মের দিক দিয়েও কত পরিবর্তনের ঢেউ এসেছে, তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত এদের প্রতিপত্তির অবসান হয়নি, গরীবের উপর অত্যাচারের উপশম হয় নি। এখানে আমি হিন্দু মুসলমানের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি ভাবতাম অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতের কথা।

পরদিন সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠেই ইচ্ছা হল একবার স্থানীয় সবজি মণ্ডি দেখে আসি। উদ্দেশ্য এখানে মাছ কি দরে বিক্রি হয় তা দেখব। যদি মাছ কিনতে পাই তবে কোন পাঠানের দোকানে নিয়ে গিয়ে তা ভেজে দিতে বলব এবং আরাম করে খাব। মাছ ভাজা খাবার প্রবল ইচ্ছাই আমাকে সবজি মণ্ডির দিকে টেনে নিয়ে গেল।

সবজি মণ্ডির বাইরে একস্থানে কয়েকটি লোক কতকগুলি মাছ বিক্রি করছিল। মাছগুলি দেখতে বড়ই কুৎসিত। মনে মনে তখন সমাজ-তত্ত্বের কথা ভাবছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও কি কারণে আমি বলতে পারি না আপনা হতেই মুখ দিয়ে গুন গুন স্বরে একটি গানের কলি বের হয়ে এল। সেটি হল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

হঠাৎ নজরে পড়ল অদূরে বোরখা পরিহিত একজন নারী চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালেন। সেখান হতে তিনি ইসারায় আমাকে ডাকলেন। আমি নিকটে গেলে বোরখার ভেতর হতেই তিনি পরিষ্কার বাংলা ভাষায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আফগানিস্থানে কাবুল শহরের বুকে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় একটি নারীকে কথা বলতে দেখে আমার ভারি বিস্ময় বোধ হল। তাঁর কথা শুনে তাঁকে বাঙ্গালী ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হল। তিনি আমাকে যতগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার সকল কথারই উত্তর দিলাম। আমার কথা শুনে তিনি ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন তিনিও বাঙ্গালী। কাবুলের মত স্থানে একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি খুব খুশী হয়েছেন। ঘটনাচক্রে কাবুলেই তিনি বাস করেন। বাড়িতে তাঁর স্বামী এবং ছেলে মেয়ে রয়েছে। আমাকে তিনি তাঁরই সঙ্গে তাঁর বাড়িতে যেতে বললেন। আফগানিস্থানে অনাত্মীয় স্ত্রীলোকের পেছনে পেছনে চলা বড়ই অন্যায় কাজ। আমার মনে কোন অসদভিপ্রায় ছিল না। কাবুলের মত স্থানে একটি বাঙ্গালী নারীর দর্শন পেয়ে তাঁর সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল হয়েছিল। আমি কোনরূপ চিন্তা না করেই তাঁর কথায় সম্মত হলাম। তিনি আগে আগে চললেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনটি সরু গলি ঘুরে আমরা একটি বাড়ির সামনে এলাম। তিনি কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। একটি বার তের বছরের মেয়ে ও একটি আট বৎসরের ছেলে বের হয়ে এল। তাদের মায়ের সঙ্গে একজন অপরিচিত লোককে দেখে তারা বিস্মিত হল। তাদের মা তাদের ডেকে কি বললেন। তারা একটু ভয়ে ভয়ে সঙ্গে চলল।

উপরে উঠে গিয়ে দেখলাম, একজন পাঠান বসে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি খুশী হয়েছেন বলে মনে হল না। যা হোক তি-

ভদ্রতা প্রকাশ করতে কসুর করেন নি। "স্তারেমাসে" বলে তিনি আমাকে সম্ভাষণ করলেন। উত্তরে আমি নমস্কার বলতে তিনি কিছু বিস্মিত হলেন। তারপর তিনি হিন্দুস্থানীতে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আমিও হিন্দুস্থানীতে তাঁর কথার জবাব দিতে লাগলাম। আমার পরিচয় পেয়ে এবং আমি যে একজন "সাইয়া দুনিয়া" তা শুনে তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে একটি নতুন টি-পট, এক ঘটি গরম জল এবং কতগুলি চায়ের পাতা সামনে এনে দিয়ে চা বানিয়ে খেতে বললেন। আমি হেসে বললাম নতুন টিপটের কোন দরকার নেই। আমি হিন্দুকুলে জন্মেছি বটে, তা বলে হিন্দুদের সনাতন আচারবিচার মানতে কোন মতেই রাজি নই। ছুৎমার্গ আমার ত্রিসীমানায় নেই। আমার কথা শুনে সরলচিত্ত পাঠান অত্যন্ত খুশী হলেন এবং তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে আমার করমর্দন করলেন। তাঁর ছেলেকে কি বলে তিনি আমার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন। বাঙ্গালীরা দুধ ছাড়া চা খায় না, সেজন্য তিনি তাঁর স্ত্রীকে দুধ আনতে পাঠিয়েছিলেন। কথায় কথায় বললেন, মেওয়া বিক্রি করবার জন্যে বহুকাল যাবৎ প্রত্যেক বৎসরই বাংলাদেশে যাওয়া তাঁর অভ্যাস। আঠার বৎসর পূর্ব্বে তিনি লক্ষ্মীকে কলকাতায় বিয়ে করেছিলেন। লক্ষ্মী বাঙ্গালীর মেয়ে, তিনি লক্ষ্মীকে চুরি করে আনেন নি। হিন্দুমতে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। এ দুটিই তাদের ছেলে মেয়ে। তাঁর স্ত্রী বাঙ্গালী বলেই তিনি বাঙ্গালীকে ভালবাসেন। সুজলা সুফলা বাংলা দেশের একটি কোমলাঙ্গী বধূ শুষ্ক কর্কশ পাঠানকে স্বামীত্বে বরণ করে তার গৃহকে আপন করে নিয়েছে—কথাটা ভাবতেও মনে বিস্ময় লাগছিল।

আমি ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে নিয়ে এলাম। এবার তাদের একটু সাহস হয়েছে। তারা ভয় না ক'রে আমার কাছে এল। কিন্তু দুঃখের

বিষয় তাদের সঙ্গে আমি কথা বলতে পারিনি। তারা জানত শুধু পোস্তু ভাষা। এ সময়ে লক্ষ্মী ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। এবার তাঁর পরণে খাঁটি বাঙ্গালী মেয়ের পোশাক। তাঁর শাড়ি পরা দেখে আমার বেশ ভাল লাগল। দেখলাম পাঠানের চোখেমুখেও হাসি ফুটে উঠেছে।

এবার পাঠান-স্বামী লক্ষ্মীর সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিলেন। তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলাতে স্ত্রীকে বললেন, ইনি তোমার দাদা, একে অভিবাদন কর। সত্যই লক্ষ্মী যখন বাঙ্গালী মেয়ের মত আমার পায়ের কাছে প্রণাম করলেন তখন নিমেষে আমার মনে বাংলা দেশের কল্যাণমণ্ডিত গৃহচ্ছবি ভেসে উঠল। লক্ষ্মীর মধ্যে যেন সমস্ত বাংলা দেশ মূর্ত হয়ে উঠল। লক্ষ্মী আমার জন্য চা প্রস্তুত করবেন কি না ইতস্তত করছেন দেখে পাঠান-স্বামী হেসে উঠলেন। তিনি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে চা বানাতে বললেন। লক্ষ্মী যত্ন সহকারে চা বানিয়ে রুটির সঙ্গে আমাকে চা দিলেন। তারপর তাঁর নিজের কথা বলতে লাগলেন।

লক্ষ্মীর সঙ্গে বাংলাতেই আমি কথা বলতে লাগলাম। পাঠানকে বললাম, ভাই, বাঙ্গালী বোনের সঙ্গে আমি নিজের ভাষায়ই কথা বলব। এতে তুমি নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে না। পাঠান বললেন, তুমি বাংলাতে কথা বল এতে আমার আপত্তি নেই। আমি বাংলা একটু-আধটু বলতে পারি। কিন্তু তোমার বোন আমাকে ভাল করে বাংলা শেখায়নি সেজন্য আমি দুঃখিত। যখনই আমি কলকাতা যাই তখনই অনেক চেষ্টা করে তোমার বোনের জন্য বাংলা কেতাব কিনে আনি। তুমি ইচ্ছা করলে এসব কেতাব দেখতে পার।

কথা বলতে বলতে লক্ষ্মী তার পুস্তকের ভাণ্ডার আমার সামনে ধরলেন। দেখলাম তথায় কাশীদাসের মহাভারত, টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী, সুরথ উদ্ধার গীতাভিনয়, বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর, যুগলাঙ্গুরীয়, আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ,

লোকরহস্য, পুরাতন কয়েকখানা প্রবাসী এবং নব্য ভারত রয়েছে। বইগুলি দেখে মনে বেশ আনন্দ হল। বুঝতে পারলাম, যদিও পাঠানের বহিরবয়ব কর্কশ তবু তার অন্তর কোমল। লক্ষ্মীকে তিনি প্রকৃতপক্ষেই অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন। লক্ষ্মীকে সুখী রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করে থাকেন।

লক্ষ্য করলাম, লক্ষ্মীর মনে প্রথমেই ছুৎমার্গের ভাব এসেছিল। তিনি বললেন যদিও তিনি পাঠানকে বিয়ে করেছেন তবুও তিনি মনে প্রাণে হিন্দুই আছেন। আজও তিনি অখাদ্য কিছুই খাননি। নিজেই পাঁঠা অথবা দুম্বার মাংস কিনে আনেন। মাছ যা পাওয়া যায় তার দাম বেশ সস্তা।

ব্রাহ্মণকুলে জন্মেও ব্রাহ্মণত্বে যদি বা জলাঞ্জলি দিতে পেরেছি, কিন্তু ব্রাহ্মণের পেটুকত্ব চেষ্টা করেও তাড়াতে পারি নি। মাছের কথা শুনতেই আপনা থেকেই মুখে জল এল। লক্ষ্মী বললেন, একদিন মাছ রেঁধে আমাকে খাওয়াবেন; কিন্তু তত সময় অপেক্ষা করা আমার সহ্য হল না। বললাম, পরের কথা পরে হবে, এখন ঘরে যা আছে তা দিলেই খুশী হব।

আমার কথা শুনে লক্ষ্মী হেসে ফেললেন এবং পাঠানকে কি বলে বাইরে চলে গেলেন। পাঠান তখন আবার আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, স্থানীয় ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীতে একজন বাঙ্গালী সাহেব কাজ করেন; তাকে অনেক দিন নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, কিন্তু তিনি কখনও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নি। লক্ষ্মী বাঙ্গালীর সঙ্গ পছন্দ করে, আমি বাঙ্গালীর সঙ্গে মেলা মেশা করতে চাই, কারণ এতে আমার ইজ্জত বাড়ে। কিন্তু ঐ ছোট লোক একদিনও আমার বাড়ি আসেনি। তুমি ব্রাহ্মণ, লক্ষ্মী শূদ্র, তোমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্রের রান্না খায় না, তা আমি জানি। তুমি কি লক্ষ্মীর রান্না খাবে? আমি উচ্চস্বরে হেসে বললাম,

প্রচলিত ব্রাহ্মণত্ব যা আছে তাতে আমার আস্থা নেই। মানুষ জাতের নকল ছাপ তাদের কপালে মেরে দিয়েছে, আমি এসব কৃত্রিমতা ভালতো বাসিই না, যদি সময় আসে তবে এসব কৃত্রিমতা সমূলে উৎপাটনের চেষ্টা করব।

আমার কথা শুনে পাঠান বড়ই সুখী হলেন এবং পরের দিন তাঁর বাড়িতে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। ইতিমধ্যে লক্ষ্মী থালায় ভাত এবং বাটিতে তরকারী সাজিয়ে নিয়ে এলেন। ছোলার ডাল, পাঁঠার মাংসের ঝোল এবং প্রচুর আচার ছিল। বহুদিন পরে বাঙ্গালী বোনের দেওয়া ডাল ভাত খেয়ে তৃপ্ত হলাম। সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছিল। বেশি দেরি করা অন্যায় হবে ভেবে কুড়িয়ে-পাওয়া বোনের ঘর পরিত্যাগ করে সত্বর আসামাই মন্দিরে ফিরে এলাম।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই পাঠান ভগ্নীপতির মুখদর্শন হল। মুখ হাত ধুয়েই তাঁর সঙ্গে চললাম। পথে চলতে চলতে কলকাতার সম্বন্ধে অনেক বিষয় বলে তিনি আমার মনে কলকাতার একটি চিত্র এঁকে তুলতে লাগলেন। বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখি, লক্ষ্মী এবং ছেলেমেয়ে দুটি বাজারে যাবার জন্য কাপড় পরে প্রস্তুত হয়েছে। আমাকে চা-রুটি দিয়েই তারা বাজারে যাবে ঠিক করেছিল। আমি কিন্তু তাতে রাজী হলাম না। ওদের সঙ্গে বাজারে যেতে আমারও ইচ্ছা হল। পাঠানদের নিয়ম কিন্তু অন্য রকমের। অতিথিকে বাজারে গিয়ে কিছু কিনে আনতে নেই। আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললাম যে আমিও বাজারে যাব এবং আমার যা ভাল লাগে তা কিনতে বলব। তিনি হেসে সম্মতি দিয়ে বললেন, ভাই বোন এক সঙ্গে বাজারে যাবে তাতে আপত্তি কি?

লক্ষ্মীর ছেলেমেয়েকে নিয়ে আমি বাজারে গেলাম। পথে লক্ষ্মীকে বললাম, বাজারে গিয়ে আমার এক পয়সাও খরচ করা পাঠানদের মতে

মহাপাপ, কিন্তু বোনকে যদি আমি আমার ইচ্ছামত কিছু জিনিস কিনে দিই, তাতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে? আমাব দুটি বোন ছিল তারা মরেছে। আজ থেকে তুমিই আমার বোন। তোমাকে এবং তোমার ছেলেমেয়েকে কিছু কিনে দিলে আমি শান্তি পাব। লক্ষ্মী তাতে কোন আপত্তি করলেন না। প্রথমত আমি ছেলেমেয়ে দুটিকে কিছু খেলনা কিনে উপহার দিলাম। মামার নিকট হতে উপহার পেয়ে তাদের বেশ আনন্দ হল। দুটি জংলী হাঁস এবং অন্যান্য কিছু আহার্য কিনে ফিরে এলাম।

লক্ষ্মীর সঙ্গে আমাকে বাজারে দেখে অনেকেই কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। লক্ষ্মী তা বুঝতে পেরে ছেলেমেয়ের কানে কি বলে দিলেন। লক্ষ্মীর ছেলে-মেয়ে মার কথা শুনে আমাকে পোস্ত ভাষায় মামা বলে ডাকতে লাগল। ওদের অনেকেই আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। ছেলেমেয়েরা বলেছিল ইনি কলকাতার মামা। এদের হাবভাব দেখে মনে হল কলকাতার লোককে মামা বলে ডাকা অগৌরবের নয়।

বাড়ী ফিরে লক্ষ্মী রান্নার বন্দোবস্ত করলেন। আমি তাঁরই কাছে বসে কথা বলতে লাগলাম। রান্না করবার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর কুমারী জীবনের কথা তিনি আমার কাছে বলে যেতে লাগলেন। লক্ষ্মী নিজের কাহিনী যা বলেছিলেন তা এখানে বলছি। এই কাহিনীর পাত্রপাত্রীদের আসল নাম গোপন রেখে কাল্পনিক নামই আমি ব্যবহার করব।

পূর্ববঙ্গের কোন এক জেলায় লক্ষ্মীর পিত্রালয় ছিল। পিতা হরিশঙ্কর রায় সদরে চাকুরি করতেন। হরিশঙ্করের মাইনে সামান্যই ছিল। সেজন্যই বোধ হয় স্ত্রীকে চাকরি-স্থানে রাখতে সক্ষম হতেন না। স্ত্রী একা বাড়িতেই থাকতেন। যখনই হরিশঙ্কর সুযোগ পেতেন তখনই বাড়ি এসে সংসার দেখাশুনা করতেন, তারপর আবার সদরে চলে যেতেন।

তাঁদের গ্রামের ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব কালু পণ্ডিত লোক ভাল ছিলেন না। তিনি দরিদ্র হরিশঙ্করের স্ত্রীর নামে নানা কুৎসা প্রচার করতে লাগলেন। কিছুদিন পর হরিশঙ্করের স্ত্রী গর্ভবতী হলেন। যথাসময়ে লক্ষ্মীর জন্ম হল। তখন কালু পণ্ডিত গ্রামে হৈ চৈ শুরু করলেন। দরিদ্র হরিশঙ্কর ধনী ব্রাহ্মণ কালু পণ্ডিতের চক্রান্তে একঘরে হলেন। কালু পণ্ডিতের কাছে অনেককেই টাকা ধার করতে হত। সেজন্য ঋণগ্রস্ত গ্রামবাসী হরিশঙ্কর প্রকৃতই দোষী কিনা তার বিচার না করেই হরিশঙ্করকে সমাজচ্যুত করল।

দরিদ্র হরিশঙ্করের পক্ষে এটা বরদাস্ত করা সম্ভব হল না। তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং স্ত্রী ও কন্যার দায়িত্ব এড়াতে চেষ্টা করতে লাগলেন। লক্ষ্মীর মা ছিলেন বুদ্ধিমতী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রবল শত্রুর সঙ্গে বিবাদ করে গ্রামে বাস করা অসম্ভব। তাই তিনি তাঁর এক দূর-সম্পর্কিত ভগ্নীর কাছে কলকাতায় চলে এলেন।

লক্ষ্মীর মা কলকাতায় এলেন, কালু পণ্ডিত কিন্তু তাঁর সঙ্গ ছাড়ল না। সে নানা চেষ্টা করে লক্ষ্মীর মার ঠিকানা বের করল এবং কলকাতায় চলে এল। যখনই সে সুযোগ পেত তখনই লক্ষ্মীর মার নিকট উপস্থিত হত এবং তাঁর কাছে কুপ্রস্তাব করত। একদিন লক্ষ্মীর মা'র অসহ্য বোধ হওয়ায় তিনি ঝাঁতি দিয়ে তাকে আঘাত করেন। ক্ষমতা মদে মত্ত কালু পণ্ডিত চলে গেল, কিন্তু তার মনে জেগে রইল প্রতিশোধ কামনা।

একদিন লক্ষ্মীর মা লক্ষ্মীকে মুদির দোকানে ঘি কিনতে পাঠিয়েছিলেন। লক্ষ্মী আর ফিরে আসেনি। লক্ষ্মীর মা তাঁর সাধ্যমত খোঁজাখুঁজি করলেন কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। কিছুদিন পর তিনি সংবাদ পেলেন যে কালু পণ্ডিত লক্ষ্মীকে চুরি করে ঢাকাতে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। লক্ষ্মীর মা অতি কষ্টে ঢাকা গেলেন। সেখানে কালু পণ্ডিত এক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিল। ঘটনাচক্রে এক সহৃদয় মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে লক্ষ্মীর মার পরিচয়

হয়। তাঁর সাহায্যে তিনি কালু পণ্ডিতের কবল থেকে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেন। বহুদিন পর লক্ষ্মীর মা মেয়েকে ফিরে পেয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। এর ক'মাস পর কালু পণ্ডিত ইহধাম পরিত্যাগ করেন। গ্রামের লোক তার পরলোক-গমনে সুখী হল বটে কিন্তু পর বৎসর কালু পণ্ডিতের দুর্দান্ত পুত্র অমলকৃষ্ণ গদিতে বসে অধিকতর দোর্দণ্ড প্রতাপে গ্রামের উপর আধিপত্য করতে লাগল।

দেখতে দেখতে বৎসর কেটে যেতে লাগল, লক্ষ্মীর বিয়ের বয়স হল। লক্ষ্মীর মা বারংবার পত্রযোগে স্বামীকে খবর দিলেন কিন্তু কোন ফল হল না। ঢাকার সেই মুসলমান ভদ্রলোককে লক্ষ্মীর মা দাদা বলে ডেকেছিলেন। এই পাতানো দাদাকে তিনি লক্ষ্মীর বিয়ের জন্য অনুরোধ করলেন। দাদা জানালেন তাঁর হাতে একটি উপযুক্ত পাত্র আছে, তাকে তিনি কলকাতায় সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। কয়েকদিন পর পাত্রকে সঙ্গে করে মুসলমান ভদ্রলোকটি কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। পাত্রের চেহারা দেখে আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা শুনে লক্ষ্মীর মায়ের সন্দেহ হল সে বাঙ্গালী হিন্দু নয়, তাঁকে বলা হল যে পাত্র ছোটবেলায় পেশোয়ারে ছিল। দুঃখিনীর মেয়ের বিয়ে, বেশি ভাবনা করার সময় ছিল না। হিন্দুমতে লক্ষ্মীর বিয়ে হয়ে গেল। পাত্র তো বললেন যে, লক্ষ্মীকে নিয়ে তিনি ঢাকা যাচ্ছেন। কিন্তু ঢাকার পথ আর শেষ হয় না। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে পাঠানমুল্লুক কাবুলে এসে লক্ষ্মী প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করলেন।

এ পর্যন্ত বলে লক্ষ্মী স্বামীকে উদ্দেশ করে বললেন, এ লোক খারাপ নয়। আমাকে বিশেষ জ্বালাযন্ত্রণা দেয়নি। তবে প্রথম কিছুদিন অনভ্যস্ত জীবন-যাত্রার সঙ্গে আপোষ করতে বেগ পেতে হয়েছিল। কি যে নিদারুণ কষ্টে আমার দিন গিয়েছে। তারপর যতই দিন যেতে লাগল ততই অদৃষ্টকে মেনে নিতে বাধ্য হলাম। এ দুটি ছেলেমেয়ে জন্মেছে, এখন আমার বিশেষ

কিছু কষ্ট নেই। কিন্তু এ দেশে থাকতে মোটেই আমার ইচ্ছা হয় না। আমরা কি দেশে গিয়ে হিন্দুসমাজে মেলা-মেশা করবার সুযোগ পাব ?

লক্ষ্মীর কথা শুনতে শুনতে স্থান কাল ভুলে আমি একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর প্রশ্নে চমক ভাঙ্গল।

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ভিন্ন ভিন্ন তরকারী রান্না করে লক্ষ্মী আমাকে খেতে দিলেন কিন্তু আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা সবই দূর হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্মীর করুণ কাহিনী থেকে থেকে আমার অন্তরে অনুরণিত হয়ে উঠছিল। কোন রকমে খাওয়া শেষ করে আমি সেদিনের মত বিদায় নিলাম। তারপর যে কদিন আমি কাবুলে ছিলাম দুঃখিনী ভগ্নীকে ভুলিনি। কাবুল হতে বিদায় নেবার সময় লক্ষ্মীর পাঠান-স্বামী 'মটরে পোস্তে' এসে পথে খাবার জন্য আমাকে অনেক রকম ফল দিয়ে গিয়েছিলেন।

সমাজের পাপে, সমাজপতিদের জঘন্য মনোবৃত্তির দরুণ বাংলার কত লক্ষ্মী যে এরূপভাবে দিন কাটাচ্ছেন—কে তার সংখ্যা গণনা করবে ? কে তার জন্য দায়ী ?

কাবুল থেকে গজনী, কান্দাহার ও হিরাত হয়ে একদিন আফগানিস্থান থেকে বিদায় নিয়ে আবার নূতনের উদ্দেশে পা বাড়ালাম।

আতাতুর্কের দেশে

মুস্তাফা কামাল পাশার চিন্তা, ভাবধারা এবং সংস্কার চিরদিন আমার শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করেছে। কামালের গড়া দেশ তরুণ তুর্কীতে যাবার ইচ্ছা আমার বহুকালের। তাই পৃথিবীর পথে বেরিয়ে একদিন তুর্কীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। প্রয়োজনীয় টাকা কড়ি সঙ্গে না থাকায়, আমায় অনেক অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, কিন্তু তুর্কীর সর্বসাধারণের নিকট থেকে আমি যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলাম।

ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে শরীর অবসন্ন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। চলতে চলতে সময় সময় পথের পাশেই শুয়ে পড়তাম, তারপর আবার উঠে চল্‌তে শুরু করতাম। এমনি ভাবে একদিন পথের ধারে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়লাম। আরামের সুখ-শয্যা নয়। হঠাৎ কে যেন আমার হাত ধরে টানল। চোখ খুলে দেখি একজন জেন্দআর্ম। দেখেই বললাম, "ফেটিগি, তোর ডু মন্দে" অর্থাৎ ভয়ানক পরিশ্রান্ত, আমি একজন ভূপর্যটক। জল পিপাসা পেয়েছে ইংগিতে তাকে জানালাম। জেন্দআর্ম তার অফিস থেকে ঘোল তৈরি করে এনে দিল।

কথাবার্তা কিছুই হল না, জেন্দআর্ম কোথায় চলে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই কফি, দই, রুটি, অর্ধসিদ্ধ ডিম একখানা ট্রেতে করে এনে জেন্দআর্ম নিজেই একখানা টেবিলের উপর রাখল। ঘরের সামনেকার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আমাকে খেতে ইংগিত করে পেছন দরজা দিয়ে সে চলে গেল। বুঝলাম জেন্দআর্মের এ আচরণের কি তাৎপর্য, লোকের যখন পেটে ক্ষুধা থাকে তখন খাবারের আইনকানুন সে মানে না। অন্য

লোকের সামনে খাওয়া রীতিসংগত নয়, তাই সে সামনের দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছিলাম। যদি আজ এ অবস্থায় একটি মুসলমান কি অন্য কোন জাতির লোক কোন ছুঁৎমার্গের বিধান-মানা অতিশয় নিষ্ঠাসম্পন্ন কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোকের দৃষ্টিতে পড়ত তবে তার কি গতি হত? একটু চেয়েও দেখত না। বলত, এর পূর্বজন্মের পাপের ফলে এ দুর্দশায় পড়েছে। তখন মনে হল এসব পূর্ব-জন্ম, পরজন্ম মতবাদ পৃথিবী থেকে তাড়াতে হবে—ডিমক্রেসী থাক কিংবা চিরতরে পৃথিবী হতে বিদায়ই নিক। খেতে বসে যখন আমার রাগ হয় তখন বেশী খেতে পারি না। ক্রমাগত নিজের দেশের পাপীদের কথা মনে হওয়ায় আর খেতে পারলাম না। একটা ডিম এবং পেট ভরে জল খেয়ে দু'দিকের দরজা খুলে দিলাম। আমার মনে যেমন আগুন জ্বলে উঠেছিল, তেমনি শরীরটাও হাঁপাচ্ছিল। আমার সংগে একটা ধর্ম-পুস্তক ছিল, ব্যাগ হতে খুলে তা পথের মাঝে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। মনে মনে বললাম, আর ফিলসফি চাই না, প্রচুর হয়েছে। জেন্দআর্ম ঘরে এসেই আমার দিকে না চেয়ে পথের দিকে চাইল। পরিত্যক্ত ধর্মপুস্তকটা কুড়িয়ে এনে ইংগিতে জিজ্ঞাসা করল, এটা কি?

কি তাকে বুঝাব? অনেক চেষ্টা করে একটা শব্দ তৈরী করলাম এবং আমার গ্রামের মৌলবীর কাছ থেকে যে ইরানী শিখেছিলাম তার ব্যবহার করতে পারায় মনে মনে গ্রাম্য মৌলবীকে ধন্যবাদ দিলাম। সেই শব্দটা হলো "কিতাবে শয়তান"। এখানে কিতাব শব্দের অর্থ ধর্ম-পুস্তক। জেন্দআর্ম সেই বইখানা কিন্তু যত্নের সংগে রেখে দিল, ইংগিতে তাতে আমার নাম সই করে দিতে বলল। নাম লিখলাম শুধু—রামনাথ।

আমার শরীরের অবস্থা দেখে জেন্দআর্ম বলল, এই খপ্ খপ্ চপ্ চপ্। তারপর শীষ দিয়ে নিকটেই রেল স্টেশনের অস্তিত্ব জানাল।

আংকারা শব্দটা উচ্চারণ করে আমাকে কতকগুলি পর্বতমালা দেখিয়ে দিয়ে বলল, আংকারা। কাগজে লিখল ৩০০ মাইল। পথের দিকে দেখিয়ে বলল, ভাল না। বুঝলাম দুর্গম পার্বত্য রাস্তা। তারপর ড্রয়ার খুলে একখানা টাইম টেবিল বের করে গাড়ীর সময় দেখাল। তার হাতের ঘড়ি দেখিয়ে গাড়ির সময় বলে দিল। বুঝলাম সকল কথাই, কিন্তু আদানাতে তুর্কী ছেলেরা যে টাকা দিয়েছিল তা পথে নিঃশেষ হয়েছে। পকেট হতে মনিব্যাগটা বের করে তার সামনে ফেলে দিলাম। মনিব্যাগ খুলে যা পাওয়া গেল, তা দিয়ে ভাড়া সংকুলান হয় না। জেন্দআর্ম অনেক চিন্তা করার পর নিজের কোট থেকে বোতামগুলি একটা একটা করে খুলে ফেলল। প্রত্যেকটি বোতাম ছিল তুর্কীর অর্ধ পাউণ্ড। বোতামরূপে যে টাকা ছিল তাই সংগ্রহ করে জেন্দআর্ম রেল স্টেশনে গিয়ে আমার জন্য আংকারার টিকেট কেটে নিয়ে এল। সাইকেলটার জন্য নিয়ে এল একখানা রসিদ।

দুজনে মিলে চললাম রেল স্টেশনে। যারা দার্জিলিংএর রেল স্টেশন দেখেছেন তুর্কীর পার্বত্য অঞ্চলের রেল স্টেশনগুলিও তারা অনুমান করে নিতে পারবেন। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে বৈশিষ্ট্য আছে। স্টেশনে গিয়ে দেখলাম যারা গাড়ীর টিকেট কিনে বসে আছেন, তাদের মধ্যে একজনেরও পুরাতন আমলের পোশাক নাই, সবাই ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত।

সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল। দেখলাম তাড়াহুড়া কেউ করছে না। সবাই দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের মুখে গাম্ভীর্য প্রকাশ পাচ্ছে। গাড়ি এসে প্ল্যাটফরমে দাঁড়াল। কুলি সাইকেলটা লাগেজে নিয়ে গেল। আমার বোঝা জেন্দআর্মই উঠিয়ে নিয়ে আমাকে একহাতে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করল। তারপর একটা সিটে গিয়ে

বসলাম। সিটে আমাকে বসিয়ে জেন্দআর্ম ইঙ্গিতে আমায় বলল, সে একটু বাইরে যাবে, এখনই আসবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই জেন্দআর্ম ফিরে এল, দেখলাম তার হাতে একটা রুটি এবং কতকগুলি পনির। আমার হাতে সেগুলি দিয়ে জেন্দআর্ম যখন বিদায় নেবার উদ্যোগ করল, তখন করমর্দন না করে আমি তার গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করলাম। সে বোধ হয় আমার কৃতজ্ঞতা অনুভব করছিল। জেন্দআর্ম মুষ্টি উঠিয়ে চলন্ত গাড়ির দিকে একটি ইংগিত করল। সেই ইংগিত আমাকে বুঝিয়ে দিলে, তুর্কীতে শুধু পোশাকই পরিবর্তন হয় নি, মনের পরিবর্তনও হচ্ছে।

নিজের কোটের বোতাম ছিঁড়ে তা থেকে টাকা বের করে, একটা অপরিচিত বিদেশীকে দিয়ে দেওয়া বাস্তবিকই মনে একটা বিস্ময় এনে দেয়। তবে এরকম ব্যবহার অনেক দেখেছি এবং নিজেও ঠিক সেরূপ সাহায্য অনেক দেশেই পেয়েছি। কিন্তু চিন্তা হল এই তো মাত্র গড়ন; এর মধ্যেই আবার ভাঙন ধরবে না তো ? নতুন ভাঙনে অবশ্য একটা পাকা গড়নের নিশ্চয়তা আছে। এরই মধ্যে সেই প্রবৃত্তি এদের মধ্যে এসে গেছে। আত্তা তুরুক এখনও জীবিত, এখনও অনেক গ্রামে পুরাতন প্রথা রয়ে গেছে। এখনও তুরুকদের এমন শক্তি গড়ে উঠে নি যে, যে-কোন বৈদেশিক শত্রুর সামনে তারা দাঁড়াতে পারে।

বসে বসে ভাবতে লাগলাম, এদের এ আগুনে ঝাঁপ দেওয়া উচিত কি না। মানচিত্রে দেখেছি স্মার্নার কাছের দ্বীপপুঞ্জ ইতালির অধিকারে। ইতালি ইচ্ছা করলেই যে কোন মুহূর্তে স্মার্না অধিকার করে বসতে পারে, উপরন্তু ইতালির বক্রদৃষ্টি তুর্কীর উপর আছেই। ইতালি রুশিয়ার সংগে একটা মামুলী সন্ধি করেছে বটে, কিন্তু এই সন্ধির মূল্য কি ? রুশিয়ার চারিদিকে শত্রু। স্ট্যালিনের সংগে ট্রটস্কির ঝগড়া হবার কারণই হল

আগে দেশ সামলাও তারপর পৃথিবী জুড়ে বিদ্রোহের আগুন ছড়াও। রুশিয়ার এখনও ঘর রক্ষার ক্ষমতা হয় নি, নতুবা সিংগোরী নদীর দ্বীপগুলি জাপানীদের হাতে একে একে ছেড়ে দেবার দরকার হত না, মানচুলী হতে আন্তং পর্যন্ত রেলপথ বিক্রি করবার কোন কথাই উঠত না। তবে তুরুক জাত—এ জাতের পিঠে কল্জে। ছোটবেলা হতে শুনছি, এরা শুধু লড়ছেই, হয়তো আবার লড়বে, আবার মরবে, আবার শান্তি স্থাপন হবে, আর এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

গাড়ি চলেছে কোথাও প্রবল বেগে, কোথাও ধীরে, কারণ এদিকের রেলপথ পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে। চারিদিকের পাহাড়ের সৌন্দর্য বাস্তবিকই উপভোগ্য। অনেকক্ষণ বসে পাহাড়ের দৃশ্য দেখার পর একজন তুরুক ভদ্রলোক আমার পাশের সিটে বসে ফরাসী ভাষায় আমার সংগে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আমি তাঁকে ইংলিশে বললাম, ফরাসী ভাষা মোটেই জানি না। তিনি ফের স্বর বদলিয়ে ইংলিশে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর ইংলিশ উচ্চারণটা আমার কাছে কড়া ঠেকতে লাগল। মাঝে মাঝে তিনি আমেরিকান ধরনেও উচ্চারণ করতে লাগলেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি তুরুক ?

নিশ্চয়ই। তবে দক্ষিণ আফ্রিকাতে অনেক দিন ছিলাম বলেই আমার ইংলিশ উচ্চারণ ঠিক ঠিক হয় না।

হাঁ, একটু লম্বা করে উচ্চারণ করেন বলে মনে হয়।

এখন ভাষার কথা রেখে দিন, যাবেন কোথায় ?

আপাতত আংকারা। সেখান থেকে হাইদরপাশা হয়ে স্তাম্বুল যাব।

আপনি কি ভূপর্যটক।

হাঁ, আমি বাইসাইকেলে ভূপর্যটন করি।

পথটা একটু খারাপ বটে, এদিকে সাইকেল চলা একটু কষ্টকর। কোন্ কোন্ দেশ আপনি ভ্রমণ করেছেন?

পূর্ব এশিয়া দেখে এসেছি, এবার চলছি ইউরোপে।

এদেশ কেমন লাগছে।

আমার কাছে তো বেশ লাগছে তবে কি না যা ভেবেছিলাম সেরূপ এখনও কিছু দেখছি না।

আপনি কি নতুনের পক্ষপাতী?

আমি ভবিষ্যতের বর্তমান।

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে বললেন, প্রাতে কথা হবে, এখন ডিনারে যেতে হবে। আমি তাঁকে বিদায় দিয়ে পাশের রুটির দিকে চেয়ে দেখলাম। ভাবলাম যাদের হাতে প্রচুর অর্থ আছে, তারাই রেল গাড়িতে ডিনার খেতে পারে। মনে মনে ভাবলাম, তুর্কীতে এমন দিন কখন আসবে, যেদিন প্রত্যেকেই রেল গাড়ীতে চড়ে ডিনারের জন্য টাকার চিন্তা না করে একদম টেবিলে গিয়ে বসতে পারবে? গরীব মজুরের বুঝি পেঠপিঠ নাই, আছে শুধু মোটা পেটওয়ালাদের? সিট হতে উঠে গিয়ে একটু জল খেয়ে শুকনো রুটি চিবোতে লাগলাম। অনেকে হয়ত ভাববে এই যথেষ্ট, ভাগ্যে আজ এই-ই ছিল ইত্যাদি। আমি ভাগ্য বলে কিছু মানি না। তুমি যে দেশে জন্মেছ, তুমি যে স্কুলে পড়েছ, আমিও সে দেশে জন্মেছি, সে স্কুলে পড়েছি। তুমি পেলে সুপারিশের জোরে হাজার টাকা মাইনে, আর আমি পেলাম তিরিশ টাকা মাইনে। এখানে ভাগ্য বলে কিছু নাই, এখানে আছে বঞ্চনা। আমি এই বঞ্চনা ভাগ্য বলে গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত নই।

এরূপ চিন্তায় বেশ রাগ হয়েছিল, তাই রুটিতে শক্ত করে কামড় দিয়ে বড় বড় টুকরো মুখে দিতে লাগলাম। পনিরের কথা হঠাৎ মনে

হল, পনির উঠিয়ে তা থেকেও একটা বড় টুকরো মুখে তুলে দিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের নামে গাড়িতেই পদাঘাত করলাম। পাশের লোকটি আমার এরূপ অদ্ভুত ব্যবহারে হয়তো আমাকে পাগল ভেবেছিল। ভাবুক পাগল, তাতে বয়ে গেল। যারা ভাগ্য মেনে চলে তারাই যে ঠিক পাগল, তারা কি সে কথা জানে? যারা দশের উপকারের জন্য চিন্তা করে, দশের সাহায্য করতে প্রাণ পর্যন্ত দিতে চায়, তাদের এই দশজনাই প্রথমেই মূর্খ, পাগল ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে থাকে; আমি তো কোন্ ছার। অধিকক্ষণ এরূপ চিন্তায় কাটল না; চোখ ভরে ঘুম এল। বসে বসে ঘুমোতে লাগলাম। আমার কাছে এখন আর কিছুই নাই বললেও দোষ হয় না, তাই রাত্রে ঘুমোবার জন্য বিছানা ভাড়া করতে পারি নি। আমার মত আরও কয়েকজন অর্থহীন ছিলেন, তাঁরাও বসে বসেই রাত কাটালেন। আমার শরীর দুর্বল থাকায় বসে বসেও ঘুম আসছিল। মাঝে মাঝে যখনই ঘুম ভাঙছিল তখনই বিশালবপু দরিদ্র তুরুকদের বসা-অবস্থা দেখে বাস্তবিকই দুঃখ হত। যে সকল লোক পুরুষানুক্রমে তুরুক জাতের মঙ্গলার্থ যথাসর্বস্ব দিয়ে আসছে, তাদেরই আজ পুঁজিপতিরা বলছে গরিব। সে যা হোক, তুরুক জাত হয়তো সত্বরই আমেরিকার মত রেলগাড়ীতে শ্রেণীবিভাগ উঠিয়ে দিয়ে সকল বিপদ হতে রক্ষা পাবে।

গত রাত্রের তুরুক ভদ্রলোক প্রভাতেই এসে হাজির। তাঁকে নমস্কার জানাবার পূর্বেই তিনি ইংলিশে গুড মর্নিং করে বসলেন এবং তুর্কীর রেল গাড়ীতে কেমন কাটল জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি বললাম, আপনাদের রেলগাড়ী একেবারে জাপানী ধরণের, তাই সিটে বসে থেকে রাত কাটাতেও অসুবিধা হয় নি।

ভারতের রেলগাড়ী কিরূপ?

ভারতের রেলগাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা না করাই ভাল।

কেন ?

ওসব হয়েছে সৈন্যদের চলাফেরা করবার জন্য, প্যাসেন্‌জারের জন্য নয়। আচ্ছা বলুন তো আংকারা গিয়ে থাকি কোথায় ?

সে ভাবনা আপনার করতে হবে না।

কেন ?

আপনাকে স্টেশন হতেই পুলিশ এসে নিয়ে যাবে এবং আপনার পকেটের টাকার অনুপাতে হোটেল বের করে দেবে।

পুলিশ এরূপ সদয় কেন ?

এরূপ সদাশয়তা আমাদের প্রতি নয়, শুধু আপনার প্রতি। হয়তো আপনি ভারতীয় ধর্মের নামে পাগল হয়ে এখানে আবার কি করে বসবেন, তাই পুলিশের একটু তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে।

আমাদের দেশের কি কেউ ধর্মপ্রচার করতে এদেশে এসেছিল ?

ধর্মপ্রচার করতে আসে নি, আতা তুরুককে হত্যা করতে এসেছিল। তারপর হতে কোন ভারতবাসীকে আর আংকারাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। তবে আপনার বিষয় পৃথক। আপনি নাকি ইসলাম ধর্মের লোক নন, সে জন্যই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আপনি এসব কথা জানলেন কোথা হতে ?

আমিও একজন গোয়েন্দা।

ভাল, ভাল, মশাই, শুনে সুখী হলাম, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। গোয়েন্দার সঙ্গ বেশ ভালই। আমি তুর্কীতে এসেছি তুরুকদের সংগে শক্রতা করবার জন্য নয়, মিত্রতা করবার জন্যই।

তা না জানলে আপনি আংকারায় প্রবেশ করতে পারতেন না। এখন বলুন টাকাকড়ি কি আছে। আপনার থাকার বন্দোবস্তটা করে

দিতে পারলেই আমার কর্তব্য সমাপন হয়।

মনিব্যাগটা দিয়ে বল্‌লাম যা আছে এতেই।

ভদ্রলোক মনিব্যাগ পরীক্ষা করবার সময় দুটি তুর্কীর পাউণ্ড আপন পকেট হতে খুলে যে আমার মনিব্যাগে রেখে দিলেন, তা আমি ধরতে পেরেছিলাম কিন্তু কিছুই বলি নি।

তিনি বললেন, এ যে মাত্র দুটি পাউণ্ড।

দুটি পাঁচটির কথা এখানে মোটেই ওঠে না। আপনি যেখানে আমাকে রেখে আসবেন আমি সেখানেই থাকব।

হ্যাঁ, তাই হবে। এখন নিশ্চিন্ত মনে এক পেয়ালা কফি খান, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ধন্যবাদ দিয়ে গোয়েন্দাকে বিদায় দিলাম। কিন্তু মনে মনে চিন্তা হ'ল, আমার মত লোকের পেছনে গোয়েন্দা রাখবার দরকার কি। দেশে এবং বিদেশে এমন কোন কাজ করি নি যাতে করে আমার পেছনে তুর্কী-সরকার গোয়েন্দা লাগাতে পারে। গোয়েন্দার আচার ব্যবহার দেখলে আবার গোয়েন্দা বলে মনে হয় না। দুটি পাউণ্ড এরই মধ্যে মনিব্যাগে রেখে দিয়েছে, হয়ত কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। মনে করলাম, দু পাউণ্ড চার পাউণ্ডে এ পৃথিবীর লোকের দুঃখ ঘোচে না। পাউণ্ড, শিলিং, ডলার টাকাকড়ি এসবই হল পৃথিবীর অশান্তির কারণ। অতএব এসব দিয়ে যদি লোভ দেখানো হয়, তবে বড়ই ভুল করা হবে। তারপর মনে হল ভুল করেছি আমি, ভদ্রলোক দয়া করেছেন মাত্র, এর বেশী এক্ষেত্রে আর কিছুই হতে পারে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছিলাম আর ঐ সব কথা ভাবছিলাম। কফি যে কখন রেখে গেছে তা জানতে পারি নি। হঠাৎ কফির কথা মনে হতেই পেছনে চেয়ে দেখি এক পেয়ালা কফি আমার

কাছে হাত-টেবিলের উপর পড়ে আছে কফি তখন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, তবুও তা খেয়ে ফেললাম। অনেকদিন ভাল কফি খাই নি, তাই ঠাণ্ডা কফিও ভালই লাগল।

আংকারা আর বেশী দূর নয়। সামনের পর্বতমালা হঠাৎ সরে যাওয়ায় একটা উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য উপত্যকা দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু বসবাসের পক্ষে তেমন অনুকূল নয়। কারণ পার্বত্য উপত্যকায় জল হয় প্রচুর পাওয়া যায়, নতুবা যা পাওয়া যায় তা দ্বারা একটা সহরের লোকের পোষায় না। এই পার্বত্য উপত্যকার মাঝেই আংকারার অবস্থান। দূর থেকে শহরের দৃশ্যাবলী নয়ন-পথে এল। মনে হল শহরখানা এখনও ভাল করে গড়ে ওঠে নি। গাড়ি স্টেশনে লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পূর্ব-পরিচিত গোয়েন্দা এসে হাজির হয়ে বললেন, ঐ যে দুজন লোক দেখছেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের সঙ্গে চলে যান। গাড়ি হতে অতিকষ্টে নেমে সাইকেলখানা লাগেজ হতে নিয়ে এসে পিঠ-ঝোলাটা তার উপর বেঁধে নির্দিষ্ট দুজন লোকের সঙ্গে চললাম।

একটু এগিয়ে গিয়েই ডান হাতের দিকে বড় বড় হোটেল পড়তে লাগল। ডিপ্লমেট, তথাকথিত ব্যবসায়ী, পর্যটক এ্যানথ্রপলজিষ্ট, প্রাণি-তত্ত্ববিদ, ভূতত্ত্ববিদ এসব লোক এই হোটেলগুলিতে থাকেন। পথের পাশে একজন হোটেল-বয় দাঁড়িয়েছিল, সে বোধ হয় জিজ্ঞাসা করল; এ আবার কিরূপ জীব? সঙ্গীদ্বয় ইসারা করে তাকে কথা বলতে বারণ করল। আমরা নির্বিবাদে এগিয়ে গিয়ে আতা তুরকের প্রস্তরমূর্তিকে ডানদিকে রেখে বাঁ দিকে ঘুরলাম। সামনেই একটি ছোট গলি, তারই উপর একটা তুরুক হোটেল। গোয়েন্দাদ্বয় আমাকে সে হোটেলে পৌছিয়ে দিয়ে আমার রুম ঠিক করে দিল এবং কি কি খাব তা জেনে হোটেলওয়ালাকে যথোচিত ব্যবস্থা করতে বলে দিয়ে প্রস্থান করল।

এসব হোটেলে গরম জল পাওয়া যায় না। ইংলিশ কায়দায় এসব হোটেলকে নেটিভ হোটেল বলা চলে। পূর্বে তাই বলা হত, কিন্তু এখন আর নেটিভ হোটেল নয়, এখন বলা হয় তুরুক হোটেল। হোটেল-ওয়ালাকে বলে স্নানের বন্দোবস্ত করে নিয়ে স্নান করলাম এবং নিকটস্থ এক রেঁস্তোরা থেকে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। শরীরে যেন ম্যালেরিয়া প্রবেশ করেছে বলে মনে হল; নতুবা এত বিশ্রামের পরও শরীর সতেজ হচ্ছে না কেন?

বিকালে দরজা খুলে দেখি একজন লোক নামাজ পড়ছে। একটু দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া দেখলাম। আমাদের দেশের লোক নামাজ পড়ে পশ্চিম দিকে মুখ করে; এরা নামাজ পড়ে দক্ষিণ দিকে মুখ করে। কিন্তু লুকিয়ে নামাজ পড়ার অর্থ কি?

কিছু না বলেই হোটেল হতে বের হয়ে একটা ওষুধ কিনে এনে আবার মানচিত্র পাঠে মন দিলাম। ইচ্ছা হচ্ছিল তুর্কী ছেড়ে পালাই। তুর্কীতে যেন এখনও পূর্বদেশের গন্ধ লেগে আছে। পূর্বদেশের গন্ধ ছাড়াতে পারলেই যেন সুখী হই। কিন্তু আরও অনেক দূর না গেলে পাশ্চাত্য সভ্যতার দর্শন মিলবে না।

বিকালে কোথাও গেলাম না। খেয়ে এসেই শুয়ে থাকতে হল। পরদিন প্রাতে কুইনিন এবং এস্পেরিন্ এক সঙ্গেই খেয়ে নিলাম। খাবার পর একটু জ্বরের ভাব হল; তারপর ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাবার পরই শরীরে শক্তি এল। শরীরের দুর্বলতা আর আছে বলে মনে হল না, ক্ষুধাও বেশ হল। কিন্তু খাব কি? এদিকে গ্রীকদের কোন হোটেল নাই। দুএকখানা আর্মেনী হোটেল আছে, তাতে যবের রস বিক্রি হয় না। সামান্য রুটি দুধের সঙ্গে খেয়ে নিয়ে ফের রুমে ফিরে এলাম। দিনটা কাটল বেশ ভালই। তৃতীয় দিন প্রাতে আমি নতুন মানুষ।

আমার অবসাদ চলে গেছে, আংকারা দেখবার প্রবল বাসনা হল। ভাল করে বেশভূষা করে সাইকেলে গিয়ে উঠব, এমন সময় ট্রেনে পরিচিত গোয়েন্দা এসে বললেন, চলুন, পুলিশ-স্টেশনে যাই।

বিনা বাক্যব্যয়ে তার সংগে চললাম। পাসপোর্ট এবং অটোগ্রাফ বই সঙ্গেই থাকে। এরূপ অটোগ্রাফ বই সঙ্গে থাকলে বিপদ-আপদের আশঙ্কা কম থাকে। লোকে বোঝে, লোকটা ঠিকঠিক পর্যটক। পর্যটকের সত্যিকারের শত্রু এ দুনিয়ায় নাই। যদি কেউ শত্রু হয়, যদি কোন রাষ্ট্র পর্যটকের সংগে বাদ সাধে, তবে ধরে নিতে হবে সেই রাষ্ট্রে ঘুন ধরেছে। পুলিশ-স্টেশন একটু দূরে। পুলিশ-স্টেশন যে স্থানে অবস্থিত, সে স্থানের দৃশ্য অনেকটা শিলংএর লাবানের মত।

সাইকেলটা পথের উপর দাঁড় করিয়ে রেখে অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। বেশীক্ষণ বসতে হল না। পুলিশের কর্তা ডেকে পাঠালেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি একেবারেই ইংলিশ জানেন না। ফরাসী ভাষা বোধ হয় তুর্কী হতে ভাল বলতে পারেন, কারণ দোভাষীর সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন তখন শুনছিলাম তিনি প্রায়ই ফরাসী শব্দ তুর্কী শব্দের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন। কথা শুরু হল।

আপনাব নাম কি ?

আমার নাম রামনাথ বিশ্বাস।

আপনি কোন্ ধর্ম মেনে চলেন ?

আমি যে ধর্ম মেনে চলি তাকে বলা হয় বৌদ্ধ ধর্ম।

আপনাদের ধর্ম মতে ভগবানের স্বরূপ কি ?

যার কাছে যেমন।

তবুও বিশেষ কোন আইন নেই ?

না, বিশেষ কোন আইন নেই। যারা বলে ভগবান নেই, আমাদের

ধর্মমতে তাদেরও সমাজে স্থান আছে।

আপনি ভগবান সম্বন্ধে কি মত পোষণ করেন ?

ভগবান সম্বন্ধে আমার কোন মত এখনও ঠিক হয় নি, তবে যারা সদাসর্বদা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, তাদের প্রতি আমার ভয়ানক ক্রোধ হয়। ধরুন, যদি একটা লোক আপনাকে অনর্থক ডাকে, তবে আপনি কি করবেন ?

তার দুগালে দুটো চড় লাগাব।

আমারও তাই ধারণা। এসব বাজে ডাকাডাকির কোন মূল্য নাই। তবে এটাকে আমি একটা চাল বলতে পারি গরিব ঠকাবার জন্য।

আপনি মুস্তাফা কামালের সঙ্গে দেখা করতে চান ?

না, মহাশয়।

কেন ?

না সাক্ষাৎ করাই ভাল। জানেন তো আমি মুসলমান ধর্মের লোক নই, কিন্তু টাকার মাহাত্ম্য এখনও আমার মন জুড়ে আছে। অতএব টাকার জন্য কি করে বসি কে জানে ? দ্বিতীয় কথা হল, এমন ধারা লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে, তাদের কাজের ফলাফল দেখাই ভাল আপনাদের গ্রামাঞ্চলের পরিবর্তন দেখেছি। প্রত্যেকটি পরিবর্তন প্রত্যেক মুহূর্তে আতা তুরুকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এনে দিয়েছে। আরও এগিয়ে যাই, যতই দেখব আতা তুরুকের কর্মতৎপরতা, ততই বাড়বে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা।

পুলিশের বড় কর্তা আর কথা বাড়ালেন না। আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। যারা উপস্থিত ছিল, সবাই করমর্দন করল, তারপর আমাকে পথের ধার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। বুঝলাম, আমার প্রতি তাঁর আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এমন কিছু করে যেতে হবে

যাতে তুর্কীর পুলিশ বোঝে, ভারতবাসী সবাই ধর্মান্ধ নয়, টাকার ভক্ত নয়। বুঝেছিলাম, টাকা আমার জন্য চাঁদা রূপে আসবে, তা ফিরিয়ে দিতে হবে। টাকা এসেছিল, তা হতে মাত্র পাঁচটি পাউণ্ড রেখে বাকি টাকা ফেরত দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, পাঁচ পাউণ্ডই এখানকার দরকারের পক্ষে যথেষ্ট। আমি পুঁজিবাদী নই, আমি পথিক, অতএব বাকি টাকা সসম্মানে ফেরত দেওয়ার জন্য ভাববার মত কিছুই নাই।

সেদিনই বিকাল বেলা সিনেমা দেখতে গেলাম। সিনেমার টিকিট আমাকে কিনতে হয় নি। পর্যটকের পরিচয়-পত্র দাখিল করতেই টিকিট বিক্রেতা টিকিট ঘর ছেড়ে এসে আমাকে একটা সিটে বসিয়ে দিয়ে গেল। এখানে লক্ষ্য করেছিলাম, আমাদের দেশের টিকিট বিক্রেতা এবং বিদেশের টিকিট বিক্রেতার মধ্যে কত প্রভেদ। আমাদের দেশের সিনেমা টিকিট বিক্রেতা কাউণ্টার ছেড়ে যেতে পারে না—এটি হল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা—উপরওয়ালা কর্মচারীর আদেশ ছাড়া কোনও কাজ তার করবার অধিকার নাই। যদি করে, তবে তাকে বারবার মেয়েলি কায়দায় কৈফিয়ৎ দিতে হয়। উপরন্তু এরূপ দুঃসাহসিক কাজের জন্য টিকিট বিক্রেতার চাকরি যাবারও ভয় আছে। চাকরি যাবার ভয় আর মরণের ভয় আমাদের দেশে একই রকমের। কিন্তু তুর্কীতে চাকরি যাবার ভয় আর মরণ-ভয় এক নয়। সেজন্যই বোধ হয় কারও অপেক্ষায় না থেকে টিকিট বিক্রেতা ন্যায্য কাজ উপযুক্ত ভাবে সমাধা করেছিল।

সিগারেট ফুঁকা আমার একটা অভ্যাস। তুর্কীর সিগারেট একশটা খেলেও গলায় লাগে না, অথবা কাশি হয় না। কারণ তুর্কীর সিগারেটে কোন কেমিক্যাল দ্রব্য ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। তামাক কেটে শুধু কাগজে মুড়ে দেওয়ার বেশি কিছুই নয়। তামাকপাতার কটুত্ব অনুযায়ী সিগারেটের দাম ধার্য করা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, কম কটু তামাক

পাতার দাম বেশী। মিশর এবং বুলগেরিয়াতে কিন্তু তার বিপরীত। আমাদের দেশেও তাই।

সিটে বসেই সিগারেট ধরালাম। অমনি পাশে-বসা লোকটি আমাকে বললেন, সিগারেট খাওয়া নিষেধ এখানে। সিগারেট নিবিয়ে দিয়ে সিনেমা দেখায় মন দিলাম। সেদিন ছিল আতা তুরুকের একটা লেকচার। যখন তিনি লেকচার দিচ্ছিলেন তখন মাঝে মাঝে কতকগুলি লোক তাঁর লেকচারে বাধা দিচ্ছিল এবং ধর্মের জয় বলে শ্লোগান দিচ্ছিল। আতা তুরুকের তখনকার মুখের দৃশ্য প্রণিধানযোগ্য। চোখ হতে যেন আগুন বের হচ্ছিল, গলার শিরাগুলো দাঁড়িয়ে উঠছিল এবং হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উপরে উঠছিল। চলচ্চিত্রে লেনিনের লেকচারও দেখেছি, তাতে প্রকাশ পেয়েছে রিজনিং শক্তির বিকাশ, মাঝে মাঝে রাগের প্রকোপ, কিন্তু এখানে রিজনিং এবং রাগ একসঙ্গে মিশেছে আদেশের সঙ্গে। দর্শকদের মধ্যে যারা ছিলেন, আমি দেখছিলাম তাঁদের মুখমণ্ডলের অবস্থা। যখনই বিপক্ষের দল চীৎকার করছিল তখনই দর্শকগণ যেন রাগে গরগর করে উঠছিল। আতা তুরুকের প্রতি সর্বসাধারণের যে সহানুভূতি ছিল তারই প্রমাণ দর্শকের মুখে ফুটে উঠছিল।

যে ভদ্রলোক হলের ভেতর সিগারেট খেতে নিষেধ করেছিলেন, সিনেমা সমাপ্ত হবার পর তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর পিতা আমেরিকায় ডাক্তারী করতেন, যুবক তাঁর পিতার সঙ্গে আমেরিকায় ছিলেন। তাই আমেরিকান বলতে পারেন। আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, সিনেমায় বসে সিগারেট খেলে সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে অনেক রোগের বীজাণু একের মুখ হতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এখনও তুর্কী দূষিত বীজাণু হতে মুক্ত হয় নি, এখনও তুরুক জাতের মধ্যে অনেক কুৎসিত রোগ এবং বদদোষ আছে, ক্রমে সবই হয়তো

লোপ পাবে।

ভদ্রলোক একজন যুবক, আমারই বয়সী ছিলেন। বন্ধুত্ব বেশ ভাল করেই হল। তিনি আমার হোটেলে এলেন এবং নানা কথার পর বললেন, আগামী কাল আমাকে নিয়ে বেড়াতে বের হবেন। ভদ্রলোকের সদাশয়-তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং তাঁর চলে যাবার পর অনেকক্ষণ তাঁরই কথা ভেবেছিলাম।

পরদিন প্রাতেই তিনি এলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি তাঁর কথা তাঁর যাবার পর ভেবেছিলাম কিনা। তাঁকে বললাম, তাঁর কথা অনেকক্ষণ ভেবেছিলাম।

এরূপ হবারই কথা। যাদের দেশের প্রতি টান নাই দেশের কথা ভাবে না, তারাই এরূপ করে অন্যের কথা ভাবে।

ভদ্রলোকের কথাটা শুনে একটু লজ্জিত হয়েছিলাম। বললাম, চলুন এখন যাবেন কোথায়?

যাব আর কোথায়? চলুন একটা মসজিদ দেখিয়ে আনি, আপনাদের ধর্মে মতিগতি আছে, স্বর্গে যাবার প্রবল বাসনা আছে এবং মসজিদই হচ্ছে স্বর্গে যাবার প্রকৃষ্ট রাস্তা।

বেশ ভাল করে বুঝলাম, এই ভদ্রলোকও সরকার পক্ষের কেউ হবেন। নতুবা নিজে যেচে প্রাতেই এসে হাজির হতেন না। তাঁকে বললাম, মসজিদে যেতে আমি মোটেই রাজি নই। যাব দরজির দোকানে, নাপিতের দোকানে এবং ধোপার বাড়ী। এসব হয়ে গেলে যাব বৈদেশিক অফিসে।

আর কোন কথা হল না। আমরা সর্বপ্রথম গেলাম একটা নাপিতের দোকানে। আংকারায় নাপিতের দোকান দুরকমের। একশ্রেণীর দোকান হল শুধু পুরুষের জন্য। দ্বিতীয় দোকানে গিয়ে রমণীরা কেশচর্যা করে আসেন। আমরা রমণীদের নাপিতের দোকানে অনেকক্ষণ দাঁড়ালাম।

কয়েকজন রমণীও সেখানে এলেন এবং তাদের কি করে কেশের বিন্যাস হয়, তাই দেখলাম। সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করে অবগত হলাম, এই রমণীরা সকলেই অফিসের কেরাণী। ধোপার বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম স্টিমে কাপড় কাচা হচ্ছে এবং প্রত্যেক দোকানে জনদশেক লোক ইস্ত্রি নিয়ে কাপড় ইস্ত্রি করছে। সর্বশেষে আমরা গেলাম দরজির দোকানে। সেখানে ইউরোপীয় "কাট্" ছাড়া অন্য কোন "কাটের" ব্যবস্থা নেই দেখে মনে হল, আতা তুরুক ভয়ানক জ্ঞানী, তিনি গোড়ায় আঘাত করেছেন। ইউরোপীয় পোশাক ছাড়া সেখানে কিছুই পাওয়া যায় না, তাই বাধ্য হয়ে ইউরোপীয় পোশাকই পরতে হয়। এসব স্থান দেখার পর সঙ্গী বল্‌ল, এসব স্থান দেখে আপনার কি মনে হল?

স্টিম লণ্ড্রিতে কাজ হচ্ছে দেখলাম। ধোপা-শ্রেণী বলে তুর্কীতে যে এক শ্রেণীর লোক ছিল, এতে তারা লোপ পাবে! নাপিতের দোকান দেখে মনে হল, এসব নাপিতের দোকানে শুধু ইউরোপীয় ধরনেই ক্ষৌরকর্ম হতে পারে। দরজির দোকানে দেখলাম শুধু ইউরোপীয় ধরনেই কাপড় কাটা হচ্ছে। আরব ধরনে পোশাক তৈরি করতে হলে যেতে হবে দামাস্কাস নয় বেরুদ।

'আপনি দেখছি একদম ইউরোপভক্ত—তিনি প্রশ্ন করলেন। আমি ইউরোপ ভক্ত নই, আমি দরকারের ভক্ত। আপনাদের দেশের একদিকে রাশিয়া, অন্যদিকে ইউরোপ। রাশিয়া নূতন মতে, নূতন পথে চলছে, এই পথ যে পৃথিবীর ভবিষ্যতের একমাত্র পথ তা যার চোখ আছে সেই বোঝে। তার ঝুঁকি যে আপনাদের গায়ে এসেও পড়বে তা অস্বীকার করলে চলবে না। দুইটি পরিবর্তনশীল দেশের মাঝে বেঁচে থাকতে হলে আপনাদেরও পরিবর্তন করা সমূহ দরকার।

সাথী আমার কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন বলে মহানন্দে সেই-

দিনই বিকাল বেলা তুর্কীর বৈদেশিক অফিসে আমাকে নিয়ে যান। সেখানে আমি কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নি, শুধু বাড়িগুলি দেখে এবং সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই ফিরে আসি। তুর্কীর সাংবাদিক আমেরিকান ধরনের নয়, অথবা অন্যান্য ইউরোপীয় প্রথায়ও ওরা চলে না; তারা বাস্তবিকই স্বাধীন। তবে তাদের মধ্যে একটা পরাধীনতা আছে, সেটি হল—তারা কোন ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষ জোড়জোড় করে কথা বলতে পারে না। আমাকেও তারা প্রথম প্রথম বোধ হয় ভেবেছিলেন "তারিখ" অথবা "ছাইয়া দুনিয়া"। তারিখ মানে যারা ইতিহাস লিখেন ও ছাইয়া দুনিয়া যদিও ভূপর্যটক বুঝায়, কিন্তু তার সবাসরি মানে হয় "মুসাফির"—যিনি ধর্মের ইতিহাস লেখেন। কিন্তু সাথীর কাছ থেকে যখন অবগত হলেন আমি ধর্মের ইতিহাস লেখক নই, নতুনের ইতিহাস লেখক, তখন তাঁরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। নানারূপ কথা হল। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, বলতে পারেন এই পৃথিবীতে কি এমন কোনও ধর্ম আছে, যাতে ভগবানের পূজা করতে হয় না, ভগবানকে মানতে হয় না ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে।

সে কি ধর্ম মশায় ? আমরা সবাই সে ধর্ম গ্রহণ করব।

সেই ধর্মের নাম বৌদ্ধ ধর্ম। ভগবানের নাম ধাম নেই ; যার নাম-ধাম নেই, তার পূজা হয় কিসে ?

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা ছিল না তবুও শোনা-কথা যা জানতাম, তাই তাঁদের কাছে সম্পূর্ণভাবে বলে এসেছিলাম সাংবাদিকগণ আমাদের পানাহারের বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং আমার আসার সংবাদ তুর্কীর সর্বত্র প্রচার করেছিলেন। রয়টারের এবং আমেরিকার প্রেসের দুজন প্রতিনিধি সেখানে হাজির ছিলেন, তাঁরা শুধু তাঁদের

গাম্ভীর্য বজায় রেখে সময় কাটিয়ে দিলেন। আমার অস্তিত্ব তাঁরা গ্রাহ্যও করেন নি, আমিও তাঁদের অস্তিত্বকে অবজ্ঞা করেছিলাম।

সারাদিন উঁচু নীচু পথ হেঁটে পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম। বিকালে সাথীর বাড়ীতে এসে আমেরিকান খাদ্য খেয়ে, তৃপ্ত হয়ে হোটেলে ফিরলাম। এতদিন হোটেলের মালিক আমার সঙ্গে কথা বলতে সংকোচ বোধ করতেন, কিন্তু আজ নিজেই নিতান্ত আপন জনের মত আমার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ শুধু হুঁ হাঁ করে কাটিয়ে ইঙ্গিতে বললাম, সাথী এলে পর কথা হবে। সাথী যখন এলেন, তখন হোটেলের মালিক অন্য কাজে চলে গেছেন, কথা আর তাঁর সঙ্গে হল না। আমরা রুমে বসে তুর্কীর কি করে পরিবর্তন হচ্ছে, তারই কথা আলোচনা করতে লাগলাম।

আতা তুরুক বুর্জোয়া ধরণের লোক, ইউরোপের লোক সাধারণত একথাই বলেন। কিন্তু তুর্কীর নবীনের দল তা মানতে রাজি নন। প্রত্যেকটা রাষ্ট্রই এক শ্রেণীর লোক দ্বারা শাসিত, এবং সেই শ্রেণীর লোক স্বভাবতই মুষ্টিমেয়। অতএব মাইনরিটি সকল সময়ই মেজরিটির উপর প্রভুত্ব করে আসছে, যদিও রাশিয়ায় কমিউনিজ্‌ম্ প্রবর্তিত হবার পর বলশেভিকরাই মেনশেভিকদের প্রতিপত্তি মেনে চলে নি। আতা তুরুক সর্বসাধারণের প্রতিনিধি, না মুষ্টিমেয় লোকের প্রতিনিধি—তাই ছিল আমার জ্ঞাতব্য বিষয়। জানতে পেলাম, আজ আতা তুরুক মুষ্টিমেয় লোকের প্রতিনিধি মাত্র, সর্বসাধারণের নন। কিন্তু সর্বসাধারণ এতদিন চলেছিল পুঁজিবাদীদের ইঙ্গিতে। তাদের শিক্ষা ছিল না, ভালমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা ছিল না; তাই মুষ্টিমেয় লোকের নায়ক সমষ্টিকে সৎপথে আনবার যে জোর-জুলুম করেছেন, কিম্বা কালক্রমে করতে বাধ্য হবেন, সেজন্য মাথা ঘামাতে নেই। কিন্তু দেখতে হবে এই মুষ্টিমেয় লোক অর্থাৎ আত

তুরুক এবং তাঁর অনুচরগণ সব সময় নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা রাখতে চান কিনা ? যদি সেরূপ তাঁদের ইচ্ছা থাকে, তখনই বুঝতে হবে, সেই মুষ্টিমেয় লোক এবং তাঁদের প্রতিনিধি ডিক্‌টেটর ছাড়া আর কিছুই হতে পারেন না। আতা তুরুক সে পথের পথিক নন, তিনি তুর্কীর প্রেসিডেণ্ট মাত্র। তিনি চান, সর্বসাধারণ তাদের ভুল বুঝে শিক্ষার গুণে উন্নতি করুক, এবং শেষ পর্যন্ত মাইনরিটি এবং মেজরিটি এক হয়ে যাক। এ সব কথা আমার নিজের কথা নয়, আমার সাথীর। সত্যি বলতে কি, এত দূর তলিয়ে দেখার লোক আমি নই। তিনি আরও বলেছিলেন, দু-রকমে পতিতোদ্ধার হয়। তুর্কী যে পথে উদ্ধার পেয়েছে, সেই পথ বড়ই দুর্গম। কিন্তু তুর্কীর সে পথ বেশী কণ্টকাকীর্ণ ছিল বলেই আতা তুরুক মুষ্টিমেয় লোক হাতে রেখে এত বড় রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে পেরেছেন। দ্বিতীয় পথ হল—সাধারণকে জাগিয়ে সাধারণের সাহায্যে সাধারণের প্রাপ্য আদায় করে নেওয়া—ঠিক যেমনটি হয়েছে রাশিয়ায়।

আমি বললাম, আপনাদের দেশে কি অর্থনীতির দিক দিয়েও রাশিয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে বলে মনে করেন ?

নিশ্চয় হবে, হতেই হবে। নতুবা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে না। এরই মধ্যে মজুরেরা দল গঠন করে তাদের দাবী জানাচ্ছে, চাষীরা তাদের পরিশ্রম-জাত দ্রব্যের দাম বাড়াবার জন্য এবং উৎপাদন যাতে বেশী না হয় সেদিকে প্রয়াসী হয়েছে, তা কি আপনি বোঝেন নি ?

না, আমার সেরূপ সুযোগ হয়ে ওঠে নি। মাঠগুলি খালি পড়ে আছে। কৃষিকর্ম যদি এসব মাঠে করতে হয়, তবে অশ্বের পরিবর্তে ট্রাকটর চালানই দরকার মনে হল। বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া এসব নীরস মাঠে রসের সঞ্চার হবে না।

তাই যদি করতে হয়, তবে আমাদের সমবেতভাবে কৃষিকার্য চালাতে

হবে। সে সময় এখনও আসে নি।

সাথীর কথা হতে বুঝতে পারলাম, আমেরিকান ধরনেই তাদের কৃষি-কর্ম চলছে। উৎপাদন-শক্তিকে হ্রাস করে, অল্প জিনিস দিয়ে বেশী টাকা আদায় করা বর্তমানে কৃষকদের উদ্দেশ্য, কিন্তু তার পরিণাম ভাল নয়। টানাহেঁচড়ায় থেকে জাতের গড়ন হয় না, ভাঙ্গন বাড়ে। সাথীর মনে দুঃখ হবে বলে তা বলি নি। তবে বার বার বলেছি, অবস্থা বুঝে চলতে হবে। উত্তরে রাশিয়া একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে, আর মনে রাখতে হবে আর্মেনীদের প্রতিহিংসা। হিংসায় প্রতিহিংসার পরিসমাপ্তি হয় না। প্রতিহিংসাকে সাম্যের সোহাগে ভাসিয়ে দিতে হবে।

আমার কথায় সাথীর মন উঠল না দেখে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, জাতীয়তাবাদকে অপদস্থ করতে হলেই ইন্‌টারন্যাশন্যালিজমের দরকার। একটা ধর্মের দৌরাত্ম্য যখন চরমে উঠে, নূতন আর একটা ধর্ম অনেক সুযোগ সুবিধা এনে দিয়ে পুরাতনটাকে কি লোপ করে দেয় না?

রাত্রি অনেক, সাথীর চোখে ঘুম জড়িয়ে এসেছিল। তিনি বিদায় নিলেন, আমিও শান্তির ক্রোড়ে নিজেকে ঢেলে দিলাম। রাত্রে তন্দ্রার মধ্যে আবোল-তাবোল বকেছিলাম বলে হোটেলের মালিক দু'একবার দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে "কাফের" শব্দটা বিরক্তিসূচক-কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁদের ধারণা, ঘুমের ঘোরে যাদের প্রলাপ হয়, তারা ভূতাশ্রিত। কিন্তু অজীর্ণতা যে তার কারণ, সে সংবাদ রাখতেও তাঁরা ভয় পান।

আংকারার দ্রষ্টব্যস্থান বলে এখনও কোন পদার্থ গড়ে ওঠে নি। মাত্র একটা স্ট্যাচু হয়েছে, আতা তুরুকের। স্ট্যাচু মিউজিয়াম দেখে সমসাময়িক অবস্থার একটা ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বর্ত-মানের ছবি নেওয়া দুষ্কর। তাজমহল দেখে যদি ভারতের বর্তমানের

নির্দেশ করতে হয়, তবে মারাত্মক ভুল হবে। সেইজন্য আংকারার বাড়িঘরের প্রতি আমি তত লক্ষ্য করি নি। যে কয়েকটা বৈদেশিক অধ্যুষিত হোটেল আছে, সেখানে মাঝে মাঝে বেড়াতে গিয়ে পর্যটকগণের শুষ্ক মুখের আমোদ দেখতাম। যারা "ডিপ্লোমেটের" কাজ করেন, তাঁদের মানসিক অবস্থা বাস্তবিকই আশ্চর্য রকমের। মনের ভাব গোপন রেখে তাঁরা স্বাভাবিক লোকের মতই হাসছেন, খেলছেন, আমোদ করছেন। ভাবলাম এরূপ অভিনয় আমার দ্বারা সম্ভব হবে কি? নিশ্চয়ই না। সাথীর কল্যাণে আংকারায় ডিপ্লোমেটদের চলাফেরা বেশ ভাল করে লক্ষ্য করেছি। বিদেশে বিশেষ করে আংকারায়, সে সুযোগ অনেক লোকেরই হয়।

তুর্কী সরকার ডিমোক্রেসির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অন্যান্য দেশের মত চাল-বাজী করে মামুলী বিষয়কে বড় করে, তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করতে রাজি নন, সেটা থামাবার জন্য সেখানে চুপ চুপ বেশী। যেখানে আভিজাত্যের ভাব প্রবল, সেখানেই আপন লোকের সর্বনাশের পথ খোঁজা একটা মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তুরুক জাত সে পথের পথিক নয়। তরুণ তুর্কীর নায়ক আভিজাত্য-ভাবকে ঘৃণা করেন, সেজন্যই কামালকে সাধারণ অফি-সারদের একসঙ্গে সাধারণ কাফেতেও পাওয়া যেত। সেরূপ অবস্থায় তাঁকে পাবার সুযোগ একদিন হয়েছিল। আমি সে সুযোগের সদ্ব্যবহারই করেছি, অসদ্ব্যবহার করতে প্রবৃত্তি হয় নি। আমাদের দেশের সুযোগের সদ্ব্যবহার মানেই হল কিছু আদায় করে নেওয়া। আর তুর্কীতে সুযোগের সদ্ব্যবহার মানেই হল সুযোগকে অবহেলা করা। তাই আতা তুরুককে দেখেও অন্য কাফেতে চলে গিয়াছিলাম। সাথী তাতেই সুখী হয়েছিলেন বলে মনে হল।

সাথীর সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে একাকী বেড়াতে লাগলাম। সর্বপ্রথম

আংকারা হতে হাইদরপাশার পথটা দেখে এলাম। পথের পাশেই কতকগুলি মুদির দোকান। দোকানী দাঁড়িয়ে কাজ করছে না। আরব ধরনে (অথবা আমাদের দেশের বেনিয়া ধরনে) বসে জিনিস বিক্রয় করছে। পরনে তাদের লম্বা প্যাণ্ট, গায়ে তাদের কোট, গলায় নেকটাই, মাথায় নাইট ক্যাপ। অথচ বসে বসেই কারবার চালাচ্ছে। দোকানের গড়ন কিন্তু ইউরোপীয় ধরনের। মনে হল পুরাতন আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করতে পারছে না বলেই এরূপ করে বসে জিনিস বিক্রি করছে।

আংকারাতে যত যুবক-যুবতী দেখলাম, তারা সকলেই একদম ইউরোপীয়ান হয়ে গেছে। ইউরোপীয় ধরনের কথা বারবার বলছি, কিন্তু সেই ধরণটা যে কি তা একবারও বলি নি। বলতে হলেই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হবে। অনেকে কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বের ইউরোপীয়ানদের চালচলন দেখে মনে করেন ওটাই ইউরোপীয় সভ্যতা; তা নয়। ওটা হল ইউরোপীয় ইমপিরিয়্যালিষ্ট সভ্যতা। শাসকজাতি কখনও নিজের দুর্বলতা শাসিতদের কাছে প্রকাশ করে? একটা দৃষ্টান্ত দিই, তাতেই বুঝবেন বৃটিশ সভ্যতা ভারতে এবং গাওয়ার ষ্ট্রীটের ভারতীয় ছাত্রমহলে কেমন করে প্রবেশ করেছে। দ্বিপ্রহরের খাদ্যকে আমরা সাধারণতঃ ইংলিশে বলে থাকি 'লান্চ্' কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণ লোক দ্বিপ্রহরের খাদ্যকে বলে 'ডিনার'। লর্ড, পিয়ার, আর ধনী ব্যবসায়ী যাঁরা তাঁরাই শুধু দ্বিপ্রহরের খাবারকে বলে লান্চ্। আমাদের দেশে এসেছে উচ্চশ্রেণীর সভ্যতা। উচ্চশ্রেণী সমষ্টির নয়।

তুর্কীর মধ্যে এতদিন ইউরোপীয় সভ্যতা প্রকাশ করতে পারে নি, তার একমাত্র কারণ হল—মোল্লা-ইজ্মের প্রাধান্য। যতদিন সুলতান ছিলেন, ততদিনই থাকতে পেরেছিল। বর্তমানে সুলতান আর নাই, সঙ্গে সঙ্গে মোল্লাইজম্ও তুর্কী হতে অদৃশ্য হয়েছে। মোল্লাইজ্ম্ চলে

গেছে আনন্দের কথা, কিন্তু কি করে ভারত হতে ব্রাহ্মনিজ্‌ম্ চলে যাবে তা বিবেচ্য বিষয়। আংকারার পথে পথে মাথা নত করে যখন বিকালে ব্রাহ্মনিজ্‌মের কথা ভাবছিলাম, তখন সাথী পেছন দিক থেকে এসে বললেন, কি ভাবছেন ?

ভাবছি নিজের দেশের কথা।

হঠাৎ যে দেশের কথা মনে পড়ে গেল ?

আমি ভাবছিলাম, আপনাদের মধ্য হতে যেমন মোল্লাইজ্‌ম্ চলে গেছে, আমাদের মধ্যে তার চেয়েও খারাপ একটা ইজ্‌ম আছে, তাকে কি করে তাড়ানো যায়।

সে তো সামান্য কথা। রাষ্ট্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যত দূষিত "ইজ্‌ম্" আছে তা আপনি বিদায় নেবে। রাষ্ট্রের উন্নতির চেষ্টা করুন, সকল রোগের সমাপ্তি হবে। সাথীর কথায় আনন্দ হল। সাথীকে নিয়ে সারা বিকাল ভ্রমণ করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে এসে সাইকেলের অবস্থাটা দেখে নিলাম। সাইকেলের অবস্থা ভালই ছিল। অনেকক্ষণ বসে বসে সাথীর কথা ভাবছিলাম। এমন সময় সাথী এসে ফের হাজির হলেন। বললেন প্রাতে যাবার বেলা যেন তাঁর মাতাপিতার সঙ্গে দেখা করে যাই। আমি তাতে রাজী হলাম।

বিদেশে যাঁরা বন্ধুত্ব করেছেন তাঁরা বেশ ভালভাবেই অবগত আছেন যে সে বন্ধুত্বের দৃঢ়তা কত দূর হয়। কিন্তু মনে হল আমার উদ্দেশ্যের কথা। আমার উদ্দেশ্য স্নেহ, দয়া, ভালবাসার ধার ধারে না। সকল সময় বলে দেয়, এগিয়ে চল। তাই পরদিন সাথী এবং সাথীর মাতাপিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাইদরপাশার দিকে রওনা হয়ে গেলাম। বিদায়ের বেলা সাথী বলেছিলেন, মনে রাখবেন একটা কথা। সেই কথা শুধু—"সাথী" সাথীর অনুরোধ এখনো মনে আছে। সাথী শব্দের অর্থ হল কম্‌রেড।

মহাচীন

১৯৩১ সনের জুলাই মাসের সাত তারিখ। কপর্দ্দকহীন নিঃসহায় আমি একখানি মাত্র সাইকেল ও কয়েকখানা জামাকাপড় নিয়ে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করলাম। এবারকার যাত্রা আদিযুগের মানব-সভ্যতার প্রতীক্ মহাচীনের দিকে।

শ্যাম দেশের শ্যামল মাটি ছাড়িয়ে, মালয়ের ধূলা উড়িয়ে, ইন্দোচীনের বুক পেরিয়ে নবজাগ্রত মহাচীনের দ্বারে এসে যখন প্রণতি জানালাম তখন স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রজাল আমার মনে অনেকখানি রং ধরিয়ে দিয়েছে।

তংকিন প্রদেশের সমুদ্র-বন্দর হাইফং হতে ইউনান ফোঁ হয়ে সাংহাই যাবার বাসনা ছিল, কিন্তু তা হল না। কারণ এই অঞ্চলে পাহাড়ে রাস্তা। তদুপরি এসব রাস্তা আবার দস্যু ও 'কমিউনিষ্টে' ছেয়ে গেছে। সেদিকে যে-ই যায় তাকেই তারা নাকি হত্যা করে ফেলে। অনেকে উপযাচক হয়ে বললেন, এমন খারাপ রাস্তায় যেন না যাই, গেলে মৃত্যু অনিবার্য্য। আমার মনে কিন্তু তাতে আঁচড়ও লাগে নি। তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যখন ঐ পথে যাওয়ায় বাধা দিল তখন বাধ্য হয়েই ঐ পথ পরিত্যাগ করা স্থির করলাম। আমি পথিক, পথের নেশা আমায় পেয়ে বসেছে। সাপ, বাঘ, ডাকাতের হাতে মরতে রাজি আছি, তবুও নিষ্ক্রিয়তার আওতায় পচে মরতে কোন দিন চাই নি। ঠিক করলাম হাইফং হতে জাহাজে হংকং যাব। সেখান থেকে ক্যাণ্টনে গিয়ে ভাগ্যের উপর সব চাপিয়ে এগিয়ে চলব।

সমস্যা হল, এখন জাহাজ-ভাড়ার টাকা কোথায় পাই। এসব উপকূল-বাহী জাহাজপথের ভাড়া খুবই বেশী। শ্যাম, মালয় ও ইন্দোচীনে চীনা

ধনীদের সাহায্য কম নিই নি। এদের ক্রমাগত জ্বালাতন করতে ইচ্ছা হল না। তাই এক ফরাসী জাহাজ কোম্পানীর ম্যানেজারের শরণাপন্ন হলাম। সাহেব শুনেই উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, ভবঘুরেদের সাহায্য তিনি করবেন না। কাজেই তাঁর সময়ের অপব্যবহার না ঘটিয়ে আমায় সরাসরি পথ দেখতে বলে দিলেন। চলে এলাম, মনে একটুও দুঃখ হল না। এক চীনা কোম্পানীর ম্যানেজারের সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেখা করতে গেলাম। তিনি আমার নিবেদন অল্প একটু শুনেই বেশী বাক্যব্যয় না করে একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ পাস দিয়ে দিলেন।

ইন্দোচীনে আমার দিনগুলি কেটেছিল ভালই। তাদের আতিথেয়তা, সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা আমায় কম আনন্দ দেয় নি। শারীরিক ও মানসিক নিরানন্দ কোনপ্রকারেই আমাকে স্পর্শ করবার সুবিধা পায় নাই। বন্ধুবান্ধব অনেকেই জুটেছিল। তারা আমাকে সর্বদা ও সর্বথা সুখে শান্তিতে রাখবারই প্রয়াস পেত। ১৯৩১এর ২০শে ডিসেম্বর প্রাতে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে জাহাজে উঠলাম। ইন্দোচীনের ফরাসী সরকারের গোয়েন্দারা বরাবরই আমার চলাফেরার উপর লক্ষ্য রেখেছিল। তাই বোধ হয় বিদায়-বেলায়ও আমার সঙ্গে সঙ্গে একজন জাহাজে এসেছিল এবং জাহাজ না ছাড়া অবধি উপস্থিত ছিল।

আয়তনের বিশালতা, লোকসংখ্যার বিপুলতা ও ঐতিহ্যে চীনকে দেশ না বলে মহাদেশ বলাই সঙ্গত। দীর্ঘদিন ধরে আমি মহাচীনের হাংকো, নান্‌কিন, সাংহাই, পিকিন প্রভৃতি মহানগরীগুলির বিভিন্ন অংশে যেমন ঘুরে বেড়িয়েছি তেমনি মাসের পর মাস চীনের দরিদ্রপল্লীর পথে প্রান্তরেও আমার দিন কেটেছে। সময় সময় যেমন চীনের বিখ্যাত বোম্বেটেদের হাতে পড়ে অত্যাচারিত হয়েছি তেমনি আবার সরল গৃহস্থদের মধুর ব্যবহার ও চীনা মা-বোনদের আন্তরিক স্নেহ ও সেবা সহানুভূতিতে মুগ্ধ হয়েছি।

চীনেরা সাধারণতঃ বিদেশীদের বড় একটা সুনজরে দেখতে চায় না। এজন্য তাদের দোষ দেওয়া চলে না; কারণ চীনের বুকে বসে তার শুভানুধ্যায়ী সেজে নানাদেশের লোক অনবরত তাদের সর্বনাশ করবার চেষ্টায় আছে। সময় সময় আমাকেও সন্দেহভাজন হয়ে নিগৃহীত হতে হয়েছে। পরে আবার অনুতপ্ত চীনাদের ব্যবহারে সব ভুলে গেছি।

আমি প্রথমে হংকং যাই। পরের দিন প্রাতে সাইকেল নিয়ে নগরী দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। পথে সব পুলিশই পাঞ্জাবী, কেবল মাঝে মাঝে দুএকটি চীনা দারোগা টহল দিচ্ছে মাত্র। সমুদ্রের ধারের বাঁধ ছেড়ে দিয়ে একটা ছোট পথে এসেই দেখি একটি চীনা যুবতী পথে পড়ে আছে। তার নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল, তা ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধেছে। চীনারা দূরে দাঁড়িয়ে তা দেখছে, কেউ কাছে আসছে না। পাঞ্জাবী পুলিশ তখনও আসে নি। ভাবলাম ডেকে নিয়ে আসি, কিন্তু এরই মধ্যে তিন জন পাঞ্জাবী পুলিশ এসে হাজির হল এবং লাসটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করল।

একজন পাঞ্জাবী পুলিশকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, পাছে ঘাড়ে ভূত চাপে বা সুইয়া অর্থাৎ দুর্ভাগ্য তাদের পেয়ে বসে এই ভয়ে চীনারা মৃত বা মৃতপ্রায় লোকেব বিশেষ আত্মীয় না হলে কাছে ঘেঁষে না। চীনা দোকানে চা যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু দুধ মিলে না। অনেক খোঁজ করে বোম্বাইয়ের একজন বোরা মুসলমানের দোকানে উঠলাম। দোকানী বড়ই অমায়িক লোক। তিনি চা, দুধ এবং তৎসহ কিছু পিঠা খাওয়ালেন, পয়সা কিন্তু নিলেন না। হংকংয়ের ভারতীয়দের কাছে আমার আসার সংবাদ প্রচারও তিনি করে দিলেন। অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। এখানে একটি গুরুদ্বার আছে। তথায় ভারতীয়দের বিনা পয়সায় খেতে ও থাকতে দেওয়া হয়। অনেকে কাজের সন্ধানে এখানে এসে অনেকদিন

কাটিয়ে দেয়। আর একটি জিনিস বিশেষরূপেই লক্ষ্য করবার আছে যে হংকংয়ে হিন্দু-মুসলমান ভারতীয়দের মধ্যেই সত্যই এক অভূতপূর্ব আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্য বিরাজমান। সেখানে হিন্দুস্থানের লোকমাত্রেই হিন্দু নামে পরিচিত।

বিকাল বেলায় বাজার দেখতে গেলাম, সুবিধা হলে কিছু ফল কিনবার ইচ্ছাটাও ছিল। সেখানে ঝুড়ি ঝুড়ি সাপ বিক্রয়ার্থ আমদানী হতে দেখলাম। চীনারা সাধারণতঃ বাজার থেকে সাপ কিনে বাড়ী নিয়ে যায়। প্রথমে তারা ফুটন্ত গরম জলে সাপটিকে ডুবিয়ে দেয়। তারপর তার মাথাটির চারি দিক ধীরে কেটে মাথা হতে লেজ পর্য্যন্ত সাপের বিষাক্ত শিরাটি অটুট অবস্থায় বের করে ফেলে। শিরাটি কোন প্রকারে ফেটে বিষাক্ত রক্ত বেরিয়ে পড়লে সাপটি আর খাওয়া হয় না—ফেলেই দিতে হয়। অবশ্য ঢোড়াসাপের বেলায় একথা খাটে না, তার মাথাটা শুধু কেটে ফেলা হয়। সাপের মাংস এদের এক উপাদেয় খাদ্য। বাজার থেকে সিঙ্গাপুরী আনারস ও কলা কিনে হোটেলে ফিরলাম।

এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। সাইকেলে চীন পরিভ্রমণের পরিকল্পনার কথা শুনে তিনি একটু বিস্মিত হলেন। পথঘাটের বিপদাপদের নানা প্রকার কাহিনী উল্লেখ করে তিনি বারবার আমায় চীনভ্রমণে যেতে নিষেধ করলেন। শেষ পর্যন্ত যখন দেখলেন আমার অগ্রসর হওয়ার বাসনা প্রবল, তখন শেষ খাওয়ার মত তাঁর স্ত্রীর হাতের বাঙ্গালী রান্না খাইয়ে দিলেন। আর জীবন্ত ফিরব না মনে করে উদ্বেগও কম দেখালেন না।

হংকংয়ে অনেকগুলি সিনেমা আছে। তাদের প্রেক্ষাগৃহ কলকাতার তুলনায় ভাল বলা যেতে পারে। কয়েকটি সিনেমা হাউসের মালিক ছিল একই কোম্পানী। তার এক ইংরেজ ডিরেক্টারের সঙ্গে আমার আলাপ হল।

তিনি চট্টগ্রামে অনেকদিন কাটিয়ে এসেছেন। বাঙ্গালীদের বেশ একটু ভালবাসেন বলে মনে হল। তিনি পরিচয়ের সূচনায়ই জিজ্ঞাসা করে বসলেন,—"আপনি ভূ-পর্যটন প্রয়াসী ? কোন্ কোন্ দেশ বেড়িয়ে এলেন, আর চীনেই বা কেন বেড়াতে চান ?" চীন দেশ দেখবার ও তার সম্বন্ধে জানবার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণের কথা শুনে তিনি আমায় নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। চীনা মুল্লুকে ঢুকলে আর ফিরে আসতে পারব না এরূপ তিনি বললেন। এছাড়া পথে ঘাটে অসম্ভব অত্যাচার ও নির্যাতনের দুচারটা গল্প যে না শুনালেন তা নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর সব সিনেমায় আমাকে একখানা ফ্রি কার্ড দিলেন।

এদিকে তিন দিনে হাতের সম্বল প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। আনুষঙ্গিক খরচের চিন্তায় একটু বিব্রত হতে হল। পরের দিন সকালে এক সিন্ধী রেশম ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করলাম। হংকংয়ে কতদিন কাটিয়ে তারপর অন্য দিকে বের হব তা জেনে নিয়ে তিনি কি একটা হিসাব কষে বললেন, —"দেখুন, চীন দেশে যখন যাচ্ছেন তখন ফিরে আসার উপায় নাই জেনে রাখুন, তাই আপনার বেশী টাকার দরকার পড়বে না। কোয়াণ্টাং প্রদেশে অনেকটা শান্তি স্থাপন হয়েছে। সে দেশে যেতে আপনার অর্থাভাব না ঘটে তার ব্যবস্থা আমরা করে দিব। আপনাকে এক মাসের পাথেয় দেওয়া হবে। তারপর সবই আপনার ভাগ্য। বোধ হয় বেশী দূর আর যেতে হবে না।"

হংকংয়ে দিন-পনের কাটিয়ে প্রাণের সুখ ও শান্তির একটা শেষ কিনারা করে তবে তিনি যেতে উপদেশ দিলেন। হাতখরচের জন্য কিছু টাকা দিয়ে বাকী টাকা যথারীতি পাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন।

হংকং থেকে একদিন মাকাও বন্দর গেলাম। মাকাও হল হংকং ও নিকটবর্তী অঞ্চলের প্রমোদবিহারের একটি আড্ডা। আশপাশ থেকে

বহু লোক আমোদ-প্রমোদের জন্য এখানে বেড়াতে আসে। অলিতে গলিতে, পথেঘাটে কেবল হোটেল ও নাচঘর—চারিদিকেই বিলাসের ছড়াছড়ি। শহরটির অনেক স্থলই মদ্যালয় এবং চণ্ডুখানায় ভর্তি। যুবক ও ধনীর দল নানা প্রকার বিলাসে ও 'মাজাং' খেলায় অকাতরে তাদের অর্থ, সামর্থ্য ও সময়ের অপব্যয় করে দেশপ্রেমিক সান ইয়াৎ সেনের জন্মস্থানের নিকটে কি ভীষণ নরককুণ্ড সৃষ্টি করে ফেলেছে! আর পর্তুগীজ সরকার তাদের রাজস্ব সানন্দে আদায় করে অফুরন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা বিলিয়ে যাচ্ছে। শহরে বেড়িয়ে এসব দেখেশুনে মাথা ও মেজাজ দুই-ই বোধ হয় গরম হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি রাস্তার ধারের এক কল খুলে চোখেমুখে জল ছিটিয়ে খানিকটা জল পান করলাম। আর বেড়িয়ে দেখার প্রবৃত্তি হল না। এক ডলার দক্ষিণা দিয়ে এক হোটেলে আশ্রয় নিলাম। হোটেলের পার্শ্ববর্তী একজন ক্যাণ্টনী যুবকের মিঠাইয়ের দোকান থেকে কিছু ভারতীয় গজা কিনে বেশ রসিয়ে রসিয়ে খেলাম। বিদেশে বসে দেশী খাদ্য খাওয়ায় কতই না আনন্দ!

প্রাতে ঘুম থেকে ওঠার পরে বুকে ও মাথায় বড়ই ব্যথা অনুভব হতে লাগল। নিশ্বাসপ্রশ্বাসেরও একটু কষ্ট হচ্ছিল। খুবই সর্দ্দি হয়েছে দেখলাম। একটা 'য়্যাসপিরীন' বড়ি খেয়ে কাছের এক পর্তুগীজ ডাক্তারকে হাত দেখালাম। তারপর এক শিশি ঔষধ কিনে হোটেলে ফিরলাম। পথে এক শিখ পুলিশের সঙ্গে দেখা। সে একজন দেশের লোক দেখে আমার সঙ্গে পরিচয় তো করলই, অধিকন্তু আমাকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। পরদিন ষ্টীমারে আবার হংকং ফিরে গেলাম।

হংকংয়ে ফিরে দুদিন হোটেলে কেবল বিশ্রাম নিলাম। শরীরের দুর্বলতা ও অবসাদ অনেকখানি কেটে গেল। তৃতীয় দিনে বন্ধুবান্ধব সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ক্যাণ্টন রওনা হলাম। হংকং হতে সাইকেলে

ক্যান্টন যেতে হলে ফেরী পার হতে হয়। দশ সেণ্ট দিয়ে ফেরীতে কাওলিন গিয়ে ক্যান্টনাভিমুখী বড় রাস্তা ধরলাম। রাস্তাটির অনেক স্থানই পিচ ঢেলে তৈরী করা। বৃটিশ সীমানায় পঁচিশ মাইল পরিমাণ রাস্তা খুবই ভাল ভাবে রাখা হয়েছে। তারপরই রাস্তার অবস্থা একদম খারাপ। ক্রমাগত চড়াই ঠেলে উঠতে লাগলাম। মাঝে মাঝে রাস্তার দুপারে চা ও খাবারের দোকান। পথে তিন রাত্রি কাটিয়ে দুপুরে ক্যান্টন পৌঁছলাম। ক্যান্টন পৌঁছে কিন্তু এক অদ্ভুত বিপদে পড়লাম। পথ জিজ্ঞাসা করলে জবাব পাই না, হোটেলের খোঁজ করলে কেউ দেখিয়ে দেয় না; স্থানীয় পুলিশের কাছে গেলে সে কথা বলে না, কারও সঙ্গে আলাপ করতে গেলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে গিয়ে দেখি অনেক হোটেল। সেখানে থাকবার ঘর চাইলাম। দরদামের কথা দূরে থাক কেউ কথাই বলতে চায় না, খুব বেশী হলে "খালি নাই" বলে বিদায় করে দেয়। কমসে কম কুড়িটা হোটেল থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে বৃটিশ 'কনসালের' কাছে চললাম। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, তাই পথে এক কফির দোকানে ঢুকে এক পেয়ালা চা চাইলাম। সকলকেই চা দেওয়া হল, কিন্তু আমার প্রতি কোন প্রকার মনোযোগ দেওয়া হল না।

তখন সন্ধ্যা। অনেক দূর থেকে সাইকেলে এসেছি, বিশ্রামের নিতান্তই দরকার। কনসালের সঙ্গে দেখা করে আমার বিপত্তির কথা বললাম। তা শুনে তিনি আমায় চীন পরিভ্রমণের অসুবিধার কথা বুঝিয়ে দিয়ে আবার হংকংয়ে ফিরে যাবার উপদেশ দিলেন। তবে রাত্রিটা কাটাবার জন্য এক চীনা গুপ্তচরকে আমাকে একটা থাকার জায়গা ঠিক করে দেবার জন্য সঙ্গে দিলেন। অনেক ঘোরাঘুরির পরে একটা হোটেলে মাটির নিচের তলার একটা কামরায় থাকার ব্যবস্থা করে সে বিদায় নিল। ঘরের কাছেই এক ড্রাম ভর্ত্তি প্রস্রাব, দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। যে খাবার মিলল

তা অখাদ্য। যাই হোক্ কোন প্রকারে তনুরক্ষা করে শুয়ে পড়া গেল। দরজাটা ভাল ভাবে বন্ধ করে দিলাম।

রাত্রি প্রভাত হল। জল চেয়েছিলাম, কিন্তু পাওয়া গেল না। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে একটা জলের কলে হাতমুখ ধুলাম। তারপর হংকংয়ের সিন্ধী ভদ্রলোকটির পরিচয়পত্রটা নিয়ে তাঁদের ক্যান্টন শাখার উদ্দেশে চললাম। স্থানীয় ম্যানেজারের সঙ্গে যথারীতি সাক্ষাৎ হল। তাঁর টাকা চুরি যাওয়ায় তিনি পুলিশ ইত্যাদি নিয়ে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন। বেশীক্ষণ আলাপাদি করতে পারলেন না, তবুও আমাকে ভরপেট চা রুটি প্রভৃতি খাওয়াবার ব্যবস্থা করে বেরিয়ে গেলেন। খাবার খেয়ে আবার রাস্তায় বের হলাম। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে না। আমার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল।

বেলা তখন প্রায় দশটা। সান ইয়াৎ সেন বাগিচার রেলিং ধরে আকাশ-পাতাল ভাবছি, এমন সময় পিছন থেকে এক চীনা গলায় কিলিং কুই অর্থাৎ কালো ভূত বলে কে ডাক দিল। পিছন ফিরেই দেখি সিঙ্গাপুরের এক চীনা বন্ধু। তাকে আমার বিপত্তির সব কথাই বললাম। সে কেবল হাসছিল। বেশ খানিক হেসে নিয়ে বলল যে আমার পোশাকটাই যত বিপত্তির কারণ। যে পোশাক পরে পথ চলছি সে পোশাকটা জাপানী চাষীরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে। চাষীরা তাই আমাকে জাপ্পুন কুই অর্থাৎ জাপানী ভূত বলে মনে করেছিল। জাপানীদের মাঞ্চুরিয়া গ্রাসের জন্য চীনারা তাদের বড় ঘৃণা করে ও যথাসম্ভব বয়কট করে চলে। কাজেই আমাকেও জাপানী মনে করে এত অসুবিধায় ফেলেছিল। বন্ধুটি তখন আমাকে এক দর্জির দোকানে নিয়ে গেল। তারপর একটা ব্যাজ তৈরী করিয়ে তাতে হিন্দু ইয়াংসি সাই কাই লিখিয়ে আমার বুকে এঁটে দিল। পড়ল ৪০ সেণ্ট। চীনা কথাগুলির অর্থ হল হিন্দু ভূ-পর্যটক।

আশ্চর্য, এই নূতন ব্যাজ বুকে পরে রাস্তায় এসে দেখি একেবারে অন্য রকম অবস্থা। হঠাৎ, যেন প্রতিশোধ লওয়ার জন্যই চারিদিক থেকে আদর অভ্যর্থনার বর্ষণ শুরু হল। হোটেলে ফিরতেই মালিক নমস্কার করে বললেন, আপনাকে জাপ্‌নুন কুই ভেবেছিলাম, কতই না কষ্ট হল ইত্যাদি। তাঁর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ভাল কক্ষটি আমার জন্য ঠিক করা হল। জিনিস-পত্রাদি সব তিনিই ঘরটিতে নিয়ে গেলেন। আমাকে অতি সমাদরে স্নানাদির ব্যবস্থা করে দিলেন এবং থাকা খাওয়ার সকল রকম সেরা ব্যবস্থা হয়ে গেল। ক্যাণ্টনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হোটেল 'এসিয়া' হোটেলে' গেলাম। মালিক আমার দুই বেলা খাওয়ার এবং চা পানাদির ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর পূর্ব দিনের বিপত্তির কথা শুনে তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন। হাটে মাঠে, পথেঘাটে, অলিতে-গলিতে যেখানেই যাই সেখানেই চীনা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কত আপনজনের মত আলাপ আপ্যায়ন করলেন! এদের সকলকারই ভারতের জন্য বেশ সহানুভূতি ও সমবেদনা আছে! হিন্দু অর্থাৎ ভারতীয়দের জন্য এদের বিশেষ প্রীতি দেখা যায়। কাজেই নূতন বন্ধু ও সঙ্গী অনেকেই জুটে গেল। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁর বাবা পার্শী, মা চীনা। ভদ্রলোকটি আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্যাণ্টনের দ্রষ্টব্যগুলি দেখালেন।

ক্যাণ্টনে ট্রাম লাইন আছে, কিন্তু ট্রাম চলে না। রিক্‌সাওয়ালা দেখল যদি ট্রাম চলে তবে তাদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তাই তারা ধর্মঘট করল। হাজার হাজার লোক মিলে একদিন ট্রামলাইন অনেকখানি তুলে ফেলে দিল। গুলি চলল, কতকগুলি লোক মরণকে বরণ করে নিল, তবুও শহরে আর ট্রাম চলতে দিল না। যারা মরল, তারা তাদের সহকর্মীদের পথ সুগম করে দিয়ে গেল। ধনীরা তাদের কমিউনিষ্ট আখ্যা দিল। জগৎ জুড়ে তাদের কুৎসা রটে গেল তবু তারা তাদের ভাতের ব্যবস্থা বজায়

রাখল। এমনি করেই মহাচীনে কমিউনিষ্ট গজায়।

সাধারণতঃ রবিবার দিন স্যান ইয়াৎ সেনের মর্মরমূর্তি দেখবার জন্য বহু লোক জড়ো হয়। আমিও সেদিন তা দেখতে গেলাম। বহু জনসমাগম হয়েছিল, কিন্তু গোলমাল একটুও ছিল না। চারিদিকে একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং পবিত্র আবহাওয়া বিরাজ করছিল। উপস্থিত চীনা যুবক যুবতীদের একে একে নব্য চীনের জন্মদাতার পদতলে তাদের হৃদয়-নিংড়ানো শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখলাম। নীরব শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে তাদের পুণ্যাত্মা দেশনায়কের পদাঙ্ক অনুসরণ করার একটা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল।

সেখান থেকে স্যান-ইয়াৎ-সেন-বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। ঘুরে ঘুরে দেখে ফিরবার সময় এক চীনা যুবক আমাকে একটা হলে নিয়ে তাদের সকলের সামনে কথা বলতে পীড়াপীড়ি করল। দেখলাম দশ মিনিটের মধ্যেই মস্তবড় হলটা ছত্রছাত্রীতে পূর্ণ হয়ে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু বলবার জন্য দাঁড়ালাম। একজন উৎসাহী যুবক আমাকে হিন্দু ভূ-পর্যটক ও কবি রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক বলে পরিচয় করিয়ে দিল। দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করার পূর্বেই মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে যেন কিছু বলি সেই অনুরোধও এল। ভারতের ব্যথা-বেদনার কত কথা আছে তাই বলতে দাঁড়িয়ে দেখি, সবাই যেন এক দুঃখের সুরে ভরপুর হয়ে উঠতে চাইল আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-মান দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে, অজ্ঞতার অন্ধকারে এবং দুর্ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যে কোন্ অতল তলে তলিয়ে যেতে বসেছে আমাদের মানবতা যে কিরূপে নিঃস্ব ও নিঃসহায় হয়ে পড়েছে তার দু'চারটা নিবেদন করতে মাত্র প্রয়াস পেলাম। জাতীয় জীবনের অন্ধকারের মধ্যেও আমরা যে আশার রেখাটি ক্ষীণভাবে উদ্ভাসিত রাখার চেষ্টা করি তাও একটু বলেছিলাম। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ জাতীয়তাবাদীদের প্রচেষ্টা

আমরা আবার মানুষ হয়ে উঠব, দেশের ও দশের সর্বপ্রকার উন্নতির ক ব্যবস্থা করে নিতে পারব এই কথা বলে নেমে এলাম। করতালি ল আধ ঘণ্টা। তার পর এই ছাত্রছাত্রীরা আমাকে সাড়ম্বরে খাওয়ার নিয়ে গেল। সেখানে তারা মার্কিন, আইরিশ, জার্মাণ ও রুশ অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। সবাই কঞ্চির সাহায্যে খাচ্ছিল। আমি তা পারি না দেখে একজন উৎসাহী ছাত্র আমাকে কঞ্চির দ্বারা খাওয়ার কৌশল শিখিয়ে দিল। সে হেসে বলল, এই হিন্দু বিদেশী, এখন সমগ্র চীনজাতির ছোট ভাইয়ের মত। একে আমাদের কলেরই যথাশক্তি সহায়তা করা প্রয়োজন। সামান্য উক্তি হলেও এটি আমার মনের উপর যে গভীর রেখাপাত করেছে তা সহজে আর মুছে যেতে পারে না। খাওয়ার পর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরলাম।

পরের দিন নদী পার হয়ে ওপারের বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখতে গেলাম। সেখানে ছাত্রেরা আমাকে না খাইয়ে ছাড়ল না! খাওয়া হয়ে গেলে অনেক ছাত্র—কেউ টেবিলের চারি দিকে বসে, কেউ দাঁড়িয়ে—ভারতের সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করতে লাগল।

ক্যান্টন হতে সিউচো, ইয়েং-চি-সিয়েন, সিয়াংটাং হয়ে আমি চাংসা যাই। সিয়াংটাং থেকে পাক্কা ৮ঘণ্টা সাইকেলে চড়াই উৎরাই ঠেলে রাত্রি ৮টায় চাংসায় পৌছলাম। ছোট পাহাড়ের কোণে জনবিরল উঁচু-নীচু আঁকা-বাঁকা পথ। রাস্তায় চলতে চলতে কখনও দূরে, কখনও বা কাছে ছোট ছোট বস্তি চোখে পড়ল। অনতিউচ্চ পাহাড়ের উপরে চীনা কুঁড়ে ঘর এবং মাঝে মাঝে উন্নতশীর্ষ বৃক্ষরাজির শোভা দূর হতে মনকে বড়ই মুগ্ধ করেছিল। অনবরত সাইকেল চালানোর ফলে পায়ের মাংসপেশী ব্যথায় টন্‌টন্ করতে লাগল এবং হাঁটু ও গোড়ালি অসাড় হয়ে আসল

মনে হল। ব্রেক কষে হাতের কব্জিও ধরে গিয়েছিল। সিয়াংটাংয়ে ২।৩ দিন বিশ্রাম করে শরীরে যে তাকৎটুকু সঞ্চিত হয়েছিল তা এই একদিনেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল।

চাংসা একটি বড় শহর, প্রাদেশিক সরকারের রাজধানী। লোকসংখ্যাও বোধ হয় দশ লক্ষের কম নয়। সামরিক কর্মচারী এবং পল্টনের লোকও সেখানে খুব বেশী দেখলাম। এখানে একটি বিলাতী পেট্রল কোম্পানীর বড় আড্ডা আছে, তাতে অনেক ইউরোপীয় কাজ করে। মিশনারীদেরও একটা ছোট রকমের আস্তানা আছে। নদীতীরে যে হোটেলে থাকতাম তার কাছে ইউরোপীয়দের একটা ক্লাব ছিল। রাত্রি ৮টায় পৌছে শ্রান্ত দেহে খাওয়া ও আনুষঙ্গিক কার্যাদি সেরে যে একটু সুস্থিরমত ঘুমাব তাও ভাগ্যে ঘটল না। রাত্রি ২-২॥টা পর্যন্ত নৃত্যগীত চলায় আমার ঘুমও রাত্রির মত অবসর নিল। পরের দিন প্রাতে হিন্দু ডাক্তারের খোঁজে বের হলাম।

শহরের মধ্যে একজন মাত্র হিন্দু ডাক্তার। সকলেই তাঁকে চেনে তাই খুঁজে বের করতে মোটেই আর বেগ পেতে হল না দেখলাম, দুটি বড় রাস্তার মোড়ের উপর একটা বড় হলঘরের দরজায় "হিন্দু চক্ষু-বিশেষজ্ঞ" সাইনবোর্ডে ডাক্তারের নানাবিধ অভিজ্ঞতার পরিচয় লিখিত আছে। তারই ভিতরে এক সহকারিণী চীনা যুবতী আগন্তুকদের রোগের প্রাথমিক বিবরণাদি গ্রহণ করেছেন এবং ভিতরের কামরায় ডাক্তার চিকিৎসা কার্যে ব্যাপৃত আছেন। আমি একজন হিন্দু "সাই কাই" এই পরিচয় দেওয়াতে সহকারিণী আমাকে পাশের একটি কামরায় প্রবেশ করিয়ে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে বললেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ডাক্তার সাহেব এলেন। হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে দেখলাম, তিনি ইসলামি কায়দায় 'আদাব' দিলেন এবং খাঁটি পোস্ত ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করলেন। ভারতীয়ের

মুখে পোস্তু শুনে তিনি হিন্দী জানেন কি না এবং তাঁর আসল নিবাসটা কোথায় তা জিজ্ঞাসা করলাম। ভাঙ্গা হিন্দীতে জবাব দিলেন যে তিনি সীমান্তপ্রদেশবাসী এবং পদব্রজে চীনা তুর্কীস্থান দিয়ে সাংহাইতে এসে বর্তমানে চাংসায় ডাক্তারী করেন। সামান্য আলাপাদির পর দ্বিপ্রহরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ডাক্তার সাহেবের নিকট হতে স্থানীয় কলেজ ও হাস-পাতাল দেখবার জন্য বিদায় নিলাম।

একটা কলেজে ঢুকে তার ইমারত দেখে বেশ একটু মনে মনে তারিফ করছি এমন সময় কোথা থেকে একেবারে গুজরৎ খোদ মার্কিন অধ্যক্ষ এসে আমি কে এবং কেন এদিক ওদিক তাকাচ্ছি তা জিজ্ঞাসা করলেন। পরিচয় দেওয়ায় তিনি একেবারে এক গাল হেসে কতগুলি চীনা ছাত্রকে ডেকে আমাকে সব দেখাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারপর রাসভারি চালে জলযোগ করবার জন্য বিদায় হলেন। কিন্তু এবার আচ্ছা বিপদেই পড়লাম! আমি মনে করেছিলাম যে নিরিবিলি সব দেখেশুনে নিজের পথে বের হব। তা তো হলই না, অধিকন্তু আমি একেবারে ভীমরুলের চাকে পড়ে গেলাম। তখন প্রশ্নবাণের হাত থেকে কেমন করে রেহাই পাই সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে উঠল। হংকং ও ক্যান্টনের মত আমার অনভ্যাস সত্ত্বেও এদের কাছে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করতে হল। বক্তৃতার পর যে প্রশ্নবাণ বর্ষণ হল তা আরও ভীষণ। সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক, কায়িক, আধ্যাত্মিক অর্থাৎ এমন কোন ষ্ণিক প্রত্যয়ান্ত শব্দ ছিল না যার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা না হয়েছিল। বিদ্যাহীনের বিড়ম্বনা যে কতখানি তা এই পথ-চলার মাঝে বিশেষরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছি। কলেজ পর্ব শেষ করে হাসপাতাল দেখতে গেলাম। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ, ছাত্রীদের সেবা এবং রোগীর নির্বিকার ভাব বিশেষ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের বেশীর ভাগই মার্কিন। সারা হাস-

পাতাল ঘুরে একজন অল্পবয়স্ক চীনা ডাক্তার আমাকে সব বুঝিয়ে দিলেন। হাসপাতালের বৈশিষ্ট্য এই যে কোথাও একটু টুঁ-শব্দ নাই।

চাংসার হিন্দু ডাক্তার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের একজন পর্বতবাসী মুসলমান। সুদূর চীনে থেকে থেকে আমাদের ভারতের নেতাদের সাম্প্রদায়িকতা বা "জিন্নার চৌদ্দ-দফা"র ছোঁয়াচ হতে এই ভদ্রলোক সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। সংখ্যালঘিষ্ঠতা বা বিশ্বমুসলিম ঐক্যের বালাই এঁর আদৌ নেই। ভারতের মুসলমানেরা যদি প্রবাসী ভারতীয় মুসলমানদের স্বাদেশিকতা এবং ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে সহৃদয়তা একবারও দেখে আসেন তা হলে হয়তো প্রভূত পরিমাণে এই সাম্প্রদায়িক কামড়া-কামড়ির পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। ডাক্তার সাহেবের বাড়ী ফিরে যেতেই তিনি নিকটস্থ এক চীনা মুসলমান মসজিদে আমাকে নিয়ে গেলেন। মসজিদের ইমামের সহিত পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় তিনি আমাকে খুব আদর আপ্যায়ন করলেন। চীন পরিভ্রমণে কোন কষ্ট হয়েছে কি না তা তিনি জানতে চাইলেন। ভবিষ্যতে পথে যাতে থাকা-খাওয়ার জন্য কোনরূপ অসুবিধায় না পড়তে হয়, তার জন্য তিনি চীনা ভাষায় একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, "এই পত্রবলে আপনার ভ্রমণপথে আপনি চীনের সর্বত্র চীনা মুসলমানের বাড়ীতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন এবং সকল রকম সহায়তা ও সাহায্য পাবেন।" ইমামের এই অপ্রত্যাশিত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে ডাক্তার সাহেবের সহিত ফিরে এলাম। পরিপাটী আহারের কাছে ডাক্তারের সহৃদয়তাই বেশী ভাল লেগেছিল। ভারতের দুই প্রান্তের দুইজন অধিবাসী, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা কতই না নিবিড়! তাঁর সৌজন্যে মুগ্ধ হতে হয়। উভয়ের শুভ পরিচয় ক্ষণিকের হলেও বিদায়বেলায় তাঁর গাঢ় আলিঙ্গন মনে পড়লে আজও প্রেম-প্রীতির নির্ঝরে অন্তর আপ্লুত হয়ে ওঠে।

পরের দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় এক সভাগৃহে ডাক্তার সাহেবের চেষ্টায় এক

জনসভার বন্দোবস্ত হয়। ডাক্তার সাহেবের সহিত নির্ধারিত সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে দেখি, বৃহৎ হলটি পূর্ণ হয়ে গেছে এবং জন ১৫।২০ ইউরোপীয় উপস্থিত হয়েছেন। সভায় ডাক্তার সাহেবই সভাপতিত্ব করলেন। চাংসার জনসাধারণের সমক্ষে ভারতের ব্যথার কথা সাধ্যানুসারেই নিবেদন করলাম। ইতিমধ্যে ভারত সম্বন্ধে এত বেশী বলা হয়েছে যে একপ্রকার কণ্ঠস্থ বলার মতই বলে গেলাম। অহিংসা ও অসহযোগ সম্বন্ধে তরুণ চীনের জানবার আগ্রহ আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি।

আমার বক্তৃতার পর একজন মার্কিন অধ্যাপক বক্তৃতা করলেন। অহিংসা ও অসহযোগ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ প্রশংসা করে অধ্যাপক বললেন যে ভারতের ধর্ম, ভারতের বিজ্ঞান, ভারতের ন্যায়শাস্ত্র পৃথিবীকে এক সময় আলোকিত করেছিল। এখন গান্ধীর এই অহিংসা ও অসহযোগ জগতের ভাবধারায় আবার যুগান্তর আনয়ন করবে ইত্যাদি। দেশের সর্বজনপূজিত মহাত্মা গান্ধীর সুনাম বিদেশীর মুখে শুনে অত্যধিক আনন্দ হল। একজন জার্মাণ অধ্যাপকও বক্তৃতা করতে উঠলেন। তাঁর নাকি চাংসা নগরে চিন্তাশীল পণ্ডিত বলে খুবই সুখ্যাতি আছে। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "আমি ভারত সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছি। ভারতের বেদ, বেদান্ত, গীতা, সংহিতা, উপনিষদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদি পড়ে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ভারতীয়েরা তর্কশাস্ত্রে বেশ সুপণ্ডিত। কিন্তু বাস্তবজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে তারা এতই পিছিয়ে পড়েছে যে নিজের দেশের শাস্ত্রের সম্যক্ অর্থ উপলব্ধি করার শক্তি তারা হারিয়ে ফেলেছে। তারা গীতা পড়ে ভক্তি নিয়ে, কিন্তু বাস্তবজীবনে তা' প্রয়োগ করার কৌশল তারা বিস্মৃত হয়েছে। ক্রমাগত এবং অনুক্ষণ পারত্রিক ছায়ার পিছনে ছুটাছুটি করতে করতে তারা জাতীয় জীবনের পরম খেয়া প্রাণউন্মাদিনী শক্তি খুইয়ে বসেছে।" গান্ধী কর্তৃক

অনুসৃত অহিংসা নীতিকে তিনি কঠোররূপেই আক্রমণ করলেন। তিনি উপহাসচ্ছলে বললেন, "পৃথিবীতে যত স্বাধীন জাতি আছে তারা সবাই মাংসাশী। সব্জীভোজী হাতীর পিঠে মানুষ চড়ে, শক্তিশালী মহিষের গলায় জোয়াল ওঠে, কিন্তু মাংসাশী জীব শৃগালও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।"

সকালে ইউরোপীয় কায়দায় সাজানো একটা স্থানীয় হোটেলে চায়ের নিমন্ত্রণে ইউরোপীয়দের সঙ্গে বৈঠক হল। একজন ইউরোপীয় উপদেশ দিলেন যে পরিভ্রমণের সময় রাজনীতি চর্চা যেন কখনও না করি। কারণ এতে অনেক সময়ে ফ্যাসাদে পড়তে হতে পারে। তথাস্তু, আমারও রাজনীতি চর্চা করার অভ্যাস মোটেই নাই। পথ চলাই আমার একমাত্র নেশা। এখানে একজন সিনেমার ম্যানেজারও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে বায়স্কোপ দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। চায়ের বৈঠক থেকে উঠে প্রাদেশিক লাটসাহেব 'জেনারেল হো'র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর ইংরেজী-জানা একজন কেরাণী আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে জেনারেল সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। জেনারেল সাহেবের ইংরেজী জ্ঞান একেবারে নেই বললেই হয়। কাজেই উক্ত কেরাণীর মারফতেই আমাদের সামান্য আলাপাদি হল। বিদায়ের সময় জেনারেল হো জানালেন যে হাঙ্কোতে সাইকেলে গেলে বড়ই নাকি বেগ পেতে হবে, কারণ প্রবল বন্যায় হাঙ্কোর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ভেসে গেছে এবং বন্যাত্রাণ কার্য আরম্ভ করতে হয়েছে। সেই জন্য হাঙ্কো পর্যন্ত ট্রেনের ভাড়া বাবদ ৫০ (চীনা) ডলার তিনি আমাকে একরূপ পীড়াপীড়ি করেই দিয়ে দিলেন।

আজ চাংসা হতে বিদায়ের পালা। ঘুম থেকে উঠেই দেখি, পরিচিত অপরিচিত অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। হোটেলওয়ালা খাবার নিয়ে এল।

খাবার যা দিয়েছিল, তার অর্ধেকটাও খেতে পারলাম না। যাবার বেলা পেট ভরে খেয়ে নেওয়া বড়ই মুশকিল। অনেক দিন চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠি নি। পরিচিত বন্ধুদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সাই-কেলে উঠে পড়লাম। স্নেহ, দয়া, মায়া, সব পিছনে পড়ে রইল। এবার হাঙ্কো আমার গন্তব্য স্থান। কাজেই শুধু হাঙ্কোর কথাই মনে পড়তে লাগল। এত করে যে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলাম তা নিমিষে ছিন্ন হয়ে গেল। শহর ছেড়ে একটু দূরে এসেই জেনারেল হোর কথা মনে করে একটু ভাবনায় পড়লাম। কারণ তিনি বলেছিলেন যে হাঙ্কোর পথ জলে ভেসে গেছে, আর সে পথে বন্যাগ্রস্ত ব্যক্তিরা একটু অত্যাচারও করতে পারে। যদি চলতে হয় তবে মনের মধ্যে এসব ভাবনার মোটেই স্থান দিতে নেই। তাই পরমুহূর্তেই ভাবনা দূর করে দিলাম।

মাইল পাঁচেক দূরে এসেই দেখি, পথটা তিন ভাগ হয়ে তিন দিক হতে হাতছানি দিচ্ছে। ভাবতে লাগলাম কোন্ দিকে যাই। চীনের সাধারণ লোককে কখনও কোনস্থানের নাম জিজ্ঞাসা করলে তার কোন হদিস পাওয়া মুশকিল। কারণ একই স্থানের নাম নানাভাবে উচ্চারিত হয়। যাকে মুকডেন বলা হয় তাকে কেউ কেউ ফেনটিংও বলে। এই ক্ষেত্রে মানচিত্র দেখে গন্তব্য স্থানের পথ বের করতে হয়। চীনা মানচিত্রে পূর্ব হতেই বড় বড় স্থানগুলি চিহ্নিত করে নিয়েছিলাম। এক গোবেচারী চীনা মজুর পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকেই পথের সন্ধান বলে দেবার জন্য মানচিত্র দেখাতে লাগলাম। মানচিত্রে হাঙ্কো শহরটি দাগ দেওয়া ছিল। আঙ্গুল দিয়ে স্থানটি দেখাতেই সে পথ বলে দিল। পথের সন্ধান পেয়ে আনন্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমি ভারতের কথা মনে পড়ল। আমাদের দেশে মানচিত্র দেখে কজন এরূপ পথ বলে দিতে সক্ষম হয়?

গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে যেতে লাগলাম। কিছুই নূতন ঠেকছিল না। একদিন গেল, দুদিন গেল, তারপরই মনে হল যেন নূতন কিছু দেখতে পাচ্ছি। জেনারেল হো যা বলেছিলেন তার কতকটা যেন মিলে যাচ্ছিল। ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরে ছেলেমেয়ে, যুবকযুবতী, বৃদ্ধবৃদ্ধা অলসভাবে গ্রামে-গ্রামে ভিক্ষা করছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই তারা কিছু সাহায্য করবার জন্য বলছে। এই হল এক গোছের ভিখারী। অন্য ধরণের ভিখারীগুলি লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌, কুইক মার্চ করে গ্রামগুলির বুকের উপর দাঁড়িয়ে গৃহস্থকে চাঁদা দিতে বাধ্য করছিল, এভাবে তারা চাঁদা আদায়ও করছে দেখতে পেলাম। এতেও গ্রামের লোকজন ত্যক্তবিরক্ত হচ্ছে না, যার যা সাধ্যে কুলায় সে তাই হাসিমুখে এগিয়ে দিচ্ছে। সেই দানের ভিতরে কতই না আন্তরিকতা! দেখলে বেশ আনন্দ হয়। আমার কাছে কয়েকটি ছেলে মাথা হতে টুপি খুলে ইউরোপীয় কায়দায় ভিক্ষা চাইল। টাকার ব্যাগে যা ছিল তাই উজাড় করে দিয়ে দিলাম। ছেলেগুলি এতে তৃপ্ত হয়েছিল কি না, জানি না, কিন্তু আমার মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হল। এখন আমি স্থির করলাম, যদি পৌছতে পারি তবে কোন রেল ষ্টেশনে গাড়ী ধরবই। পথঘাট তত ভাল নয়। স্থানীয় লোককে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বড় একটা জবাব দেয় না। গ্রাম্য হোটেলগুলিতেও থাকবার স্থান পাওয়া যায় না। এখানে এসে অন্যান্য স্থানের থেকে একটা পরিবর্তন অনুভব করতে লাগলাম। ভেবেছিলাম, হয়তো এরা আমাকে অন্য কিছু মনে করে, কিম্বা জাপানীও ভাবতে পারে। কার মনে কি আছে তা জানি না, কিন্তু এদের এই নিষ্ক্রিয় অসহযোগ ভাল লাগছিল না। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। এখন আর হোটেল ছাড়া খাওয়া মিলে না, যা মিলে তাও অনেকটা অখাদ্য। তারপর ভিখারীর কে তোয়াক্কা রাখে? হাঙ্কো-তে পৌছতে এখনও অনেক দিন

লাগবে। আমার হিসাবমত রেল ষ্টেশনে পৌঁছবার জন্য প্রতিদিন পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে চলছিলাম। পা দু'খানা প্রায় প্রত্যেক দিনই বিদ্রোহ ঘোষণা করত। শরীরটা যেন ভেঙে পড়ছিল। তারপর আজ মনটাও বেঁকে বসল। বিকাল বেলায় একটি ছোট গ্রামে কোনও রকমে পৌঁছলাম। কিন্তু হঠাৎ কটা ছোকরা এসে আমার পিছন নিল। তারা কখনও সাইকেলের আগে, কখনও বা পিছনে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে দু-একটা ঢিল যে ছুঁড়ছিল না তাও নয়, কিন্তু সবই সহ্য করে নিচ্ছিলাম। অনেকবার হাসতে চেষ্টা করেছি, পেরে উঠি নাই। হাসির উৎস যেন শুকিয়ে গিয়েছে। ছেলেরা দলে ক্রমেই ভারী হচ্ছিল। আমার ইচ্ছা হল, ওদের পিছনে রেখে তাড়াতাড়ি সাইকেল চালিয়ে এই বিশ্রী কাণ্ড হতে রেহাই পাই, কিন্তু পা যে চলছিল না। ছেলেদের চেঁচামেচি শুনে এক বৃদ্ধ ঘর হতে বেরিয়ে এলেন। আমাকে নাকাল করেছে দেখে বৃদ্ধ ছেলেদের বেশ একটা ধমক দিলেন। ছেলেগুলি এদিক সেদিকে পালিয়ে গেল।

আমি বৃদ্ধের ঘরে গিয়ে দেখি, সেটা একটা চায়ের দোকান। এক পেয়ালা চীনা চা এবং একটা তিলের পিঠা তাঁকে দিতে বললাম। বৃদ্ধ সানন্দে আমাকে সেগুলি দিলেন। তারপর বৃদ্ধকে আমার অটোগ্রাফ বইটা দেখতে দিলাম। তিনি বেশ মন দিয়ে তা পড়লেন। তারপর বইটা ফেরৎ দিয়ে একখানি রেকাবীতে আমাকে ভাত এবং সামান্য তরকারী খেতে দিলেন। এরূপ রেকাবীতে খাবার দেওয়া চীন দেশে এই প্রথম দেখলাম। খেয়েই কাছের একটা বেঞ্চে হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন উঠলাম তখন গ্রামের লোক ঘুমিয়ে পড়েছে। গ্রাম নিস্তব্ধ। দোকানে কয়েকজন লোক বসে মৃদুস্বরে গল্পগুজব করছে আর মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে! আমার ওঠার সঙ্গে

সঙ্গেই ওরা কোথা হতে একটা লম্বা টেবিল এনে তাতে নানা রূপ খাদ্য সাজিয়ে দিল। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ এসে আমাকে গরম জল এবং একখানা পরিষ্কার গামছা দিয়ে গেলেন। আমি হাতমুখ ধুয়ে শরীর ও মনটাকে চাঙ্গা করে খাবার টেবিলে বসলাম। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় সবই ছিল। ভূরিভোজনের কসুর হয় নি। ভাবলাম, হয়তো বিছানা দেবে না, তাই নিজের বিছানা খুলে ঘরের এক কোণে তা বিছাতে লাগলাম। বৃদ্ধ এসে ইঙ্গিতে জানালেন যে বিছানার বন্দোবস্ত হয়েছে। কাজেই আমার বিছানা গুটিয়ে রাখলাম। যারা আমার সঙ্গে বসে খেয়েছিল তারা কোথায় উধাও হয়ে গেল তা বুঝতে পারলাম না।

বৃদ্ধ ঘরের ভিতর কি জানি খোঁজাখুঁজি করছিলেন। তিনি একখানা লম্বা দা এবং একটা মোমবাতি বের করলেন। মোমবাতিটা বোধ হয় আমার হাতের দেড় হাত লম্বা হবে। বৃদ্ধের হাতে দুই টিন সিগারেট, দুটী দেশলাই, এক কেটলী চা—আরও কত কি ছিল এখন আর তা মনে নাই। তবে ধারণা হল, হয়তো পরদিন কোনও পর্ব হবে, নতুবা এরূপ ভাবে তিনি ছোট ছোট জিনিস খুঁজে বের করছেন কেন? যারা আমার সঙ্গে খেয়েছিল তারা অনুমান এক ঘণ্টা পরে ফিরে এসেই বৃদ্ধের কাছে কি বলল। বৃদ্ধ আমাকে শুতে যাবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তিনি যে সব সরঞ্জাম একত্র করেছিলেন, লোকগুলি তা সবই হাতে করে নিয়ে গেল। বৃদ্ধ ঘরের দরজায় তালা দিলেন। আমরা অন্ধকার পথে এসে দাঁড়ালাম। কি ভীষণ সে অন্ধকার! হয় মেঘ অন্ধকারকে ঘনীভূত করেছিল, নয় আমার চোখের জ্যোতিই কমে গিয়েছিল। বৃদ্ধ আমার কাছ দিয়ে চলছিল। বৃদ্ধের হাতে দা-টি দেখে আমার বড়ই ভয় হচ্ছিল। এ কি নরবলির ব্যবস্থা হচ্ছে নাকি? আমাকে এত পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেন? মনে মনে স্থির করলাম, বৃদ্ধের শরীরে যে শক্তি আছে, তাতে

যদি আমি তাঁকে হঠাৎ আক্রমণ করে দা-টা কেড়ে নিই, তবে বৃদ্ধ কিছুই করতে পারবে না। তারপর যে দা দিয়ে আমার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা হচ্ছে তা দিয়ে অন্ততঃ দুএকজনের মুণ্ডপাত না করে আমি নিহত হব না।

পথ চলার বিরাম ছিল না, আমার মনে হয় গ্রাম ছেড়ে অন্ততঃ অর্ধমাইল দূরে চলে এসেছি। একে অন্ধকার, তার উপর একটা গভীর নিস্তব্ধতা। আমার শরীরটা যেন ছমছম করতে লাগল। আর কিছু দূর এগিয়েই একটা আলো দেখে ভয় অনেকটা চলে গেল। কাছে গিয়ে একটা পরিত্যক্ত বাড়ী দেখলাম, কিন্তু তা পরিত্যক্ত হলেও বেশ সাজানো-গুছানো ছিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করতেই একটা দুর্গন্ধ অনুভব করলাম। এরূপ দুর্গন্ধ শুধু চীন দেশে নয়, ফরাসী দেশের প্যারী নগরের বুকের উপর দিয়েও মাঝে মাঝে বয়ে যায়। এ নিয়ে চীনাদের গালি দেওয়া কিম্বা নাক সিঁটকানো ভাল মনে করি না। প্রায় অর্ধেকটা ঘর জুড়ে মাচা করে তার উপর বিছানা পাতা হয়েছে। এই বিছানায় ইচ্ছা করলে পঁচিশ জন লোকও আরামে শুতে পারে। হয়তো আমরা সবাই শোব, তাই এ ব্যবস্থা।

বিছানার পারিপাট্য দেখে বেশ আনন্দ হল। এরূপ বিছানায় অনেকদিন শুইনি। তার ঠিক মাঝখানে একটি মাত্র মশারি টাঙ্গানো রয়েছে। এছাড়া এই মশারীটার ভিতরে একটা মোমবাতিও মিট মিট করে জ্বলছে। বৃদ্ধের সঙ্গে আনীত কেটলী, দুটি দেশলাই, সিগারেট সবই মশারির ভিতরে বালিশের কাছে রাখা হ'ল। তারপর বড় মোমবাতিটিও জ্বালানো অবস্থায় রইল। ঘরখানি আরও আলোকিত হলে বৃদ্ধ আমাকে শুতে ইঙ্গিত করলেন এবং সবাই মিলে আমাকে চীনা ধরণের নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। বিদায়ের বেলায় দেখলাম, বৃদ্ধ তাঁর বড় দা-খানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সন্দেহ করার কিছুই ছিল না আমাকে

এগিয়ে দিবার জন্যই যে এ রণসজ্জা হয়েছিল তা ভেবে মনে মনে একটু হাসলাম। যে ঘরে শুলাম তার সামনের ও পিছনের দরজা দুটি ঠিক মুখোমুখি ছিল, কিন্তু তাতে কোন কপাট ছিল না। তবে কপাট থক আর না-ই থাক আমার তাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। কারণ চীনের ডাকাত, চোর জলদস্যু সব বেটাকেই দেখে নিয়েছি। কেউই তো প্রাণে মারে না। তবে আর ভয় কি ? বিছানাতে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তার খেয়াল ছিল না।

যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন দেখি স্নিগ্ধ সূর্যকিরণ ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। আটটা বোধ হয় বেজে গেছে, আমাকে যে অনেক দূর যেতে হবে। তাই এক লাফেতে বিছানা হতে উঠে যেমনই মাটিতে নামব, অমনি সাজানো মাচার একপাশে অসাবধানতা বশতঃ আমার পা পড়তেই বিছানা সমেত তা আমার গায়ের উপর পড়ল। শরীরটা কেঁপে উঠল ! একটু ভাল করে লক্ষ্য করতেই ব্যাপারখানা কি বুঝলাম। এক দুই করে গুণে দেখলাম, আটটি মৃতদেহপূর্ণ কফিনের উপর আমার বিছানা পাতা হয়েছিল। এই ঘরটা হল চীনাদের কবরস্থানের সদর দরজা মাত্র। ওরা অষ্টমী এবং পূর্ণিমা ছাড়া কখনও কবর দেয় না। এর মধ্যে যারা মরে তাদের এই দুই তিথির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই আটটি কফিনে আটটা মৃতদেহ অষ্টমীর অপেক্ষায় আছে। তারই উপর পাতা জমকালো বিছানায় আমাকে শুতে হয়েছিল !

টাকার ব্যাগটা পকেটে পুরে যেমনই ঘর হতে বের হয়েছি, অমনি বৃদ্ধের উপর আমার চোখ পড়ল। তাঁকে একরূপ টেনে নিয়েই তাঁর বাড়ীর দিকে চলতে লাগলাম। বৃদ্ধের বাড়ীতে গিয়ে আমার গচ্ছিত বইখানা আদায় করে এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বেঁধে সাইকেলে চাপলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, এখন থেকে কোন গ্রামে গিয়ে আর স্বাক্ষরের বই দেখাব

না। কারণ তার পাতায় পাতায় চীনা ভাষায় "লিমনাথ বিশোয়াসী" বড়ই সাহসী এবং শক্তিশালী এই কথা কয়টি লেখা ছিল বলেই যে এরা আমার শক্তি ও সাহস পরীক্ষার জন্য আমাকে এত ঘটা করে আটটি কফিনের উপর শুতে দিয়েছিল তা আর বুঝতে বাকি রহিল না। বৃদ্ধ চীনা দোকান-দারের বাড়ী থেকে বের হতেই, কি জানি এক অদম্য শক্তি জেগে উঠল। পূরাদমে সাইকেলটা চালিয়ে গ্রামের বাইরে ফাঁকা মাঠে এসে পড়লাম। মুক্ত বায়ু ও গ্রামের চারিদিকের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য মনটাকে চাঙ্গা করে তুলল। গুন্ গুন্ করে গান ধরলাম। যদিও পথঘাট ভাল নয় তথাপি বিজয়ী বীরের মত চলতে লাগলাম। গত রাত্রের জয় মনে এমন একটা অনির্বচনীয় আনন্দের সৃষ্টি করেছিল যে গন্তব্যস্থানে কখন পেঁছিব সে কথা মনেও হচ্ছিল না। পথ পথই—চললে পরেই তা শেষ হবে। আমার প্রার্থনায় কিম্বা ক্রন্দনে পথ ছোট হয়ে যাবে না।

হিন্দু ডাক্তারের বন্ধু ইমাম সাহেবের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে মুসলমান চীনাদের নামে একখানি চিঠিও দিয়েছিলেন। তাই আজ একটি মুসলমান চীনার বাড়ী অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। কথাটা বেশ করে মাথায় পেকে উঠল। গ্রাম এসে গেল, কিন্তু বিকাল না হলে রাত্রি কাটাবার স্থান কেন খুঁজব? আমার চলতি প্রথা মত একটা বাড়ীতে খাবার খেয়ে নিলাম। আজকের দিনটা ভালই যাবে বলে মনে হল।

চারটের পূর্বেই একটা ছোট গ্রামে এলাম। গ্রামখানা পরিষ্কার বললে দোষ হয় না। একটা ঘরের বারান্দায় একখানি বেঞ্চ পড়ে রয়েছিল, তাতেই বসে পড়লাম। গ্রামের লোকের দৃষ্টি এড়াতে পারি নাই। অনেকেই এসে আমাকে এক পলক দেখে গেল, অনেকে কথা-বার্তা বলল, আবার অনেকে নিজ নিজ বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যেতে

চাইল। আমি ক্রমাগত 'মুসলমান চীনা' শব্দটি আওড়াতে লাগলাম। যে-ই শব্দটি শুনছিল সে-ই আমার প্রতি যেন একটু ঔদাসীন্যের ভাব দেখাতে লাগল। কিন্তু তারা এমন করছে কেন? এখানেও কি তবে ভারতের মত হিন্দু-মুসলমানে দ্বন্দ্ব? যা হবার হবে। একটা বেঞ্চি তো পাওয়া গেছে। শোবার ভাবনা নেই। দুপুরে খেয়েছি। রাত্রে দুমুঠো ভাত জুটে যাবেই, তবে আর এত ভাবনা কিসের? কিন্তু সত্য বলতে কি, গ্রামে এসে বেঞ্চিতে শুয়ে থাকতে মন চাইল না। ইচ্ছা হল কারও বাড়ীতে, নয় একটা হোটেলে গিয়ে জন্মগত অভ্যাসমত সকলের সঙ্গে মিলেমিশে সময় কাটাই। ঠিক করলাম, হয় আজ মুসলমান বাড়ী যাব, নয়, এই বেঞ্চিতেই রাত্রি কাটাব।

সন্ধ্যা হবার একটু পূর্বে একটি যুবক এল। তার মুখ দেখলেই মনে হয়, কি যেন এক মনোকষ্ট তাকে নিতান্ত পীড়া দিচ্ছে—অথচ সে মনের ভাব গোপন করতে চেষ্টা করছে। তাকে 'মুসলমান চীনা' বলতেই সে উত্তর দিল 'হাঁ'। পকেট হতে তাকে ইমামের পত্রখানা দিলাম। সেটা বেশ ভাল ভাবে পাঠ করে সে আমাকে "লইলা" (আসুন) বলল। তারপর সে আমার সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে চলতে লাগল। বেশী দূর যেতে হল না। দূর হতেই গ্রামের পিছনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী দেখা গেল। আমার ধারণা ছিল না যে চীনা মুসলমানদের এত বড় বাড়ী থাকতে পারে। সদর দরজা পার হয়ে আমরা একটা ছোট দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তারই পাশে একখানি ঘর। বাঁতি জালানো, বিছানা পাতা, দরকারী জিনিস সাজানো, দেখলেই মনে পড়ে বাংলা দেশের ভদ্রলোকের বৈঠকখানার দৃশ্য। যুবক আমাকে ঘরে বসিয়ে বাড়ীর ভিতরে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এসে স্নান করব কিনা জিজ্ঞাসা করল। আমি সানন্দে জানালাম, হাঁ, স্নান করব।

আমি পথিক, পথের দুঃখকষ্ট এবং ক্লান্তির অপনোদন হয় স্নানে। স্নান এনে দেয় মনের মধ্যে একটা অপরিসীম পবিত্রতা। তাই কাপড় ছেড়ে অন্দর মহলে স্নান করতে গেলাম। বহু ছোট-বড় কোঠা, প্রায় সব ঘরেই লোকজন চলাফেরা করছে। আমাকে তাদেরই পাশ কাটিয়ে স্নানের ঘরে যেতে হয়েছিল, কিন্তু কেউ ফিরেও তা দেখল না। এ কি আভিজাত্যপূর্ণ ভাবের অভিব্যক্তি! যা হোক, তাতে বয়ে গেল। রাত্রিটা শুধু কাটাতে হবে, এর বেশী তো আর নয়! স্নান হলে যুবক আমাকে এক প্রস্থ চীনা পোশাক পরতে দিল। আমিও কোনরূপ দ্বিধা না করে সেগুলি পরে ঘরে এলাম। চীনা চায়ের পরিবর্তে দুধ-চিনি-দেওয়া চা এবং একখানা ছোট পাঁউরুটি পাওয়া গেল। পাঁউরুটি দেখে মনটা আহ্লাদে আটখানা হয়ে নেচে উঠল। সেটা একরকম গিলেই খেয়ে ফেললাম। তারপর চা-পান—যুবকটি আগাগোড়া আমার কাছে সুবোধ ছেলেটির মত দাঁড়িয়েছিল। দেখলাম সে আমার খাবার পদ্ধতি ভাল করেই লক্ষ্য করছে। যুবক চলে গেল। তারপর এক অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ ঘরে ঢুকেই আমাকে 'সেলাম আলেকম' বললেন। আমি হাতজোড় করে তাঁকে নমস্কার করলাম। যে পত্র আমি ইমামের কাছ থেকে এনেছিলাম তাতে পরিষ্কারভাবে লেখা ছিল যে 'আমি কাফের হিন্দু'।

বৃদ্ধ হিন্দুস্থানে অনেকদিন ছিলেন। দিল্লী, আগ্রা, বোম্বাই এবং কলকাতা তিনি দেখে গিয়েছেন, এ ছাড়া মক্কাও গিয়েছিলেন। তিনি বেশ ভাল হিন্দুস্থানীতে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর একটি কথাও ভুলবার মত ছিল না। এখনও ভুলি নাই। তিনি বলেছিলেন যে ভারতের "মুসলিম হিন্দুদের" মত এখানকার কাফের চীনারাও গোমাংস খায়। গোমাংস খায় বলে কাফের চীনাদের উপর তাঁর কোনও রাগ নেই, তবে গাভী হত্যা এবং বিশেষ ক'রে গর্ভবতী গাভী হত্যা তাঁর মোটে-

ভাল লাগে না। কাফের চীনারা কিন্তু গর্ভবতী গাভী হত্যা করতে বড়ই ওস্তাদ। প্রথমতঃ তারা পেটচিরে একটি কচি বৎস পায়, তার নখ হতে মুণ্ড পর্যন্ত সুখাদ্য। দ্বিতীয়ত তারা পায় গাভীর স্তনের জমানো দুধ, তা ভেজে সুস্বাদু তরকারী করা হয়। তারপর গর্ভবতী গাভীর মাংসও উপাদেয় খাদ্য। ভদ্রলোক দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "চীন দেশ হতে কাফের চীনারা গোজাতি এমনভাবে ধ্বংস করতে আরম্ভ করেছে যে, যে দুএকটা গরু তারা পালছেন, তার উপরও কাফেরগুলির সর্বদা লোলুপ দৃষ্টি। এসব গোধন চুরি করতে কাফেরগুলি এত ওস্তাদ যে পকেট-কাটা হতেও গরু চুরি তারা তাড়াতাড়ি করতে পারে। তারপর বধের নিয়মও বীভৎস রকমের। প্রথমতঃ তারা জীবটার ঠ্যাং বেঁধে ফেলে দু'হাত লম্বা একখানা ধারালো ছুরি ঢুকিয়ে দেয়। এক বিন্দুও রক্ত মাটিতে পড়তে দেয় না। সব রক্ত একটা পাত্রে ধরে রাখা হয়। ঐ রক্ত জমিয়ে তারা ছোট ছোট টুকরা করে কাটে। পরে তা ভেজে তার ঝোল রান্না করে।" বৃদ্ধের কথাগুলি শুনছিলাম, কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম বের হচ্ছিল।

বৃদ্ধ আরও বলতে লাগলেন, "সেদিন আমারই বাড়ী হতে একটি যুবতী গাভীকে চুরি করে নিয়ে কাফেরগুলি হত্যা করেছে! এই গাভীটির দাম অন্ততপক্ষে দুশত মেক্স (চীনা ডলারকে মেক্স বলা হয়)। কাফেরগুলির অত্যাচার এখন চরমে উঠেছে। টাকা কর্জ নেবে, কিন্তু ফেরত দেবার কথা ওঠালেই তারা তেড়ে আসে। তাদের সংখ্যাধিক্য তো আছেই, তার উপর রাজশক্তিও যেন টলটলায়মান। কে কার দিকে চায়? এরূপ করেই আমাদের দিন কাটছে।"

তারপর বৃদ্ধ খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করতে গেলেন।

চীনা ধরণেই খাওয়ার বন্দোবস্ত হল। স্ত্রীপুরুষ সবাই মিলে খেলাম

কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে খাদ্যে কোনও রূপ আমিষ ছিল না, ঘি, মাখন, দই, দুধ এবং ভারতীয় ধরণের তরকারীই ছিল। খাওয়া শেষ করে আবার বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। এবার বৃদ্ধকে কথা বলতে না দিয়ে আমার কথার জবাব চাইলাম। প্রশ্নগুলির জবাব পেয়ে ধারণা হল যে চীনদেশে যত চীনা মুসলমান আছে তারা সবাই হয় ধনী, নয় মধ্যবিত্ত গোছের। গরীব তাদের মধ্যে নেই। সাধারণতঃ তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং কাফের চীনাদের রাড়ীতে খায় না, এমন কি তাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতেও ভালবাসে না। যত বড় পদবীধারীই হউক না কেন কাফের চীনারা মুসলমানদের সঙ্গে একত্র বসতে পারে না। তারা কখনও কাফের চীনাদের অভিবাদনও করে না। কাফেররাই আগে অভিবাদন করে আসছে এবং এখনও করে। বৃদ্ধের দুটি নাম—একটি হল মহম্মদ ইব্রাহিম, আর একটি হল ম' চেন। এই মা চেন নামেই তিনি লোকসমাজে পরিচিত।

মহম্মদ ইব্রাহিম নাম লোকসমাজে মোটেই না চলবার একটি কারণ হল, কাফের চীনারা আরবী মোটেই উচ্চারণ করতে পারে না। উচ্চারণের চেষ্টা করা তো দূরের কথা, আরবীকে বরং তারা ঘৃণার চোখেই দেখে থাকে। বৃদ্ধের কাছ থেকে এতগুলি সংবাদ সংগ্রহ করে হাঁপিয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়ার ইচ্ছা হল। তাই বৃদ্ধকে মুখ ফুটেই বলতে হল যে আমি এখন শুতে চাই। বৃদ্ধ সে রাত্রের মত আমাকে ছেড়ে দিলেন। এই ক্রমাগত কথা বলার বালাই হতে বৃদ্ধ যেন থামতে চান না। তিনি শুধু নিজেই বলতে চান, অপরের কথা শুনতে তাঁর মোটেই ভাল লাগে না।

প্রাতে যদিও চলে যাবার ইচ্ছা ছিল না, তবু হাবভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগলাম যে আমি চলে যেতে চাই। বৃদ্ধ আজকের দিনটাও থেকে যাওয়ার জন্য বার বার বলতে লাগলেন। তারপর অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে স্বেচ্ছায় থেকে গেলাম। প্রাতরাশ সমাপন করে ক্ষুদ্র চীনা মুসল-

মান পল্লীতে বেড়াতে বের হলাম। কয়েকটা বড় বড় বাড়ী, আর তার সঙ্গে বাগান ; কিন্তু বাড়ীই আছে, লোকজন বড় নাই। চারি দিকে যেন প্রেতপুরীর মত একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। যুবকযুবতী, বালকবালিকা কারও মুখে কথা নাই, মনে আনন্দ নাই। একটা নীরব নিথর নিস্পন্দ ভাব। এদের দেখে হঠাৎ আপনা হতেই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল—এ অবস্থার জন্য দায়ী কে ? চিন্তা করতেই পরক্ষণে জবাব মিলল। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার অহমিকাই এই সর্বনাশা পথে এদের টেনে নিয়ে গেছে। যদিও খাওয়ার লোভে রয়ে গেছি, তবুও মনটা এ-হেন স্থানে আর যেন তিষ্ঠতে চাইল না। মুসলমান পল্লী পার হয়েই অন্য চীনা পল্লীতে পড়লাম। অভাব-অভিযোগ এদের লেগেই আছে। ভিখারীরা দল বেঁধে চলেছে। তারপরে চলেছে স্বেচ্ছাসেবকের দল। চাঁদা আদায় নিয়ে এরা ব্যস্ত। এদিকে এসে যেন দেহে প্রাণ এল। হোক এরা গরীব, তবুও এদের প্রাণ আছে। কারণ, তারা কথা কইছে, হাসছে, কাঁদছে। অনেকক্ষণ বেড়াতে ভাল লাগল না। কোন্ পল্লীতে আড্ডা নিয়েছি তা এ পাড়ার চীনারা জানে, তাই কেউ আর কথা কইছে না দেখে আমি ফিরে এলাম।

বৃদ্ধ আমারই জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। আসামাত্রই নানা কথা উত্থাপনের পর কোয়াণ্টাং প্রদেশের অনেক সংবাদ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর কথার যথাযথ উত্তর দিয়ে আমি তাঁর নিকট জানতে চাইলাম যে তাঁরা অন্য চীনাদের সঙ্গে তেমন ভাবে মেলামেশা করেন না কেন, আর তাঁদের পাড়ার লোকদের এরূপ নির্জীবতারই বা কারণ কি ? বৃদ্ধ তার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে আমার কথা এড়িয়ে গেলেন। আমিও আর জবাব পাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করি নাই।

পরদিন প্রাতে গ্রাম ছেড়ে ইউচৌ নামক শহরে পৌছলাম। শহরে

পৌঁছেই ছোট একটা হোটেলে গেলাম। ঠিক হল, খাওয়া শোওয়া নিয়ে সত্তর সেণ্ট দিতে হবে। ঘরখানা ভালই। একটু বিশ্রাম করেই বেরিয়ে পড়লাম। অলিগলি ঘুরে এলাম। এখানে বাস্তবিকই ইয়াংসী নদের প্লাবনের ধাক্কা লেগেছে। মানুষ যে প্লাবনের দ্বারা এত বিপর্যস্ত হয় তা আমার ধারণা ছিল না। তবে এটা চীন দেশ বলেই গরীবের দল এখনও বেঁচে আছে। যার যা সাধ্য তা সে দান করেছে। তাতেও হচ্ছে না। গরীবের ক্ষুধা ভয়ানক। অত্যাচারও যে হয় নি তা বলা যায় না। ভিখারীরা স্বভাবভিখারী নয়, এরা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এদের জুলুম দেখলেই মনে হয় যে পেটের ক্ষুধায় অস্থির হয়েই এরা এই দৌরাত্ম্য করছে।

এরপর আমি চীনের বিখ্যাত নান্‌কিন্ শহরে যাই। নান্‌কিন্ আমার ভালই লেগেছিল। নবচীনের জন্মদাতা সান-ইয়াৎ-সেনের সমাধি, চিয়াং-কাই-সেকের বাড়ী এবং শহরের বাইরে দু'একটা ঐতিহাসিক স্থান দেখে আমি নান্‌কিন্ ত্যাগ করি। এর পর হতেই আমি গ্রাম্য পথে চলতে স্বরু করেছি। অন্যান্য স্থান থেকে এই অঞ্চলের পথে সাইকেল চালানো একটু কষ্টকর বলা যেতে পারে। তার একমাত্র কারণ হল পথগুলি বড়ই উঁচু-নীচু। যারা নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কমিউ-নিষ্ট আখ্যায় ভূষিত করে যাদের বদনাম রটানো হয়, তাদের গ্রামের কাছের পথগুলিই চলাচল করার যোগ্য, অন্যান্যগুলিতে পূর্বের মতই স্থানে স্থানে কাদা জমে রয়েছে, আর তাতে গ্রাম্য শূকরগুলি শরীর ডুবিয়ে নাক ভাসিয়ে দিব্য আরামে আছে। এছাড়া দুর্গন্ধ এতই অসহ্য যে পূতিগন্ধ নরক যেন এখানে বাস্তবরূপ নিয়ে সারা অঞ্চলের বাতাস ভারী করে তুলেছে। অথচ এ পথেই আমাকে চলতে হবে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেনাদল বড়ই বিরক্ত করছিল, তা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। তথাপি আমি এগিয়ে চললাম।

কতদিন চলেছি তার ঠিকঠিকানা নাই। কারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়েনি বলে কোন দিনলিপি লেখার প্রবৃত্তিও হয় নি। একদিন ঠিক করলাম নদীতীরে যদি পৌছতে পারি তবে অন্ততঃ জাহাজে চড়ে সাংহাই যেতে পারব। কারণ এখানকার লোকগুলি পথিককে আর তেমন সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে না। হয়তো এরা বিদেশী দ্বারা অনেকবার অত্যাচারিত হয়েছে! বিদেশীর কথা ছেড়ে দিলেও দেশী সৈনিকরাও তাদের সঙ্গে বড় ভাল ব্যবহার করে না। যারা পল্টনে ভর্তি হয়েছে, সরকারকে নানা দিক দিয়ে সাহায্য করছে, তারা তো গ্রামে বসে নেই। তারপর চীনা সৈনিক একটু অন্য রকমের। এরা একটু-আধটু লেখাপড়া শিখেছে। যখনই তারা বুঝতে পারে যে সরকার তাদের নয়, তখনই তারা বিদ্রোহ করে বসে। ফলে সে একা মরে না, তার আত্মীয়স্বজনের উপরও অত্যাচার গড়ায়। এরূপ ধরণের লোকেরা যে গ্রামে বাস করে হয়তো সেই গ্রামকে গ্রামই তছনছ হয়। কারণ গ্রামবাসীরা আপনজনকে ছাড়তে রাজি হয় না। বিশ্ববিখ্যাত চীন জাতির চেয়ে তাদের ষড়যন্ত্রের নামডাক আরও বেশী। দেখলে বোঝা যায় না এই জাতি দ্বারা এত বড় কর্ম সাধিত হতে পারে। তবে এটা লক্ষ্য করেছি, গ্রামের লোক আমার প্রতি কোনরূপ ঘৃণা প্রকাশ করছে না বরং দায়ে পড়েই যেন এড়িয়ে থাকতে চায়।

আমার মন একেবারে বদলে গেছে, একটু ভাল লাগছে না। কি দেখব কি না দেখব তা ঠিক করে উঠতে পারছি না। তারপর কয়দিন ধরে স্নান হয় নি, খাওয়াও জোটে নি। কাজেই মনকে ঠিক রাখা বড়ই কষ্টকর। নদীতীর লক্ষ্য করে চললাম। তিন দিন ক্রমাগত পথ চলে চলে একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে বসে আছি এমন সময় দেখি সম্মুখে আবার পাহাড়। প্রথমত চোখ দুটাকে বিশ্বাস করলাম না, কিন্তু একটু

পরে যখন পাহাড়টির দিকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি পড়ল তখন এটা যে ঠিকঠিকই পাহাড়, নদী নয় তা বুঝতে বাকি রইল না, আমার মগজও অনেকটা বিগড়ে গেল। ধৈর্য আমার চির সহায়। তাও আর অটল রাখতে পারি না। নির্বাক হয়ে বসেই রইলাম।

রাত্রি অন্ধকার, হাত বাড়ালে হাত দেখা যায় না। আমি জনহীন প্রান্তরে একা। ভয় বোধহয় সকলেরই আছে! এরূপ বিজন প্রান্তরে একা রাত্রিযাপন করা আমার ইচ্ছাকৃত কাজ, তাই কারও উপর রাগ হল না, ভয় হল না! কিন্তু অর্শ আবার বেড়েছে, শরীরটা বড়ই খারাপ। এমন কি মাইল দু-এক যাবার পরই একবার করে সাইকেল হতে নামতে হত। সারাটি দিন এরূপ করে কাটিয়ে নিরালা প্রান্তরে একা থাকাটা সকলের ভাল নাও লাগতে পারে, কিন্তু আমার কাছে বেশ লাগছিল। তার পর চীন দেশে এমন জানোয়ার নাই যে আঁধারে গা ঢেকে এসে আমাকে আক্রমণ করে বিপন্ন করতে চেষ্টা করবে। এক আছে ভূতের ভয়। যে মরা মানুষের কবর খুঁজে সেখানে রাত্রি যাপন করে, তার কাছে ভূতের ভয় হাসির কথা নয় ত কি? কিন্তু আকাশ হতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল। ভাবছিলাম উঠে চলে যাব, কিন্তু কোথায় যাব? সামান্য একটু বৃষ্টি পড়েই তা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এই যে ছিটে ফোঁটা বৃষ্টি তা মাটিতে পড়ে একটা গরম হাওয়ার সৃষ্টি করছিল। তাতে একটু বিরক্তি বোধ হয়েছিল বটে, কিন্তু ঘুম এসে তার অবসান করল।

যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন তরুণ সূর্যের রঙীন আলো আমার মুখে পড়ে ঝিকমিক করছিল। শরীরটা বেশ ভাল বোধ করতে লাগলাম। আমি যেন লুপ্ত শক্তি ফিরে পেলাম। যে অর্শ আমাকে অনবরত রুগ্ন বলে স্মরণ করিয়ে দিত তা অনেকটা কমে গিয়েছিল। এবার সাগরতীর লক্ষ্য করে অগ্রসর হলাম।

সুখশান্তি মানুষের চিরদিন সমভাবে থাকে না! যাদের সঙ্গে এত করে মিশলাম, যাদের সুখশান্তির অনেকটা অংশীদার হলাম, তাদেরই কতকগুলি লোক আমার প্রতি অত্যাচার করবে তা মোটেই ভাবি নি। তবে মাঝে মাঝে অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছে বলে এখন আমার তাদের প্রতি কোন আক্রোশও নাই। পূর্বেই বলেছি এখন আর আমি গ্রামে থাকি না। একাকী বনেজঙ্গলে শুয়ে থাকি। বোধ হয় পাহাড় ছেড়ে আসার তৃতীয় দিন রাত্রিতে একটি পরিত্যক্ত ছোট ঘরে শোবার বন্দোবস্ত করলাম। ঘরটা চওড়ায় আট হাতের বেশী হবে না, লম্বায় হবে অন্ততঃ পঁচিশ হাত। ঘরটার মধ্যে সামনে ও পিছনে দুটি দরজা, তাতে পাল্লা নেই। এছাড়া কোন জানলা ছিল না। ঘরটা দেখে মনে হল, অনেক দিন সেখানে কোন লোকজন বাস করে নি। যাক্ ঘরটার একপাশে একটু পরিষ্কার করে তাতেই অয়েল ক্লথের উপর কম্বলটা পেতে বিছানা করলাম। আমার কাছে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা একখানা ধর্ম পুস্তক ছিল। তা খুলে পড়তে লাগ্‌লাম। চীন দেশে থেকে চীনাভাবাপন্ন হয়েও নিজের মাতৃভাষায় বই পড়তে বেশ ভাল লাগ্‌ল। বই পড়ার পর চীনের একটা মানচিত্র দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নি। কতকগুলি লোক চীনের জাতীয় গান গাইতে গাইতে আমার ঘরের কাছ দিয়েই চলেছিল। চীনের জাতীয় সঙ্গীত এতই বীরত্বব্যঞ্জক এবং প্রাণমাতানো যে তা আশাহীনের বুকেও আশা জাগিয়ে তোলে, দুর্বলের দেহেও শক্তির সঞ্চার করে। সেই গান আমি শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটি যুবক, সৈনিক বোধ হয়, মলমূত্র ত্যাগ করবার জন্য এই পরিত্যক্ত গৃহে এসেছিল। কিন্তু আমাকে দেখেই সে বাইরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে "জাপ্পুন কুই" ভেবে আমার শান্ত মুখের দক্ষিণ গণ্ডে একটি চপেটাঘাত

করল। আঘাতটির সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় আমার গালের উপর তার পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ বসে গিয়েছিল। চীন দেশে অনেক দিন ঘুরেছি, অনেক কাঁচা মাংসও খেয়েছি, পেঁয়াজের কথা তো না বললেও চলে। কাজেই আমার "সর্বজীবে দয়া"র ভাব অনেকটা দূর হয়ে গিয়েছিল।✓ অতঃপর অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে যুবক সৈনিকের চিবুকে বিরাশী সিক্কা ওজনের একটি ঘুষি মেরেই একলাফে তার বুকে এমন একটি পদাঘাত করলাম যে তার পল্টনী বুটের লাথির ওজনও তার চেয়ে হাল্কা। সৈনিকটির কাছে বন্দুক ছিল। উঠে গিয়ে সে যেইমাত্র বন্দুক ধরল অমনি তাকে গুলি করার সময় না দিয়ে আবার তার ডান হাতটা ধরে এরূপভাবে মুচড়িয়ে দিলাম যে তার হাত হতে বন্দুক আপনি পড়ে গেল। সময় ক্ষেপণ না করে তার কোমর হতে কার্তুজ-ভর্তি পেটিটা কেড়ে নিলাম।✓ লাঞ্ছিত যুবক মার্কিনী কায়দায় দুটি হাত তুলে ঘর হতে বিদায় নিল। কিন্তু আমার ভাববার সময় নেই। এখনই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সে নিশ্চয়ই তার পল্টনে সংবাদ দেবে এবং আমার নিজেকে রক্ষা করবার আর উপায় থাকবে না। তাড়াতাড়ি সাইকেলটা একটা দরজায় রেখে দিলাম। তাতে লেখা ছিল হিন্দু পর্যটক। অন্য দিকে আমার রঙ্গীন খদ্দরের চাদরটা হতে এক টুকরা ছিঁড়ে তাকেই পতাকা করে রাখলাম, আর বাকিটুকু দিয়ে পাগড়ী বেঁধে ফেললাম। বন্দুকটা পরীক্ষা করে দেখলাম তাতে তিনটা গুলি আছে, আর পেটি হতে তাড়াতাড়ি খুঁজে মাত্র ছয়টি গুলি পেলাম। সর্বসুদ্ধ আমার নয়টি গুলি হল। অন্ততঃ নয়টি লোকের জীবন-মরণের কারণ হয়ে আমি মরতে পারব, তার চেয়ে বড় আনন্দ আর কি ?

যাদের জাতীয় সঙ্গীত শুনে ঘুম হতে উঠেছিলাম, তাদেরই একজনের হাতের চপেটাঘাত এখনও আমার দক্ষিণ গণ্ডের অনেকটা লাল করে

রেখেছে। তার পর ঐ আসে সেই পল্টন, যে পল্টন হয়তো জাপানী সৈন্যের রক্তে স্নান করবে। কিন্তু আমার মত নিরুপায় অস্ত্রহীন লোক আজ তাদের লক্ষ্য হয়ে পড়েছে। আমি একা, আর তাদের সংখ্যা এখনও আমি জানি না। পদশব্দে বুঝা গেল ওরা সংখ্যায় কম নয়। যাদের উন্নতির জন্য সদাসর্বদা চিন্তা করতাম, আজ তারাই আমার জীবননাশের জন্য এগিয়ে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি ঘরের একটা কোণে গিয়ে ডান হাতে বন্দুকটা বাগিয়ে দুটো দরজার প্রতি তাক করে দাঁড়ালাম। যদি ওরা প্রথমেই গুলি ছুড়তে থাকে তবে যে-ই প্রথম আমাকে মুখ দেখাবে তাকেই তৎক্ষণাৎ শমনসদনে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কতকগুলি লোক গুলি না না করেই ঘরে প্রবেশ করল। তার মধ্যে একজনকে বড়দরের কর্মচারী বলে মনে হল। এক দিকে "হিন্দু" শব্দটা, অন্য দিকে গৈরিক বস্ত্র দেখেই তারা এতক্ষণ আমার প্রতি গুলি ছোঁড়ে নি। এই গৈরিক বস্ত্রের আদর এবং সম্মান যদিও চীন দেশ হতে দিনদিনই চলে যাচ্ছে, তথাপি এখনও একেবারে লোপ পেয়েছে এ কথা অন্তত আমি বলতে পারি না। চীনের ধর্মধ্বজীদের হাতে ক্ষমতা গেলে গৈরিক বস্ত্রের রাজত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে, আর যদি কমিউনিস্টরা কোন দিন প্রাধান্য লাভ করে তবে গৈরিকবস্ত্র যে চীন থেকে চিরতবে বিদায় নেবে এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

" কাপ্তেন আমাকে আত্মসমর্পণ করতে বললেন। আমি তাঁকেই সর্বপ্রথমে বললাম, আমি এদেশে লড়াই করতে আসি নি, অনেক আপদ গিয়েছে কিন্তু কখন হাত ওঠাই নি। আজ দায়ে পড়েই হাত উঠিয়েছি! যদি আমাকে প্রাণে মারা কিংবা অঙ্গহীন করা হয় তবে সে জন্য তিনি দায়ী হবেন। কাপ্তেন তাতে রাজী হলেন। সরল বিশ্বাসে

আমার জীবন মরণের ভার কাপ্তেনের হাতে ছেড়ে দিয়ে বন্দুক ও গুলীর পেটী অর্পণ করলাম। কিন্তু বোধ হয় মরাই আমার ভাল ছিল। কারণ সেদিন যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রহৃত এবং অপমানিত হলাম এ জীবনে সেরূপ আর কোনদিন হই নি। এরূপভাবে এ জীবনে পুনরায় অত্যাচারিত হবার পূর্বে হয় শত্রুর হাতে, নয় নিজের হাতে, যেন মৃত্যু হয়! আমাকে সৈনিকরা পঙ্গপালের মত ঘিরে ভীষণ ভাবে মারতে লাগল। কিছুক্ষণ প্রত্যাঘাত করেছিলাম, কিন্তু ক্রমাগত যখন চারিদিক থেকে কিল, ঘুষি লাথি চলতে লাগল তখন বেশীক্ষণ সজ্ঞানে থাকতে হয় নি। অজ্ঞান হয়ে থাকা বোধ হয় ভালই! কারণ তাতে অপমানের গ্লানি ভুলে থাকা সহজ হয়।

যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখলাম সাদা ধবধবে কোমল এক শয্যার উপরে আমি শায়িত, শিয়রে বসে একটি যুবক আমাকে অবিরাম গরম জলের সেঁক দিচ্ছে। তার মুখের দিকে তাকিয়েই আবার চোখ বুজতে ইচ্ছা হ'ল। তা বুজেও গেল, আবার আমি চেতনাহীন, তারপর আবার হুঁস হ'ল। তখন শরীরে যেন কিছুটা শক্তি ফিরে এসেছে, কিন্তু মুখ হতে একটু পর-পরই কালো কালো রক্তের চাপগুলি কাশির সঙ্গে বেরিয়ে আসছিল। ভাবছিলাম জীবনের বোধ হয় শেষ হয়ে এল। মরবার পূর্বে একখানা চিঠি লিখব। কিন্তু কি লিখব, কাকে লিখব? বেশীক্ষণ আর চিন্তা করতে হল না। আবার চেতনা লোপ পেলো। এই বার নিয়ে চীনদেশে আমার তিনবার সংজ্ঞা লুপ্ত হয়েছিল। তারপর আবার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী আমার চারিদিকে ঘিরে ছিল। এবার কথা বলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ডাক্তার (ছিংছাং) কথা বলতে মানা করলেন।

আমি কথা বললাম না। আমার মুখে কতকগুলি ভাতের মাড়

একটা চামচের সাহায্যে ঢেলে দেওয়া হল। একটু নয়, পর পর অনেকখানি। তারপর কতকটা চীনে সাদা চা। খাওয়ার ধরণ দেখে অনেকের মুখে হাসি ফুটে এল। কবিরাজ (ছিংছাং) হাত নেড়ে বলছিলেন, 'আমার রোগী কখনও মরে না তা সে যেমনই হোক।' তারপর একে একে ঘর হতে সবাই বিদায় নিলেন, একটি মাত্র যুবক আমার কাছে বসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে আর মাথার চুল-গুলিতে আঙ্গুল চালাতে লাগল। যখনই কথার জবাব দিতে উদ্যত হচ্ছিলাম, তখনই তার নিজের মুখে আঙ্গুল রেখে সঙ্কেত জানাচ্ছিল—"কথা বলবে না।" কিন্তু যুবকের শ্রদ্ধা ও অকপট সেবা পলে পলে আমাকে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যের পথে এগিয়ে দিচ্ছিল। আমার বুকের উপর একটা পুল্টিশ বাঁধা ছিল, ওটা বুকের চামড়াতে আঠার মত সেঁটে গিয়ে বেশ চুল্‌কাচ্ছিল। যুবককে তা ইঙ্গিতে সরিয়ে নিতে বললাম। কিন্তু সে হাতের ইসারায় জানিয়ে দিল—না না, তা হবে না, ছিংছাং-এর আদেশ। বাধ্য হয়ে আমাকে সে যাতনা বরদাস্ত করতে হল। বেশীদিন সে অস্বস্তি পোয়াতে হয় নাই। কয়েক দিনের মধ্যেই পুল্টিশটা ফেলে দেওয়া হল। শরীরও অনেকটা সুস্থ সবল হল।

সেদিন মনে হ'ল, সাংহাইয়ের চাপাই অঞ্চল জাপানীরা নিশ্চিত দখল করেছে, নতুবা গ্রামের লোক আমার দৃষ্টি থেকে এমন করে মুখ লুকিয়ে রাখবে কেন? কথাবার্তা, আনন্দ করা বন্ধ করবে কেন? তবু কিন্তু আশ্চর্য বলতে হবে এই চীনাদের জন্মগত সংস্কার, তারা এত বিপদেও নিত্যকার কর্তব্য ভুলে নাই। আমার প্রতি তাদের বেশ সতর্ক নজরই ছিল। একটি যুবতী সেদিন ম্লানমুখে এসে আমাকে খাবার দিয়ে গেল। একটি কথাও সে বলল না, বলবার ক্ষমতা হয়তো তার ছিলও না। তবে লক্ষ্য করেছিলাম, তার যেন কোনও নিকট

আত্মীয়দের বিয়োগ হয়েছে, নতুবা বার বার চোখে জল আসছে আর মুছে ফেলছে কেন? যদি সে অবস্থা আমাদের অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে হত তবে কি দুর্দশাই না প্রত্যক্ষ করতে হত! বিকালে কতকগুলি লোক এসেছিল, তাদের মুখ গম্ভীর কালোপানা। বিপদ যাদের মাথার উপর, মৃত্যু যাদের দ্বারে হাজির, তাদের মুখ থম্‌থমে গম্ভীর হবে না তো হবে কার? কিন্তু বিদেশীর প্রতি, অসহায়ের প্রতি কর্তব্য, বিশেষ যে বিদেশী বিনা কারণেই দেশের লোকের হাতে অপমানিত, প্রহৃত, তার প্রতি কি এদের কোন কর্তব্য নেই? তার কি কোন কর্তব্যই নেই? তার কি কিছু সাহায্য করবার দরকার নেই—অন্ততঃ দেশের জাতির সম্মান বজায় রাখবার জন্যও? চীনের লোকের সে ধারণা বেশ আছে। যদিও বিদেশীরা চীনাদের সাহায্যে চীনদেশ ভ্রমণ করে চীনের বদ্‌নাম প্রচারেই পঞ্চমুখ হয় তবু চীনাদের সহজাত অতিথি-সৎকার প্রবৃত্তিতে কোন রকমেই সঙ্কীর্ণতার ছোঁয়া লাগে না। আমার এই উপায়হীন অবস্থায় যখনই একজন চীনা এসে আমার প্রতি করুণ দৃষ্টি মেলে ধরেছে তখনই তাদের অন্তহীন কর্তব্যনিষ্ঠা আমার অন্তরের দুঃখজ্বালা, শরীরের ব্যথা বেদনা সবই ভুলিয়ে দিয়েছে। মুহূর্তে স্বর্গ যেন নেমে এসেছে ধরায়। আমি সব ভুলে গিয়ে ভাবতাম—এই চীনাদের সম্বন্ধে কত বদ্‌নামই না শুনেছি, কত অপধারণাই না পোষণ করেছি, কত ঝালই না পরের মুখে খেয়েছি, অথচ এই চীনারাই এখন আমাকে নিতান্ত আপন জনের মত চিকিৎসা করছে, সেবা করছে। তাছাড়াও এই বিদেশীর প্রতি তাদের প্রাণের তারে যে করুণা-স্পন্দন জেগে উঠেছে, তার তরঙ্গ তার প্রেরণা আমার প্রাণেও কি থেকে থেকে পুলক-শিহরণে বেজে উঠছে না? বুঝেছিলাম বলেই আজ প্রাণ খুলে প্রাণের কথা বলছি যদি তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকত তবে চীনাদের সকল শুশ্রূষা আজ পণ্ড

হয়ে যেত, আমারই মুখ হতে অন্য কথা বের হয়ে আসত।

শরীর ভাল হয়ে গিয়েছে। দেহে এসেছে নূতন বল, প্রাণের কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি তবুও ছিংছাং আদেশ দিলেন—দ্বিচক্রযানে অন্ততঃপক্ষে আরও দুমাস চলা হবে না, যদি চলি তবে বেঁচে উঠতে পারব কি না সন্দেহ। কবিরাজের কথা মাথায় নিয়ে চীন সাগরে না গিয়ে আবার চললাম ইয়াংসী নদীতে তরী ভাসিয়ে আপনাকে হারিয়ে, সব যেন বিলিয়ে দিয়ে।

দিন ঠিক হ'ল, নৌকা ভাড়া করা হ'ল, গ্রামের লোক একদিন এক সূর্যালোকিত প্রভাতে আমাকে বিদায় দিতে এল। সকলের অগ্রে এলেন বৃদ্ধ কবিরাজ আর শুশ্রূষাকারী যুবকটি। যুবকবন্ধু আমার সঙ্গে সাংহাই যাবে আমারই তত্ত্বাবধান করতে। তবু কিন্তু সে জানে না আমার ভাষা, বোঝে না আমার একটা কথাও—তাতে কি এসে যায় বন্ধুটির কাছে, সে-ই নিয়ে যাবে আমাকে সাংহাই, তাকে নিরস্ত করে কার সাধ্য! বিদায় নেওয়া আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, আমি বিদায়ের অগ্রদূত। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী সবাই সজল নয়নে নৌকার কাছে এসে নজর বুলাচ্ছে আমার উপর, তাদের বাষ্পাকুল ভঙ্গিটি যেন বলছে, ক্ষমা কর আমাদের দেশের সেই পাগলা সৈনিকদের, তাদের হয়ে আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

বিদায় বেলায় কবিরাজ বললেন, 'কিন্তু কারও কাছে ব'লো না এই কষ্টের কাহিনী, চীনের শত্রু আজ চারিদিকে তো আছেই, আপন ঘরের ভিতরেও রয়েছে প্রচুর। এই সুযোগে যদি আবার কেউ আমাদের সভ্য করতে আসে তবে দায়ী হবে তুমি। ভুলতে পারবে কি?' হাতযোড় করে ভগবানের নাম নিয়ে আত্মমর্যাদাকে মাত্র সাক্ষী রেখে বলেছিলাম—"একথা কোন বিদেশীর কাছে বলব না, বলব গিয়ে দেশের লোকের

কাছে যাতে তোমাদের দয়া, তোমাদের ভালবাসার মর্ম তারা চিনতে শিখে। আর বলব গিয়ে ভারতের ঘরে ঘরে চীনের লোকের অন্তরের বাণী, তারা সত্যই ভারতের স্বর্ণযুগের নর-না ীর দোসর, যদিও দেহের রং এবং খাদ্যে তাদের হয়ে পড়েছে অনেক প্রভেদ।

নৌকা ছেড়ে দিল। আমরা দুটি জীব নৌকায় বসে, দুজনাই দুজনার কাছে ভাষাহীন, তবে কি কথা বলব বলুন তো ? কিন্তু জিহ্বা আমাদের মূক হলেও প্রাণ তো শুষ্ক নয়! বিশ্বাস আর শ্রদ্ধায় যাদের অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ, তাদের কাছে ভাষা শুধু নিরর্থক নয়, মিলনের অন্তরায়ও বটে। আমাদের বিকাল বেলা কাটল বেশ তারপর এল সন্ধ্যা, সমভাবেই চলব আমাদের নীরব আকূতির আদানপ্রদান। মুক্ত নদীর জলে গাঢ় অমানিশার আঁধার ঘনিয়ে এসে ছিল। চীনদেশ যে পঁয়তাল্লিশ ৮০ কোটী লোকের বাস তা যেন ভুলতে বসেছিলাম। কতক্ষণ পরে একটা বাতি দেখা গেল। ঐ বাতি বৃটিশ জাহাজের। এখানে একটা ছোট স্টেশনও ছিল। জাহাজ তীরে লাগল না, আমাদের উঠতে হল সিঁড়ি বেয়ে। বুকে বড় আঘাত লাগল ঐ সিঁড়িগুলি বেয়ে উঠতে। আমার সঙ্গী যুবক জাহাজে আমার সাইকেল এবং পিঠের ঝোলাটা উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে আগে কেরাণীর সঙ্গে কথা বলল। কেরাণী আমাদের কামরা দেখিয়ে দিলেন। আমার শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছিল, কিন্তু চীনা যুবকের পরিচর্যায় অল্প সময়ের ভিতরেই শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। রাত্রি কাটল, দিন এল। নদীর এপার ওপার দেখা গেল কিন্তু নদীতে নৌকা নেই, নদীতীরে ফেলে পালিয়েছে। জাপানী গানবোটগুলি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে—নোঙ্গর করে আছে। ঐ গানবোটগুলিকে দেখে যত চীনা যাত্রীর মুখে বিদ্বেষের ছাপ ফুটে উঠেছিল—ওরা বিষনজর ঢেলে দিচ্ছিল, ওগুলিকে ভস্ম করে ফেলতে চায়। বাইরে চুপচাপ বসে থাকা আর

আমার ভাল লাগল না। নির্বাক সঙ্গীর সঙ্গে আকার-ইঙ্গিতে কথা হতে লাগল। এরই মাঝে কতকগুলি "কোড" করে নিলাম, কাজ চলে গেল বেশ। হিন্দুর সঙ্গী নির্বাক চীনা তরুণ, পরিচয় শুধু আত্মিক, হৃদয়ে হৃদয়ে।

এর পরও আমি দীর্ঘদিন চীনদেশে ছিলাম। ক্রমে ক্রমে সাংহাই পিকিন প্রভৃতি ঘুরে কোরিয়ায় যাই।

মহাচীন হতে বিদায়—চিরবিদায় কিনা বলতে পারি না, তবে চীনের লোকের সাহায্য প্রচুর পেয়েছি, অত্যাচারিত হয়েছি, চীনকে ভালও বেসেছি,—বুঝতে পেরেছি—পৃথিবীতে যদি কেউ ভারতের মিত্র থাকে, তবে সে এই চীন। চীন চিরদিনই ভারতের মিত্র থাকবে।

কোরিয়া

নদী, নালা, পাহাড়, পর্বত এইসব নিয়েই এক একটা দেশ হয়; কিন্তু কোরিয়াতে গিয়ে এসবের দিকে তাকাইনি। লোকসংখ্যা কত, তাও জানবার ফুরসৎ হয়নি। পর্যটকদের গাইড বইখানাও হারিয়ে ফেলেছিলাম। অতএব ওসব সংবাদ জানতে হলে ভূগোলের শরণাপন্ন হওয়াই ভাল। তবে এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে, কোরিয়ার উত্তরে রুশিয়া। আমাদের দেশের উত্তরেও রুশিয়ার একটা অংশ পড়েছে বটে গিলগিটের কাছে, কিন্তু কোরিয়ার উত্তরের রুশিয়া সেরকম নয়। এই পথে সহজে রুশিয়ায় যাওয়া যায় এবং সেজন্য জাপানীরা তত পরোয়া করে না। 'যাও, দেখে এস সোভিয়েট রুশ কিন্তু কথা ব'লো না,' এই হ'ল জাপানীদের মত।

সিংগেরী নদীর পুলটা পার হ'তেই বাধা পেলাম কাষ্টম অফিসারের কাছে। তিনি আর কিছু দেখতে চাইলেন না, শুধু সিগারেটের কৌটা দেখেই সন্তুষ্ট হলেন! দুটো সিগারেট ছিল, তা ফেলে দিয়ে তাঁর কেস থেকে অন্য দুটো বের ক'রে দিলেন। তিনি বেশ আমেরিকান ইংলিশ বলতে পারতেন, সেজন্যই কথা বলতে কষ্ট হয়নি। সিগারেট দুটি কেন বদলালেন জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, "যে-দুটো সিগারেট ফেলে দিয়েছি তা জাপানের তৈরী; কিন্তু আপনার জানা উচিত মান্‌চুরিয়ার লোক বিদেশী সিগারেট, বিশেষ ক'রে ইউরোপিয়ান সস্তা সিগারেট খেতে অভ্যস্ত, তাই আমরাও সেখানে সস্তা সিগারেট পাঠাই। তা ব'লে আপনাকে কোরিয়াতে এইসব সস্তা সিগারেট খাইয়ে আপনার কাশি হ'তে দেব না। কোরিয়া জাপানেরই অঙ্গ। এখানে বাজে জিনিস ব্যবহার ক'রে রোগ টেনে আনবার কারও অধিকার নেই। যদি কোরিয়ানরা অসুস্থ হয় তবে

জাপানকেও সেজন্য ভুগতে হবে।” কথাটা শুনে অনেক কথাই মনে এল। যেখানে শাসিতের প্রতি শাসকের এরূপ মনোভাব সেখানে লোকেরা নিশ্চয়ই সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। কিন্তু তখনই মনে হ'ল জাপান কোরিয়াকে জয় তো করেছেই এখন চায় একদম গ্রাস করতে। যাকে গ্রাস করা হবে যদি তাতে বিষ থাকে তবে নিজেকেও যে মরতে হয়।

চিন্তাধারা বদলে গেল। চেয়ে দেখলাম সামনের পথের আশপাশে উলুখড় গজিয়ে উঠেছে। পূর্ববঙ্গে এই জাতীয় খড় দিয়ে অনেকের ঘর ছাওয়া হয়। দেখে মনে হ'ল বুঝি পূর্ববঙ্গেরই কোনও গ্রামের মাঝ দিয়ে চলেছি। মনে মনে ভাবতে লাগলাম আজ কোনও গ্রামে গিয়ে এসব খুঁটিনাটি বিষয় না দেখে কোথাও গিয়ে রাত্রিটা কাটাব মাত্র।

এদিকে যে পথ হারিয়েছি সে খেয়াল আমার ছিল না। ক্রমাগত চলেছি, দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে, অথচ পথের পাশে একটাও নেই। অবশেষে দুপুরবেলা কাছেই একটি গ্রাম পেলাম। সেখানে পুলিস স্টেশন থেকে লোক এসে আমাকে “অভ্যর্থনা” করল। আমি সোজা কথায় বললাম, “আমি ভারতের তরফ থেকে শক্তি দেখাতে আসিনি, আমি দেখতে এসেছি মানুষ মানুষের উপর কত রকমে অত্যাচার ক'রে সুখী হয়।” একজন সেপাই বললে, “বলুন তো এখানে যতগুলি পুলিশ আছে তাদের মাঝে কোন্‌টি জাপানী, আর কোন্‌টি কোরিয়ান?” একজন লোক চেয়ারে বসেছিলেন দেখে মনে হ'ল জাপানীই হবেন, নতুবা গম্ভীর হয়ে চেয়ারে বসে আছেন কেন? তাঁকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লাম, “ইনিই জাপানী, আর সবাই কোরিয়ান।” সবাই হেসে উঠল। আমি যাকে জাপানী ব'লে দেখিয়েছিলাম তাকে দেখিয়ে বললে, “ইনিই কোরিয়ান, আর এই বাকী দুজন জাপানী।” দেখে কিন্তু মনে হ'ল না যে এদের মধ্যে আকৃতিপ্রকৃতিতে বেশী প্রভেদ আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, “এদের

মাইনে কত ক'রে ?" বললে, "দুজন জাপানী পায় পঁয়তাল্লিশ ইয়েন ক'রে, তিনজন কোরিয়ান পায় চল্লিশ ইয়েন ক'রে।" জিজ্ঞাসা করলাম, "এই প্রভেদের কারণ কি ?" জাপানী পুলিশ এসে বুট ঠুকে বললে, "আমাদের দেশ নাগাসাকি, অতএব এখানকার ঘরভাড়া কে দেবে। এই যে কোরিয়ানদের দেখছেন, এরা যখন আমাদের দেশে গিয়ে কাজ করে তখন এরাও ঘরভাড়া বাবদ কিছু নেয়। এরা যদি ঘরভাড়া না নিত তবে আমরাও নিতাম না।"

ভাববার বিষয় বটে। 'তারা যদি না নিত আমরাও নিতাম না'—এর মানে কোরিয়ান পুলিশও জাপানে সমান বেতনে চাকরি করে। পরে আরও শুনলাম, কোরিয়ান সেপাই আর জাপানী সেপাইয়ের বেতনে কোনও পার্থক্য নেই। নৌবিভাগেও একই কথা। সর্বত্র সমভাব ভালই। কিন্তু এসব ক্ষমতা যারা জাতীয় ভাব হারিয়েছে তাদেরই দেওয়া হয়ে থাকে। জাতীয়ভাবাপন্ন কোরিয়ানদের কোন সরকারী কাজে এখনও নেওয়া হয় না। পুলিশের লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার গন্তব্য শিউল, এখন বলুন তো কোন্ পথ ধরি ?" সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। একজন বললে, "আপনি চলছেন সিংগোরী নদীর মোহনায়, শিউলে নয়। তবে আজ রাতটা আরও একটু এগিয়ে গিয়ে থাকুন, কাল ঠিক পথ পাবেন।" ওরা আমাকে কিছু খাবার খেতে দিয়েছিল। এদের মনের প্রফুল্লতা দেখে মনে হ'ল না যে এরা কোনও খারাপ কাজ করতে পারে। এদের দ্বারা একটা পথের নক্সা আঁকিয়ে নিলাম। তাতে ছিল—এত মাইল গিয়ে দেখবেন একটা ছোট পথ এই পথটাকে কেটেছে, সোজা চলবেন, তারপর বাঁদিকে এই পথ থেকে একটা পথ বেরিয়েছে, তাতে যাবেন না, ইত্যাদি। এদের পথ-নির্দেশ দেখে মনে হ'ল এরা মানুষের উপকার করতে খুব উন্মুখ।

বেশী দূরে যেতে হল না। ঘণ্টা দুই চলার পর একটা পুলিশ স্টেশন পড়ল। সেখানে আমার জন্য পুলিশ অপেক্ষা করছিল। আমি পৌছতেই একজন পুলিশ বেরিয়ে এসে আমাকে স্টেশনে নিয়ে গেল। বিশুদ্ধ আমেরিকান ভাষায় বললে, "ফোনে সংবাদ পেয়েছি আপনি এদিকে আসছেন। এখন বলুন কোন্ জাতীয় হোটেলে নিয়ে যেতে হবে— চীনা, জাপানী, না কোরিয়ান। চীনা হোটেলের ভাড়া দুই ইয়েন, জাপানী এক এবং কোরিয়ান হোটেলের ভাড়া এক ইয়েন দশ সেণ্ট।" বললাম, "কোরিয়ায় এসেছি, কোরিয়ান হোটেলেই থাকতে চাই; তাতে কোরিয়ান রীতিনীতির কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।" একথা বলতে সে আমাকে একটা হোটেলে নিয়ে গেল। হোটেলটি যেন একটা বাড়ী। পুলিশ সহ যেতেই হোটেলের মালিক আমাকে তাঁদের কায়দায় মাথা নত ক'রে অভিবাদন করলেন। আমিও দস্তরমত আমাদের কায়দায় তাঁকে প্রতিনমস্কার করলাম। এর এরই পুলিশ ও কোরিয়ান হোটেলওয়ালাতে কি সব বচসা হ'তে লাগল। আধ ঘণ্টা কথা হবার পর হোটেলওয়ালা রেগে হন্‌হন্ ক'রে গিয়ে একটা বই নিয়ে এল এবং পুলিশকে দেখালো। বইটা পুলিশ ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আবার বেশ খানিকক্ষণ বচসা হবার পর হোটেলওয়ালা আমাকে তার সবচেয়ে ভাল ঘরে স্থান দিলে। ঘরে চেয়ার টেবিল কিছুই নেই, সমস্ত মেঝেটা মাদুর পাতা। ঘরের মাঝখানে তোষক, চাদর ও বালিশ ছিল, তা পেতে দিয়ে গরম জল এনে দিলে; সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়ান জুতা এনে দিলে পায়ে দেবার জন্যে। কোরিয়ান জুতায় আর চীনা জুতায় কোনও প্রভেদ নেই। আমার হাতমুখ ধোয়া হয়ে গেলে বাইরে এসে দেখি, পুলিশ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। বললে, "আমাদের বেশ বচসা হয়েছে আপনাকে নিয়ে, বিকেলে এসে তার কারণ বলবো। এখন আমাকে কাজে যেতে হবে। আমি জাপানী, কোরিয়ান

পুলিশ বেশ ভালো আমেরিকান বলতে পারে; সে-ই এসে সব বলবে।"
বলেই সে বিদায় নিলে।

বিকালে বসে বসে কোরিয়ান ভাষার বিষয় চিন্তা করছিলাম। চীনা এবং জাপানী ভাষার মত এ ভাষার লেখন দুরূহ নয়। অনেকটা গুরমুখী ধরণের; একটু চেষ্টা করলেই লিখতে পারা যায়। চীনা ভাষায় উচ্চারণ প্রায়ই Ts (পূর্ববঙ্গের "ছ"এর উচ্চারণের মত) দিয়ে শুরু হয়। কিন্তু কোরিয়ান শব্দে সেরূপ কিছু নেই, বেশ সরল।

বসে ভাবছি এমন সময় একজন কোরিয়ান পুলিশ এসে আমাকে পল্টনী কায়দায় সেলাম করলেন। আরম্ভ করলেন সকালের সেই ঝগড়ার ব্যাখ্যা। হোটেলওয়ালা এবং জাপানী সেপাইয়ের সঙ্গে বিবাদ বেধেছিল আমার জাত আর বয়স নিয়ে। হোটেলওয়ালা বলেছিল আমার বয়স সাঁইত্রিশ হ'তেই পারে না, যদি তাই হয় তবে আমার দেশ নিশ্চয়ই মালয়, ঠিক ভারতবর্ষ নয়। হোটেলওয়ালা তার প্রমাণ দেখিয়েছিল পর্যটক মিশনারীদের বই থেকে। তাতে লেখা আছে, ভারতবাসী মাত্র চল্লিশ বছর বাঁচে, এবং মরবার পূর্বে অন্তত তিনটে বিধবা রেখে যায় তার শোকে কাঁদবার জন্য। আমার বিজ্ঞপ্তিপত্রে ছিল, আমি মালয় থেকে ভ্রমণ স্থরু করেছি। তাতেই এই ঝগড়ার সূত্রপাত। জাপানী সেপাই আমার পাসপোর্ট দেখে তর্ক চালিয়েছিল যে, আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষ, এবং আমি ভারতবাসী। তাতে হোটেলওয়ালা বলেছিল হ'তে পারে আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষ, কিন্তু প্রতিপালিত হয়েছি নিশ্চয় মালয় দেশে; সেইজন্যই ভারতীয় দোষ আমাতে বর্তায়নি। জাপানী শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে না পেরে কোরিয়ান সেপাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে তার মীমাংসা করতে। তাই ভাল! যে ভাবে জাপানী সেপাইয়ের সঙ্গে কোরিয়ান হোটেলওয়ালা ঝগড়া করলো তাতে আমার মনে হয়েছিল, পুলিশ

নিশ্চয়ই কোনও অন্যায় করেছে, নতুবা মাথা নত করে সেলাম ঠুকবে কেন? যাই হোক আমি কোনও উচ্চবাচ্য না ক'রে পুলিশটিকে বললাম, "চলুন একটু বেড়িয়ে আসি।"

দুজনে মিলে একটা তরমুজের দোকানে গেলাম। গিয়েই পায়ের ব্যথায় কাতর হয়ে পড়বার ভান ক'রে বললাম, "আমি একটা কুড়ুল চাই, শীগ্‌গির আনুন।" তৎক্ষণাৎ পুলিশ একখানা কুড়ুল আনতে বললে। কুড়ুল আনা হ'লে বললাম, "একখানা দা চাই, পায়ের ব্যথা আর সহ্য করতে পারছি না।" যখন দুটি জিনিসই পেলাম তখন বললাম, "আমার ব্যথা চ'লে গেছে। সকলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বললাম, "আমার পায়ে একরকম ব্যথা হয়, দা-কুড়ুল একত্রে না দেখলে দূর হয় না। আরও বিশেষ ক'রে দূর হয় যদি একটি জাপানী পুলিশ সামনে থাকে।" লোকটি বোকার মত আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে বললাম, "ও এক রকমের তুক।"

তারপর তাকে সঙ্গে করে পুলিশ স্টেশনে গেলাম এবং জাপানী সেপাইটিকে ডেকে নিয়ে হোটেলে এলাম। হোটেলওয়ালাকে বললাম বইটা আনতে। সে বই নিয়ে এলে তার দাম কত জিজ্ঞাসা করলাম। বললে ছয় সেণ্ট। বইটা হাতে নিয়ে বললাম "কোরিয়ান সেপাইকে যা বলবো তার একবিন্দুও ভুল না ক'রে কোরিয়ান ভাষায় সে যেন অনুবাদ করে যায়।" তারপর বলতে লাগলাম, "আমি শুনেছি কোরিয়ায় কোরিয়ানরা দা-কুড়ুল সন্ধ্যার পর তাদের বাড়িতে রাখতে পারে না; কিন্তু আপনারই সামনে পুলিশ স্টেশনে ঘুরে এলাম, কেউ দা-কুড়ুল নিয়ে পুলিশ স্টেশনে জমা দিতে এল না তো! অথচ সন্ধ্যা তো হয়েছেই, এখন রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। দা-কুড়ুল প্রত্যেকের বাড়িতেই আছে; একটু আগেই তা আমি পায়ে ব্যথার ভান ক'রে জেনে এসেছি। অথচ এই

মিশনারীরা প্রচার করেছে, কোরিয়ানরা তাদের বাড়িতে দা-কুড়ুল রাখতে পারে না। ঠিক তেমনি, এই বড় বইটাতে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যা লেখা হয়েছে, তার প্রায় সবই মিথ্যা প্রচার।" কথা শুনে হোটেলওয়ালার মুখ কালো হয়ে গেল, পুলিশ দু'জন হাসতে লাগল। জাপানী সেপাইটি তৎক্ষণাৎ আমাকে একখানা পত্র লিখে দিলে; সেই পত্রের বলে কোরিয়ার যত মিশনারী স্কুল আছে তার প্রত্যেকটিতে বক্তৃতা দেবার অধিকার পেলাম। জাপানীরা আমেরিকান মিশনারীদের মোটেই পছন্দ করে না; কারণ এরাই কোরিয়ায় কোরিয়ানদের জাতীয় ভাব বজায় রাখতে সাহায্য করছে। মিশনারীরা কোনও দেশের জাতীয় ভাব বজায় রাখতে সাহায্য করে আর কোনও দেশে জাতীয় ভাব লোপ করে কার্য উদ্ধার করে।

পরদিন প্রাতে বেরিয়ে যাব ব'লে সাইকেলটা ঠিক করেছি, এমন সময় একটি কোরিয়ান যুবক এসে বললে, সে আমাকে পিংইয়াং এর পথ দেখিয়ে দেবে এবং এক দিন সে আমার সঙ্গে থাকবে। তাকে পুলিশের লোক বলেই মনে হয়েছিল কিন্তু যখন সে চলতে চলতে কমিউনিস্ট বক্তৃতা আরম্ভ করলো তখন তার সম্বন্ধে সে ধারণা বদলে গেল! সে বলতে লাগল, "আমাদের শক্তি নেই, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি কিছু নেই, তবুও উন্মত্ত বাসনার সৃষ্টি হয় মনের কোণে; আমরা মানুষ, আমাদের বাঁচবার অধিকার আছে মানুষের মত; আমাদের বাঁচতে হ'লে রুটির দরকার, জলের দরকার; দরকার যত কিছু সবই আমাদের পেতে হবে, কিন্তু বাধা দিচ্ছে জাপানী ধনিকের দল; টাকার মারফতে ধনীরা বোকাদের বিদ্রোহী ক'রে তোলে তাদের আপন ভাইদের বিরুদ্ধে। দোহাই দেয় জাতীয়তা, সম্প্রদায় এবং ধর্মের। আমাদের যদি বাঁচতে হয়, তবে এইসব দোহাইকে লোপ করতে হবে। জাপানী ধনীদের কোরিয়া হ'তে বিদায় করতে হবে, তাদের প্রতিপালিত গুণ্ডা সেপাই সমেত।"

ছেলেটির যৌবন সবে দেখা দিয়েছে। লেখাপড়া করছে মিশনারী স্কুলে। ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা জানে, বইতে পড়েছে। ছেলেটি আমেরিকান প্রবেশিকা পাশ করেছে, বেশ ইংলিশ বলতে পারে। ভাগ্য এবং ভগবান সম্বন্ধে সে অনেক কথা বললে, "সাম্রাজ্যবাদীদের আত্মরক্ষার পক্ষে এ দুটি কথা হল বড় অস্ত্র। লোকে সহজেই তাদের কথায় মেতে ওঠে।" জিজ্ঞাসা করলাম, কটা ধর্ম আছে তাদের দেশে। সে বললে, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এবং অহংব্রহ্মবাদ। অহংব্রহ্মবাদীদের সংখ্যা খুব কম। খ্রীষ্টানরা বেশ দল বাড়াচ্ছে, কিন্তু তাদেরই দৌলতে আজ আমরা লেখাপড়া শিখেছি, বুঝতে পেরেছি ব্যাপারখানা কি। সাম্রাজ্যবাদীরা চেয়েছিল খ্রীষ্টধর্মের নেশায় আমাদের মাতাল ক'রে রাখতে; কিন্তু জানে না, আমাদের উত্তরে সোভিয়েট সূর্য সদাসর্বদা আছে।

সাইকেল চালাবার সময় আমি সিগারেটও টানি না, কথাও বলি না, অতএব আমার শুনে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ ছিল না।

আমার সঙ্গে এক জন পুলিশও ছিল। সে আমার সঙ্গে না চলে একটু আগে নয় একটু পেছনে থাকত। পেছন থেকে পুলিশ এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "সঙ্গের ছেলেটা কষ্ট দিচ্ছে না তো?" আমি বললাম, "কষ্ট কিসের? আমি তো আর কথা বলছি না, ওর যা খুশী বলুক না কেন।" পুলিশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। আমাকে বললে, "এই দেখুন আমেরিকানদের কাজ; সুন্দর সিং নামে এক ব্যক্তির নাম ভাঁড়িয়ে খাচ্ছে। যীশুর নামে আর চলে না, এখন বুদ্ধদেবের দেশের একটা লোক খাড়া করেছে। বলছে, যে দেশে বুদ্ধ এসেছিলেন, সে দেশে নাকি প্রথম নম্বরের যীশুর চেলার জন্ম হয়েছিল, লোকটা হোল সাধু সুন্দর সিং। এ ছেলেটা বুঝি সাধু সুন্দর সম্বন্ধে কিছু জানতে চায়?" পথে দাঁড়িয়ে কেতলী হতে এক গ্লাস জল খেয়ে নিলাম, কথার জবাব দিলাম

না। যুবক যা বলেছে, যদি বলে দিতাম তবে তার অন্ততঃ চৌদ্দ বৎসরের জেল হয়ে যেত।

কতদূর গিয়ে একটা পাহাড় পড়ল। পাহাড়ের গায়ে সবেমাত্র গাছ গজাতে আরম্ভ করেছে। যুবককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, যখন কোরিয়া চীনের মিত্র রাজ্য ছিল, তখন কোরিয়ানরা পাহাড়ের গাছ কেটে পাহাড়কে নেড়া করেছিল। জাপানীরা আসার পর বৃক্ষের জন্ম হয়েছে এবং দেশে কিছুটা প্রাকৃতিক অভাব মিটেছে। সাইকেলে চড়বার আগে বললাম, "তবে জাপানী আসাতে অন্ততঃ একটা লাভ হয়েছে বটে।" যুবক লাফিয়ে উঠে আমাকে বললে, "জাপানী আসাতে আমাদের অনেক লাভ হয়েছে সত্য কথা, কিন্তু জাপানীরা তো কোরিয়ান নয়, একথা আপনি স্বীকার করবেনই; যে পরাধীন সে সোনার সিংহাসনে বসে থাকলেও পরের অধীন, স্বাধীন নয়" ইত্যাদি। যুবক লজ্জিত হ'য়েছে ব'লে মনে হ'ল। বললে, "তাড়াতাড়ি চলুন, বেলা হ'য়েছে অনেক। আরও তিনটে পুলিশ স্টেশন পাড়ি দিতে হবে, তবে শহর। তারপর প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনে আপনার গমনের সংবাদ যাচ্ছে, আপনাকে ওরা ডেকে নেবে, কিন্তু আমাদের গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যেতে হলে পুলিশের আদেশ নিতে হয়। কোরিয়ার যে সকল যুবক-যুবতী এখনও জাপানী হয়ে ওঠেনি তাদের জন্যই শুধু এই ব্যবস্থা। কোরিয়ানদের ডিন্যাশনা-লাইজড্ করবার এটাও একটা উপায়।" আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে নীরবে চললাম।

কোরিয়াতে একটা প্রবাদ আছে যে, জাপানী কেরাণী, কোরিয়ান মজুর এবং চীনাদের বুদ্ধি একীভূত হ'লে পৃথিবী জয় হয়। তাই দেখতে লাগলাম কোরিয়ানদের পরিশ্রমের বাহাদুরি। চাষী প্রাতে এসেছে মাঠে কোদাল নিয়ে, এখনও ফিরে যাবার নামটি নেই—এত অভিনিবেশের

সঙ্গে কাজ করছে তারা। ঘৃণা তাদের মোটেই নেই—মানুষের মলমূত্র ব্যবহার করছে সাররূপে মাঠে। তাও আবার বিনা পয়সায় পাবার যো নেই, কিনতে হয়। মাঠের পাশে রুমাল মুখে দিয়ে দেখছি। যুবক বললে, "ঐ কৃষক এই মাঠের অধিকারী নয়, জাপানী ধনীরা কলে-কৌশলে, ধর্ম আর আইন দেখিয়ে কৃষকদের পরিশ্রমের সবই গ্রাস করেছে। যদি কৃষক তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারত তবে আর ভাবনা ছিল না।

আমরা গ্রাম্য পথে চলেছি। কোরিয়াতে বড় বড় পথ আছে। গ্রামগুলি একটির পর একটি আসতে লাগল। এ যে আমাদেরই মত অনেকটা। দোচালা, চারচালা সব খড়ের ঘর। তবে লোকগুলো আমাদের মত নয়, রং আলাদা, মুখের গঠন আলাদা। তাদের দেশের বর্তমান অবস্থা অনেকটা আমাদের সঙ্গে মেলে। তবে সে মিলের স্বরূপ বোঝাবার ভাষা আমার নেই। যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, "আজ আমরা কোন্ শহরে যাব?" যুবক বললে, "সেন সেন"। সঙ্গে সঙ্গে বললে, কোরিয়ান গ্রাম, শহর, নদী, পাহাড়, পর্বত ইত্যাদির যত কোরিয়ান নাম ছিল, তা পরিবর্তন ক'রে তাদের জাপানী নাম দেওয়া হয়েছে। ইউরোপীয়েরা, বিশেষ করে বৃটিশ এবং আমেরিকানরা কোরিয়ান নামই ব্যবহার করেন কিন্তু জাপানীদের দ্বারা সম্পাদিত কোনও মানচিত্রে আর কোরিয়ান নাম নেই। জাতীয় অস্তিত্ব লোপ করবার অসৎ প্রবৃত্তির এটি হোল এক বিশেষ উদাহরণ। ইতিপূর্বে কোরিয়ান ধর্মের পরিবর্ত হয়েছে, কিন্তু ভাষার এবং নামের পরিবর্তন হয়নি। খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, কনফিউসিয়াস প্রভৃতি একাধিক ধর্মাবলম্বী এসেছে, কিন্তু মানুষের নাম, গ্রামের নাম, পাহাড়-পর্বতের নাম বদলায় নি। জাতির বৈশিষ্ট্য বেঁচে ছিল। কিন্তু জাপানীরা তা চায় না বলেই কোরিয়ান এখন আর কোরিয়া নেই, জাপানীদের হাতে পড়ে 'চোজেন' হয়ে গেছে।"

একটি গ্রামে গিয়ে বসলাম। তিনটি মাত্র পরিবার। গ্রামের চারিদিকে ফুল-ফলের বাগান, দূরে ধানের ক্ষেত। ঘাঘরা-পরা মেয়েগুলি আপন আপন কাজে ব্যস্ত। মেয়েদের পরণে যত বস্ত্র সবই শুভ্র। পুরুষদের পোশাকও চীনাদের মতই, তবে সাদা সূতোর কাপড়ে তৈরী। আমরা বসেছিলাম কামারের দোকানে। আমাদের আগমনে কামারের কাজে বাধা পড়ল। একটি বৃদ্ধ ও একটি যুবক মিলে কাজ করছিল। আমাদের কর্মকারেরা যে ভাবে কাজ করে কোরিয়ানরা সে ভাবে কাজ করে না। তারা ইলেকট্রিক এবং প্রচুর যন্ত্রপাতির সাহায্য নেয়। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক ছুরি তৈরী হচ্ছিল। বোধ হয় এসব ছুরি ভারতে বিক্রয়ার্থে যাবে। যুবক এবং বৃদ্ধ আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এল, ভাত শূকরমাংস ও সব্জি। কোরিয়ান যুবক আমার মুখ দেখেই আমাকে চিনতে পেরেছিল। 'তংওয়া এলব' তাদের সংবাদ-পত্রে আমার ছবি ছেপে দিয়েছিল। যুবক আমার নাম একখানা কাগজে লিখলে। রমানাথ একদিকে, অন্যদিকে বিশ্বাস। সঙ্গের যুবক বুঝিয়ে দিলে রমানাথ হ'ল আমার নাম আর বিশ্বাস হ'ল পদবী।

বিকালেই আমরা 'সেন-সেন' পৌছলাম! পথে বৃষ্টি হয়েছিল ব'লে কষ্ট হ'ল খুব। কারও বাড়িতে গিয়ে উঠলাম না, উঠলাম একটি ছোট কোরিয়ান হোটেলে। একটি ছোট ঘর, মেঝেতে মাদুর পাতা। হোটেলের চাকর তার উপর তোষক এবং চাদর বিছিয়ে দিলে। স্নানের ব্যবস্থাটা বাইরেই। স্নান ক'রে আসার পরই চীনা ধরণে সবুজ চা খেতে দিলে। তারপর এল খাবার। চীনা ও কোরিয়ান খাবারে বিশেষ পার্থক্য নেই। খেয়ে গিয়ে আরাম করতে বসলাম। পুলিশের লোক এল। কথা হ'ল অনেক। তার মর্ম হ'ল, যদি মিশনারীদের বিরুদ্ধে মিশনারী পরিচালিত স্কুলে বক্তৃতা দিই তবে পুলিশ তাতে আপত্তি করবে

না। বক্তৃতায় কি যে বলব তাই ভাবতে লাগলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, ভারতের যা কিছু ভাল তা-ই বলব, অন্য কিছু নয়।

'সেন-সেন' একটা ছোট সহর। সেখানে একদিন থেকে পরদিন কয়েকজন যুবকের সঙ্গে একখানা বর্ধিষ্ণু গ্রামে গেলাম। পুরুষরা মাঠে কাজ করছে। শুনলাম এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে আজ পর্যন্ত কোনও ধর্মই পৌছায়নি, তাদের ধর্ম হ'ল 'অহং ব্রহ্মোহস্মি'। যারা এই ধর্ম মেনে চলে তারা প্রায়ই ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তাদের তীর চালানোও অন্য গ্রামে দেখেছিলাম।

যুবকের দল আমাকে পেয়ে মত্ত হয়ে গেল। দিন তো কাটাতে হবে, একটা অবলম্বন চাই। নূতন কিছু পেলেই এরূপ মত্ততা আসে, আনন্দ আসে। কিন্তু আমি তাদের কি দেব? ভারতের বিরুদ্ধে যে সব প্রচার হয় তার কথা উত্থাপন করলাম। একজন বললে, "অনেক শুনেছি ভারতের বিরুদ্ধে, পড়িও, কিন্তু হাসি। যা ভাল, তাই গ্রহণ করি, বাদ-বাকি ছেড়ে দিই। যদি এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে হয় তবে আমাদের কাছে নয়, যান মিশনারীদের কাছে যারা যীশুর নামে দল পাকায়। আমরা এসবে নেই, আমরা আপনার কাছ থেকে আনন্দ চাই। আমরা আধমরা, আমাদের ভিতর চাঞ্চল্য এসেছে আপনাকে পেয়ে।" একটি লোক হিন্দী বলতে লাগল। সে ছিল সাংহাই শহরে, শিখদের চালচলন দেখাতে লাগল। পাগড়ি বাঁধল, তারপর বললে, নিকাল যাও। শিখদের সম্বন্ধে এর বেশী জ্ঞান বোধ হয় তার আর নেই। তার পর ফোটো তোলা হ'ল, খাওয়া হ'ল; এবং পরে গাছের ছায়ায় বসে কথা হ'তে লাগল। কথার শেষে আমি বললাম, "ধন্য আমরা যে মিশনারীদের অনুগ্রহে ইংরেজী শিখে আজ একে অন্যের সাথে কথা বলতে পারছি।" কিন্তু বাধা পড়ল। "কুকুর বিড়ালরাই এমন করে কৃতার্থ হয়। আজ যদি আমরা স্বাধীন হতাম তবে

ভারতের পর্যটককে এমন স্থানে এনে গোপনে কথা বলতে হ'ত না, আমরা দোভাষী এনে ভারতীয় পর্যটকের কথা শুনতাম।" আর কিছু বললাম না, কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের মেজাজ এতই গরম মনে হল যে তাতে শীতল জল সিঞ্চনে বিপরীত ফলেরই বেশী সম্ভাবনা ছিল।

বিকালে শহরের লোক যখন কাজকর্ম ক'রে বেড়াতে আরম্ভ করেছে, তখন একজন জাপানী অফিসার কতকগুলি ছেলেকে নিয়ে পথের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তাদের মধ্যে থেকে বেছে এক দিকে কোরিয়ান ছেলেদের দাঁড় করালেন, অন্য দিকে জাপানী ছেলেদের দাঁড় করালেন। ছেলেদের কারও বয়স দশের বেশী বলে মনে হল না। কোরিয়ান ও জাপানী দল থেকে দুটি সমান ওজনের ছেলে বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে লড়াই লাগানো হল। কোরিয়ান ছেলেটি জাপানী ছেলেটিকে কাবু করে মাটিতে ফেলে তার বুকের ওপর চেপে বসল। অনেকক্ষণ ধরে জাপানী ছেলেটি ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। তার পর উক্ত জাপানী অফিসার জয়ী কোরিয়ান ছেলেটিকে দুটি পেনসিল দিলেন। আবার দুটি ছেলে লড়ল। এবারও কোরিয়ান ছেলের জয়। তৃতীয়বার একটি জাপানী ছেলে জিতল। সে পেল একটি মাত্র পেন্‌সিল। এই পুরস্কার-বৈষম্যের কারণ জানতে চেয়ে জানলাম, যাতে জা ীয়ভাবহীন কোরিয়ান ছেলেরা তাড়াতাড়ি জাপানী ছেলেদের মত দেহ এবং মনে শক্তিমান হয়ে উঠতে পারে সেইজন্যই এরূপ পক্ষপাত উৎসাহদানের ব্যবস্থা। জাতীয়ভাবাপন্ন ছেলেদের জন্য সেরূপ ব্যবস্থা নেই।

পরদিন প্রাতে আবার আমার যাত্রা সুরু হল। সঙ্গে এবারে অন্য একজন যুবক। এই যুবক সবেমাত্র জেল থেকে বার হয়েছেন। যেসব কারণে জেলে গিয়েছিলেন তার প্রথম কারণটি হল তিনি জাপানীদের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করেন, দ্বিতীয় কারণ হল জাপানে জাপানীরা যাতে

ধনীদের গোলাম না হয় এবং তৃতীয় কারণ হল মুখ খুলে কথা বলার অধিকার পাওয়া। ইনি জেলে একা ছিলেন না, অনেক কোরিয়ান এবং জাপানী যুবকও ছিল! জাপানী যুবকদের মানচুরিয়াতে পাঠানো হ'য়েছে, কোরিয়ানও অনেক গেছে, কিন্তু ইনি যান নি। বুঝতে পারলাম জাপান এবং কোরিয়ান যুবকদেরও অনেকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদে সুখী নয়! এখনও আমার কাছে এই যুবকের ফোটো আছে। দেখলেই মনে হয়, জেলে তাঁকে কষ্টে কাটাতে হয়েছে, শরীর ও স্বাস্থ্য তাঁর নষ্ট; তবুও যে আমার সঙ্গে চলেছেন তার কারণ বিশাল ভারতের সংবাদ সংগ্রহে তাঁর আগ্রহ। সংবাদপত্র তাঁদের সুখী করতে পারে না, জাপানী প্রেস তাঁদের সংবাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে না ব'লেই তিনি আমার সঙ্গ নিয়েছেন। বেশীদূর একটানা তিনি যেতে পারলেন না, সামান্য দূর গিয়েই বিশ্রাম নিতে বসে পড়লেন। আজ আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। আমার গন্তব্য স্থান সিন্-এন্-হু। শুনেছি সেখানে স্কুল আছে তাই এত লম্বা পাড়ি দিতে হচ্ছে। পথে মাইল ষ্টোন্ নেই যে বলতে পারব কত মাইল এসেছি। পথও আবার উঁচু-নীচু। উত্তর কোরিয়াকে পাহাড়ে দেশ বললে দোষ হয় না। কিন্তু এই পাহাড়ে ভূমিতেই সোনা ফলেছে। যে দিকেই চেয়েছি সে দিকেই বন-উপবনে ভর্তি। এসব উপবন নূতন করা হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে যুবক উঠলেন, আমরা আবার চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝে দুই-একখানা চীনা দোকানী সওদা বিক্রী করছে। যুবক বললেন, চীনা মুদির দোকানে কোরিয়ানরা সবাই আসে, যদিও বর্তমানে এদের সঙ্গে বেশ ঝগড়া চলছে। ঝগড়া মানে যেমন আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমানের গরমিল। আমাদের দেশেরই মত স্বার্থবাদী তৃতীয়পক্ষ দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কতকগুলি অজ্ঞান কোরিয়ান যুবক এই কাণ্ড ঘটায়। ওরা

বলে, চীনা ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসা করতে পারবে না, তাদের যেতে হবে তাদের দেশে। টাইডেন, শিউল এবং হেজোতে তারা অনেক চীনা দোকান লুটপাট করেছিল, অনেক চীনাকে প্রাণেও মেরেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াতে পারেনি, শিক্ষিত যুবকেরা অচিরেই বুঝেছিল কাদের স্বার্থে তারা যন্ত্রের মত এই অপকর্মে প্ররোচিত হয়েছে। সঙ্গের যুবক দুঃখিত হয়ে বললেন, "মানুষও এক ধরণের পশু, তাদের নগ্ন পশুত্ব তাই অনেক সময় জেগে ওঠে। সে পশুভাবকে দমিত রাখবার জন্যই রাষ্ট্রের দরকার। যে রাষ্ট্র সংকীর্ণ স্বার্থ সাধনের জন্য এই পশুভাবকে প্রশ্রয় দেয় তাকে রাষ্ট্র বলা চলে না। তাকে কি যে বলা চলে সে সংজ্ঞা এখনও ঠিক হয়নি।" যে সব চীনা দোকানী পথে পড়তে লাগল তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, তাদের প্রতি অত্যাচার হয়নি বটে, কিন্তু হবার জোগাড় হয়েছিল। একটা দোকান পড়ল একেবারে পুলিশ স্টেশনের সামনেই। দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কেমন আছে, অত্যাচার হয়নি তো? সে স্পষ্ট ক'রে বললে, "এসব সরকারেরই কাজ। যদি সরকারের রক্ষা করবার ইচ্ছা না থাকে তবে সরকারের ঘরের মাঝে থাকলেও বাঁচাবার উপায় নেই।" কথাটা বলেছিল পুলিশের সামনেই। পুলিশের লোক চীনা ভাষা বোঝেনি বলেই রক্ষা। সিন-এন-স্থ শহরে আমরা রাত্রে পৌঁছই এবং একটি জাপানী হোটেলে থাকি। হোটেলের মালিক বড়ই সদাশয়। আমার কাছ থেকে অর্ধেকের কম পয়সা নিয়ে থাকতে দিলেন।

তাঁকেই সর্বপ্রথম বললাম, চীনাদের তাড়িয়ে দেওয়া বরং ভাল কিন্তু এমন ক'রে লুটপাট করানো ভালো নয়। তিনি নিয়ে এলেন একজন সংবাদপত্রের রিপোর্টারকে। ইনি 'ওসাকা মায়নিচি শম্বন' পত্রের রিপোর্টার। আমার মত ও মন্তব্য অবিকল তিনি নিজেদের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গেই লিখেছিলেন, জগতের শান্তির জন্য

চীন-জাপানের মিত্রতা অত্যাবশ্যক। এখানে জগতের শান্তির মানে জাপানের স্বার্থ চীনে ষোল আনা বজায় রাখা, আর কিছুই নয়। জাপান চীনকে গ্রাস করুক তাতে চীনারা বাধা দিতে পারবে না। জাপানের মতে তাই হল বিশ্ব শান্তি আর তাই হল চীনে জাপানে আসল মিত্রতা।

প্রাতে একটা স্কুলে বক্তৃতা করি। সেটি হল ছেলেদের স্কুল। বিকালে মেয়েদের স্কুলে যাই এবং ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে বলি। ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে তাদের কাছে যে রকম মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে তা শুনে অবাক হতে হয়। ভারতীয় মেয়েদের লজ্জা নাই; অনেকে নাকি কাপড়ও পরে না, পথে ঘাটে খালি গায়ে ঘুরে বেড়ায়। কি করে যে এই মিথ্যার প্রতিবাদ করব তা বুঝতে পারছিলাম না। যা হোক, আমার কথা শুনে অনেক যুবতীই সুখী হয়েছিলেন। তাদের ইচ্ছা ছিল আমি আর একদিন আবার তাদের কাছে ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলি। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে আমি আনাড়ি বলে তা আর বলা হয়নি।

রাত্রি চারটের সময় উঠেই সিংইয়ার নামক স্থানের দিকে চললাম। গাছের পাতাগুলি কুয়াশায় ভিজে গিয়েছিল। পথের বালিগুলি সিক্ত থাকায় পথে চলতে কষ্ট হচ্ছিল। পথে আমি একা। তবে যেভাবে পুলিশের লোক ম্যাপ এঁকে দিয়েছিলেন, তাতে আমার আর ভুল হয়নি। পথ যদিও খারাপ তথাপি মাঝে মাঝে সঙ্গী পেতে লাগলাম। বেলা বারটার সময় একজন সঙ্গী মিলল। সে বেশী দূর যাবে না বটে, তবে ইংগিতে তার বাড়ীতে যেতে বলল। পথের পাশেই তার বাড়ী। ভাবছিলাম কিছু খেতে দেবে, কিন্তু কিছুই খেতে দিলে না। শেষটা নিজেই একটি জাপানী কথা বললাম। 'কমে' মানে চাল। আমি মনে করেছিলাম 'কমে' মানে ভাত। যুবক তৎক্ষণাৎ আমাকে কতকগুলি চাল এনে দিলে। চাল চিবিয়ে খাওয়া যায় না। ইংগিতে চাল পিবে

দেবার জন্য বললাম। চালগুলি ঘরে নিয়ে গিয়ে পিষে আনল। আমি গুঁড়ো চালে চিনি এবং জল মিশিয়ে খেয়ে নিলাম। চেষ্টা করেছিলাম ভাত পাবার জন্য, কিন্তু ভাত তাদের ঘরে ছিল না। লোকটির বাড়ী থেকে চালের গুঁড়ো খেয়েই বিদায় নিতে হয়েছিল।

দিনটা বড়ই গরম মনে হচ্ছিল। আকাশ মেঘাবৃত ছিল ব'লেই এত গরম। কিছু দূরে গিয়ে ক্ষেতে মূলোর মত একরকম জিনিস দেখলাম। কাছে গিয়ে ঘ্রাণ নিলাম, বুঝলাম তা মূলো নয়। একজন জাপানী কৃষক একখানা কাগজ আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে কি লিখলে, তারপর প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিলে, "বুঝতে চেষ্টা কর।" সে বলেছিল, "হেজো পুলিশি।" অর্থাৎ হেজোতে গিয়ে পুলিশকে জিজ্ঞাসা কর এটা কি। পিংইয়াং-এর জাপানী নাম হেজো। পিংইয়াং গিয়ে পুলিশকে আর জিজ্ঞাসা করতে হয় নি। বুঝতে পারলাম এই মূলোজাতীয় শিকড়ই আমি সাণ্টাং প্রদেশে খুঁজেছিলাম। সেদিনই একটি কিনে তা গুঁড়ো ক'রে দুধের সঙ্গে খাই, এবং শরীরে বেশ শক্তি পাই। এই ঔষধের কেনা-বেচার উপর জাপানের একচেটিয়া অধিকার। কেউ যে বেশী কিনে বিদেশে চালান দিতে পারবে তার অধিকার নেই। এই মূলোজাতীয় শিকড় বিক্রী ক'রে জাপান চীন হতে প্রচুর অর্থ পায়। একে সিদ্ধ ক'রে শুকিয়ে বিদেশে চালান দেওয়া হয় বলে এর থেকে বিশেষ কোনও উপকার পাওয়া যায় না। জিনিসটা তাজা খেতে পারলেই উপকার হয়।

লাল চীন

একই মাটি, একই জাতি কিন্তু ন্যাশনালিস্ট এবং সোসিয়ালিস্ট চীনাতে কত তফাৎ! সাদা চীন আর লাল চীনে আকাশ পাতাল প্রভেদ। চালিন সোভিয়েট গিয়ে তা উপলব্ধি করেছিলাম।

চালিন হুনান প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। আমি যখন ওখানে ছিলাম তখন চীনের লোক এই গ্রামের নাম শুনে কেউ বা আনন্দিত হত আর কেউ বা ভয়ে কাঁপত।

চালিনের পথে রাত্রে একটা প্রকাণ্ড গ্রামে এসে পৌছলাম। গ্রামে আলোর বড়ই অভাব ছিল। এখানেও এসে একটি হোটেলে উঠলাম। হোটেলের পাশে একটা পতাকা ঝুলছিল। সে পতাকা কিরূপ রাত্রে তা দেখিনি, পরের দিন সকালবেলা দেখেছিলাম। সেই পতাকা ছিল লাল ঝাণ্ডা। এখান হতেই চালিন সোভিয়েটের শুরু হয়েছে। হট্টগোল নেই, সেপাই নেই, সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে অথচ ভিন্ন লোক ভিন্ন ধরণের শাসন কাজ চালাচ্ছে। নতুন শাসনপদ্ধতিটা আমার বেশ ভাল লেগেছিল। বেকার, ভিখিরী, বারবনিতা, দুর্গন্ধ, শিশুমজুর, জিনিস নিয়ে দর-কষাকষি, বেশি কথা বলা—এসব কিছুই ছিল না। সবাই লেখাপড়ায় এবং কাজে ব্যস্ত। বেশ একটা আপনা আপনি ভাব মনে

রাত্রে আমরা একটি নাইট স্কুলে গেলাম। সেখানে অন্ততপক্ষে হাজার লোক লেকচার শুনছিল। আমরাও পেছনে বসে লেকচারই শুনছিলাম। যে ভদ্রলোক লেকচার দিচ্ছিলেন তাঁর লেকচার যখন শেষ হ'ল তখন আমাকে ডেকে নিয়ে দাঁড় করানো হ'ল। আমি সবাইকে আমাদের দেশী প্রথা মতে

নমস্কার ক'রে কিছু বললাম। এত লোককে এত অল্প স্থানে নীরবে শৃঙ্খলার সঙ্গে বসতে দেখে আমার এই ধারণা হয়েছিল যে এরা প্রকৃতই কাজের লোক, এরা বাজে হৈ চৈ করে না। আমার কথা চীনা ভাষায় অনুবাদ ক'রে বলা হলে সবাই হাত তুলে একটা ইঙ্গিত করলে যাতে মনে হল হাজার হাত একই সঙ্গে যেন আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তাদের সব পদ্ধতির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না, সেখান থেকে অনেক কিছুই শিখে নিতে সক্ষম হলাম, অনেক কিছু নতুন ক'রে জানলাম। চালিনে যে বিরাট শক্তি দানা বেঁধে উঠছিল তা স্বচক্ষে দেখলাম।

পরদিন দুপুরে ঘুমিয়ে ছিলাম। ঘুম থেকে উঠে কিছু খেতে ইচ্ছা হল কিন্তু দোকানগুলিতে কেনার মত কিছুই ছিল না। ভাবলাম এই যদি সোভিয়েট চীন হয় তবে ত বড়ই মুশকিলের কথা। একজন সাথীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে কোন মিঠাই পাওয়া যায় না? সাথী বললেন—মিঠাই পাওয়া যায় তবে এখন পাবেন না, আরও এক ঘণ্টা পরে একখানা দোকানে মিঠাই বিক্রী করবে। আপনি এখানে বসুন, আমি আপনার চাহিদা লিখে দিয়ে আসি।

সাথী ফিরে আসার পর আমরা মিলিটারী স্কুলে গেলাম। কয়েকজন মাত্র ছাত্র তখন উপস্থিত ছিল। তারা আপন আপন কাজে ব্যস্ত ছিল। সাথীরা ওদের কাজে বাধা দিল এবং কথা বলতে শুরু করল। এদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হ'ল। তারপর একজন সাথী আমার দিকে চেয়ে বললেন—আমাদের দুটো ঝাণ্ডা কেন একত্রিত হ'ল তার কারণ বলছি। ডাক্তার সান্-ইয়াৎ-সেন যে পতাকা আমাদের দেশের জাতীয় পতাকারূপে গ্রহণ করেছেন তা আমরা অবজ্ঞা করি না, কিন্তু তা বলে লাল ঝাণ্ডাকেও আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। ১৯১১ সালে আমাদের দেশে জাতীয় ভাব এসেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঝাণ্ডাও নতুন ক'রে গড়ে উঠেছিল।

চীনের সনাতনীরা হলেন সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিবাদী। আমরা জাতীয়তা-বাদীদের এ-দুটো বিশেষণ উড়িয়ে দিয়েছি বটে, তবু আমরা চীনাই আছি, রুশ হয়ে যাই নি অথবা জার্মান ভাষা আমাদের মাতৃভাষায় পরিণত হয়নি। আমরা চীনা ছিলাম, এখনও চীনাই আছি, ভবিষ্যতেও চীনাই থাকব। শুধু বৈদেশিক প্রগতিশীল ভাবধারা গ্রহণ করেছি। সেজন্য যতটুকু পরিবর্তন করার দরকার ততটুকুই আমরা পরিবর্তন করেছি।

কথাটা অযৌক্তিক নয়, আমাকে তাদের কথা মেনে নিতে হয়েছিল। হারবিনে গিয়ে যখন সোভিয়েট রুশের পতাকা দেখেছিলাম তাতেও পুরাতন রুশ পতাকার ওপরই লাল ঝাণ্ডা গড়ে উঠেছে দেখতে পেয়েছি-লাম। চীনাদের পতাকা পরিবর্তনের একটা হদিস পেয়ে আনন্দই হয়েছিল। মনে মনে তাদের প্রশংসাই করেছিলাম। ন্যাশানালিজমকে ভিত্তি করেই সোসিয়ালিজম গড়ে ওঠে।

বিকালবেলাটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আমাকে কাঁপিয়ে তুলছিল। আমি এই গ্রাম হতে আজ যাব না বলে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। সাথীরা দু একবার আমাকে রওনা হতে বলেছিলেন কিন্তু আমি তাতে কান দিইনি। রাত্রে হোটেলে না খেয়ে এক কৃষকের বাড়িতে খেতে গেলাম। কৃষকের সেই পুরাতন বাড়ি, দেখলেই মনে হয় বাড়িটার উন্নতি মোটেই হয়নি। তবে একটা উন্নতি দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল। কৃষকের সঙ্গে যে সকল মজুর থাকে তাদের পাচক আছে, স্নানের ব্যবস্থা আছে, শোবার ভাল বিছানা আছে আর খাবার জন্য উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থাও মজুররাই করে, এতে কৃষকের কোনো হাত নেই। পূর্বে কৃষক ছিলেন তাউকী, অর্থাৎ ধনী। এখন কৃষক মহাশয় আর ধনী নন, তিনিও একজন মজুরই। এখন শীতের সময়। মজুররা প্রায় চলে গেছে। যারা আছে তারা কৃষকের শস্য পাহারা দিচ্ছে। তারা দেখে কৃষক

গোপনে কোন শস্য বিক্রি করে কি না, জমিতে কাজ করবার জন্য হাল চাষের যন্ত্রগুলি যে মিস্ত্রি পরিষ্কার করছে তার উপযুক্ত মজুরী দেয় কি না, যে সব কাজ কৃষকের নিজের, সে সব কাজ সে ঠিক ঠিক ভাবে করছে কি না। কাজের সময় এরা ছিল মজুর, এখন এরা সেপাই এবং মালিক।

আমাদের যাবার পরই খাবারের ব্যবস্থা হ'ল। নানারূপ খাদ্যের সমাবেশ হ'ল। অন্ততপক্ষে ছয় রকমের চাট্‌নি আমাদের জন্য চাষী মহাশয়ের স্ত্রী নিজ হাতে পাক করেছিলেন। হরিতকীর যে চাট্‌নি হয় তা আমার জানা ছিল না। হুনান প্রদেশের লোক শাকসব্‌জীই বেশির ভাগ খেতে ভালবাসে বলে মনে হ'ল। নানারূপ সব্‌জি সিদ্ধ ক'রে চীনা বাসনে সজ্জিত ক'রে রাখা ছিল। আমরা বেশ তৃপ্তি ক'রে খেলাম। সে রাত্রি চাষার বাড়ীতেই থাকতে মনস্থ করলাম। আমার হোটেলে যেতে ইচ্ছা হ'ল না। হোটেলগুলির বিছানাতে উকুন ছিল, এখানে তা মোটেই নেই। রাতটা চাষার বাড়ীতে কাটিয়ে আমরা পরের দিন চালিনে রওনা হলাম। দুপুরবেলা এক স্থানে বসে বিশ্রাম করতে এবং খেতে হয়েছিল। এদিকে যেন একটা সাজ সাজ ভাব অনুভব করলাম। কার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ? জাপানীদের? দেখে তাই মনে হ'ল। আজকাল ভারতে যেমন জাপানীদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ছবি দেখিতে পাওয়া যায় এদিকেও সেই ছবিই দেখতে পেলাম। ছবিগুলি দেখলেই জাপানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আপনি মনে জেগে ওঠে। চীনের একখানা মানচিত্র এঁকে তার ভেতরে একটা মানুষের ছবি আঁকা হয়েছে, মানুষটির একখানা হাত কাটা। কাছে কয়েকজন জাপানী দাঁড়িয়ে আছে আর হাসছে। তাদের একজনের কাছে অঙ্কিত মানুষটির একখানা হাত রয়েছে। হাত থেকে রক্ত টপ টপ ক'রে পড়ছে আর একজন মোটা জাপানী সেই রক্ত পান করছে। সেই ছিন্ন হাতখানাতে লেখা ছিল মানচুরিয়া। আমাদের বর্মাদেশ ভারত হতে পৃথক হবার পর জাপানীরা

এসে মানচুরিয়ার কতক দখল ক'রে বসেছে। কি ক'র বর্মাদেশ ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। বর্মাদেশ যখন ভ্রমণ করছিলাম তখন কতকগুলি বর্মী আমাকে বার বার বলতে চেয়েছিল বর্মা-দেশ ভারত হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে বৃটিশ ভালই করেছে। আমার তখন মনে হয়েছিল চালিনের পথের কথা। আমি এসব লোককে মানকুয়োর বিশ্বাস-ঘাতক সেপাইদের সঙ্গে তুলনা করছিলাম। কারণ মানচুরিয়ার কতক-গুলি চীনা বলত জাপানীরা মানচুরিয়াকে চীন হতে পৃথক ক'রে ভালই করেছে। আমার ধারণা সম্বন্ধে ওদের কিছুই বলি নি কারণ রাজশক্তি তাদের সহায় ছিল। যদি কিছু বলতাম তবে হয়ত আমার ভ্রমণ তখনই খতম হয়ে যেত। আমরা যদি বৃটিশকে তখনই বুঝিয়ে দিতাম যে তাদের কাজটা অন্যায় হয়েছে, তবে হয়ত জাপানীরা ব্রহ্মদেশের রক্ত আজ শোষণ করতে পারত না। বর্মাদেশ ভারত মহাদেশ হতে পৃথক করা মোটেই উচিত হয়নি, তার ফল আমরা দেখতেই পাচ্ছি। চালিনের পথে কার্টুন ছাড়া আরও অনেক রকমের ছবি দেখেছি, সেসব ছবির কথা এখন না বলাই ভাল। পর্যটক অনেক দেখতে পায় তবে সকল কথা সকল সময় ব্যক্ত করতে সক্ষম হয় না। চীনদেশের ১৯৩১ সালে যে অবস্থা ছিল ভারতের ১৯৪৩ সালের সঙ্গে সেই অবস্থার বেশ মিল রয়েছে, একটিমাত্র পার্থক্য আছে সেটি হ'ল ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট। চীনাদের জাতীয় সরকার বলে একটা কিছু ছিল।

বিকাল পাঁচটার সময় আমরা চালিনে আসি। সাথীদের আমি বললাম—এখন আমি গ্রামে যাব না, একটু বিশ্রাম করার পর যাব আপনারা গ্রামে গিয়ে আমার থাকবার বন্দোবস্ত করুন। আমার কথার ওপর আস্থা স্থাপন ক'রে সাথী দু'জন চলে গেলেন। আমি নিকটে স্রোতহীন একটি ছোট নদীর তীরে বসে পড়লাম। কতক্ষণ নদীর জলে

দিকে চেয়ে থাকবার পর আমার দৃষ্টি গেল একটি বালিকার প্রতি। বালিকা একাকী মাঠে বসে কাঁচা ঘাস শাকের মত উপড়াচ্ছিল। বালিকাটির বয়স বারো বৎসরের বেশি হবে না। আমাকে সে দেখতে পেল। সনাতন চীন রাজ্যের এই বয়সের কোন বালিকা আমাকে দেখে এরূপ নির্ভীক ভাবে কাজ করতে পারত না, আমাকে ভূত ভেবে পালিয়ে যেত, নয়ত ভয়ে ভীত হয়ে অজ্ঞান হতো। কিন্তু এই বালিকা সেরূপ নয়। মনে মনে ভাবলাম এদের সমূহ পরিবর্তন হয়েছে। আমি বেশিক্ষণ মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলাম না, হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। আমার মগজে গাঁজাখোরদের মত একটার পর একটা চিন্তা আসছিল আর নিমেষে লয় পেয়ে যাচ্ছিল। সেই চিন্তাধারার মধ্যে ছিল ব্রহ্মদেশ সমেত আমার জন্মভূমি ভারতমাতার ছবি আর তারই সঙ্গে ভেসে উঠছিল চীনের ঘটনাবলী।

এই চিন্তাধারার মাঝেই কখন যে নিদ্রা এসে আমাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছিল তা আর বলতে পারি না। হঠাৎ যেন মনে হ'ল নিকটে বসেই কেউ কথা বলছে। উঠে বসে দেখলাম একজন বৃদ্ধ লোক আমারই কাছে বসে আছেন। বৃদ্ধের দাড়ি কয়টি বড়ই সুন্দর। হাতে তাঁর চীনা হুঁকা। তিনি আমাকে দেখেও বার বার হুঁকোতে তামাক দিচ্ছিলেন এবং টানছিলেন। তাঁরই নিকটে ছিলেন আমার পরিচিত লোক দুজন। তাঁদের দেখে আমি আর বসে থাকলাম না, উঠে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধকে একটা নমস্কারও করলাম। বৃদ্ধ শান্ত এবং নির্ভীক। বৃদ্ধও উঠে দাঁড়ালেন। আমার মনেই ছিল না আমি সোভিয়েট চীনে এসেছি। সোভিয়েট চীনের লোক পূর্বের প্রথামত আর নমস্কার করে না। সকলেই করমর্দন করে। পুরুষ মেয়ে সবাই করমর্দন করে। সাথীরা বৃদ্ধের সঙ্গে করমর্দন করতে বললেন, আমিও তাই করলাম। বৃদ্ধ এতে খুশিই হলেন।

তখন সূর্য অস্ত গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। শীতের প্রাবল্য

বেশ বেড়ে গেছে। আমি কাঁপছিলাম। আমরা গ্রামে প্রবেশ ক'রে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। গ্রামে ফুটপাথ এই প্রথম দেখলাম। চীন জাপান ভারত কোথাও গ্রামে ফুটপাথ নেই কিন্তু সোভিয়েট চালিন-এ ফুটপাথ আছে। আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভালবাসি বলেই দৃশ্যটা আমার ভাল লেগেছিল।

গ্রামের লোকসংখ্যা প্রচুর কিন্তু কোথাও চেঁচামেচি নেই। সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে। এ বিষয়ে চালিন-এর সঙ্গে যে-কোন মার্কিন গ্রামের তুলনা করা যেতে পারে। ইউরোপের গ্রামেও ছেলেমেয়েদের গুণ্ডামি দেখতে পাওয়া যায়। চালিন এই হিসাবে ইউরোপকে ডিঙিয়ে গেছে। আমরা পথ চলে একটি বড় হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। হোটেলের ভেতরে নানারূপ বাতি জ্বলছিল কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না ঘরের মধ্যে এত রোশনাই রয়েছে। আমরা দুটো দরজা পার হয়ে হোটেলের বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। সেখানে নামজাদা কয়েকজন লোকও ছিলেন কিন্তু আমি ওদের নাম শুনে লাফিয়ে উঠলাম না, কারণ তখনকার দিনে অন্তত আমার কাছে এসব লোকের কোনরূপ বিশেষ পরিচয় ছিল না। আমি আরাম ক'রে একটি চেয়ারে বসে সবুজ চা পান করতে লাগলাম এবং চিনির অভাব অনুভব করতে লাগলাম। একজন লোক আমার কাছে এসে গ্রামখানা কেমন লাগল জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম গ্রামে এই সর্বপ্রথম ফুটপাথ দেখে আমার ভারি আনন্দ হয়েছে। পথে যে সকল সোভিয়েট গ্রাম দেখেছি কোথাও অভাব দেখিনি, তবে মিঠাই-এর অভাব অনুভব করেছি। দুদিন পূর্বে সামান্য মিঠাই খেতে পেরেছিলাম। ভদ্রলোক বললেন—আমরা পৃথিবীর সকল রকম মিঠাই এখানে তৈরী করব কিন্তু এখনও সেই সময় আসেনি। এখন আমাদের আত্মরক্ষা এবং আত্মপ্রসারণ করতে হবে।

চীনদেশে ছোট বড় নানারূপ হোটেল আছে। এই হোটেলটির দুটি বিশেষত্ব ছিল। প্রথম বিশেষত্ব, এই হোটেলে খাবারের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। নিকটস্থ এক বাড়িতে একটা খাবারের দোকান ছিল, তাতেই সকলকে গিয়ে খেয়ে আসতে হত। দ্বিতীয় বিশেষত্ব হ'ল, এখানে গণিকাদের গমনাগমন ছিল না। জাপান এবং কোরিয়া ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্রই হোটেলগুলিতে নানারূপ ব্যভিচার হয়ে থাকে। মনে করবেন না এখানে জাপানী প্রথা ধার ক'রে আনা হয়েছে, স্বভাবতই গণিকা চালিন গ্রামে নেই বলেই ব্যভিচারও নেই।

হোটেলের একটি টেবিলে পৃথিবীর নানা দেশের সংবাদপত্র সন্নিবেশিত ছিল। আমি বৈদেশিক ইংরেজী সংবাদপত্রগুলির মাঝ থেকে কলকাতার 'এডভান্স' কাগজখানা বের ক'রে মন দিয়ে পড়তে লাগলাম। সংবাদপত্র পাঠ হয়ে গেলে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে কি প্রকারে এই ভারতীয় সংবাদপত্রখানা স্থান পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছে? যাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বললেন সাংহাই হতে এই ভারতীয় সংবাদপত্রখানা লোক মারফৎ কিনে আনা হয়। সেই ভদ্রলোকই আমাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। সেই প্রশ্নগুলির প্রথম প্রশ্ন হ'ল—এই গ্রাম সম্বন্ধে আমার কি ধারণা হয়েছে। আমি বললাম—পূর্ব এশিয়ার যতগুলি দেশ দেখেছি কোথাও গ্রামে ফুটপাথ দেখিনি। চালিন গ্রামেই সর্বপ্রথম ফুটপাথ দেখতে পেলাম। এখানকার লোক বেশ সভ্য, অনর্থক কোন কথা বলে না বা নবাগতকে দেখবার জন্য একেবারে উতলা হয়ে যায় না। ভদ্রলোকের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, ভারতের লোক চীন সম্বন্ধে কি মত পোষণ করে। এ বিষয়টার জবাব দিতে আমার একটু চিন্তা করতে হয়েছিল কারণ তখনকার দিনে ভারতের লোক চীন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানত না। যে কয়জন পর্যটক চীনদেশ ভ্রমণ ক'রে বই লিখেছিলেন তাঁরা শুধু

চীনের সমুদ্রতীরবর্তী নগরগুলি দেখেই যা মনে এসেছে তাই লিখেছেন, চীনের লোকের সঙ্গে মেশেনও নি এবং চীনের গ্রামেও যান নি। আমার একটা ধারণা ছিল চালিনের লোক আমার কাছে কোনরূপ শঠতা অথবা মিথ্যাকথা চায় না, তাই প্রশ্নকারীকে সত্য কথাই বললাম। ভদ্রলোকও আমার কথায় রাগ করেন নি, শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, তাই নাকি ? আমি বললাম, যা বলেছি তাই। ইংরেজী দৈনিকখানা দেখুন, এতে চীনের সংবাদ মোটেই নেই। ভদ্রলোক সংবাদপত্রের দিকে মোটেই তাকালেন না। আমার কথা শুনে তাঁর মুখের রং বদলে গিয়েছিল তা আমার মত লোকের চোখেও ধরা পড়েছিল। নিজের দেশের কুসংবাদ কে শুনতে চায় ? কতক্ষণ পর আবার ভদ্রলোক আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—চালিন সোভিয়েট যাতে ক'রে বাঁচে তার জন্য আপনি কি করতে পারেন ? আমি বললাম যদি দরকার মনে করেন তবে আমাকে খাটাতে পারেন, এর বেশি আমার এখন কিছুই করবার নেই। এখান হতে বের হবার পর যদি আপনাদের পক্ষ হয়ে দেশ-বিদেশে লেকচার দিতে থাকি তবে কেউ আমার কথা শুনবে না। অনেকে হয়ত আমার যাতে পর্যটন আর না হয় তারই চেষ্টা করবে। সাইগনে ফরাসী পর্যটক মসিয়ে পারেয়ারীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, তিনি একদিন ভুলক্রমে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রশংসা করেন। এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁকে চিরতরে দেশ-পর্যটন বন্ধ করতে হয়েছে সোভিয়েটের প্রশংসা করানো সাম্রাজ্যবাদীদের সহ্য করা দূরের কথা যখন যার মুখ হতে সাম্রাজ্যবাদীরা সে প্রশংসা শোনে তাকেই পাগল কুকুরের মত আক্রমণ করে, দংশন করবার চেষ্টা করে। আমাকে কি আপনারা পাগলা কুকুরের হাতে ফেলে দিতে চান ? হয়ত আপনাদে সামনে সকল কথাতেই আমি হাঁ ক'রে যাব কিন্তু কাজে কিছুই করব না

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক আর কিছুই বললেন না।

সকালবেলা ঘর থেকে বের হবার পূর্বেই আমার সাথী দুজন এলেন এবং আমাকে গ্রাম দেখাতে নিয়ে গেলেন। গ্রামটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চীনাদের ঘরের পেছনটা সাধারণত অপরিষ্কার থাকে, এই গ্রামে তা মোটেই নেই। শূকর, হাঁস, মুরগী অন্যান্য গ্রামে থাকতে পারে, এ গ্রামে তার ব্যবস্থা নেই। গৃহপালিত জীবকে গ্রামের বাইরে রাখতে হয়। গৃহপালিত জীবের মালিক গ্রামের সকলেই। হাঁস, মুরগী, শূকর যত আছে তা একজনের দ্বারা পালিত হয় না। যারা এই কাজে দক্ষ তারাই এসব কাজ করে। এসব লোক গ্রামের লোকের দ্বারা পরিচালিত এবং প্রতিপালিত হয়।

এশিয়ার পূর্বদেশগুলিতে আবৃত ড্রেনের বড়ই অভাব। চীনদেশ সে দোষ হতে বাদ পড়েনি। ভারতের শুধু বেনারসেই আবৃত ড্রেনের বন্দোবস্ত পূর্বকাল হতেই ছিল, আর কোথাও আবৃত ড্রেন ছিল কিনা তা জানি না। পূর্বদেশগুলির ইতিহাসও সে সম্বন্ধে একেবারেই নীরব। চালিন-এ ঢাকা ড্রেনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। পূর্ব এশিয়ার এই গ্রামেই সর্বপ্রথম ঢাকা ড্রেনের বন্দোবস্ত দেখে সমাজগঠনের প্রথম স্তরের কথা মনে হল এবং আর্য সভ্যতার কাছে আপনি মাথা ঝুঁকে এল।

পথে চলার সময় আমি আবৃত ড্রেনগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখেছি দেখে সাথীরা এ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে বললেন। পথে চলার সময় কথা না বলাই অভ্যাস কিন্তু এ বিষয়ে নীরব না থেকে তাদের সঙ্গে কথা বললাম। চীনদেশ হতে যেমন প্রথম মুদ্রাযন্ত্র এবং কম্পাস বেরিয়েছিল তেমনি আর্যরাও প্রথম ড্রেন প্রথার প্রবর্তন করেছিল। ড্রেন প্রথাটা হওয়ার জন্য আর্যরা কতদূর উন্নতি করেছিল তা বলে লাভ নেই, তবে যারা বারুদ, প্রেস এবং কম্পাস আবিষ্কার করেছিল তাদের চেয়ে ঢের বেশী

এগিয়ে গিয়েছিল এটা সুনিশ্চিত। ড্রেন প্রথা সামাজিক উন্নতির একটা বিশেষ লক্ষণ। আপনাদের এখানে যিনি সোভিয়েট স্থাপন করেছেন, তিনি পণ্ডিত লোক তাতে আর কোন সংশয় নেই। আমার কথা শুনে সাথীরা খুশি হয়েছিল।

আমরা চললাম গ্রামের স্কুলের দিকে। স্কুলটি গ্রামের বাইরে অবস্থিত। স্কুলে নানা রকমের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। একদিকে যেমন ছুতোরের কাজ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, অন্য দিকে তেমনি ভৈষজ্যশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্বও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। স্কুলে গিয়ে মনে হ'ল এসব ছাত্রেরা পরীক্ষা পাস করতে আসেনি, যার যেখানে যা গলদ তাই অপসারণ করতে এসেছে। এতে শিক্ষকের বড়ই কষ্ট হয়। বিশেষ কোন ক্লাস নেই, বিভাগ আছে মাত্র। অঙ্ক আমি জানি না মোটেই, তবুও ঘুরতে ঘুরতে অঙ্কের ক্লাসেই গিয়ে হাজির হলাম। অঙ্কের শিক্ষক মহাশয় একটার পর আর একটা অঙ্ক কষে যাচ্ছেন আর ছাত্রেরা তাঁকে নানারূপ প্রশ্ন ক'রে হয়রান করছে। আমাদের দেশে শিক্ষকগণ ছাত্রদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যেমন একটা অঙ্ক কষতে দিয়ে একটু বিশ্রাম করেন, চীনা শিক্ষক সেরূপ কিছুই করেন না, তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে যান। ছাত্রেরা তখন বুঝে নেয় শিক্ষকের অবসাদ এসে গেছে। আমাদের দেশের ছাত্রেরা শিক্ষক বেরিয়ে গেলে হট্টগোল শুরু করে আর চীনা ছাত্রেরা একদম চুপ হয়ে আপন আপন গলদ কোথায় আছে খুঁজতে থাকে। পরীক্ষা পাস করা আর শিক্ষা করার এখানেই প্রভেদ।

গ্রামের লোকসংখ্যার অনুপাতে স্কুলের আয়তন আমার কাছে বড় বলেই মনে হ'ল। যেখানে মানুষ জানতে চায় সেখানে স্কুলের আয়তন বড়ই হয়। আমি স্কুলটি দেখে বেশ আনন্দ পেয়েছিলাম এবং হংকং-এ

যারা আমার বিদ্যা পরীক্ষা করতে চেয়েছিল তাদের মনে মনে জাহান্নামে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছিলাম। এই গ্রামের ছাত্রদের পোশাক অন্য ধরণের। তারা অসামরিক পোশাক পরে না। তাদের পোশাকও সেপাইদের মতই। সকল সময় এদের পল্টনী পোশাকে থাকতে হয়। চীনাদের অসামরিক পোশাক আমার কাছে মোটেই ভাল লাগত না বলে এখানকার ছাত্রদের পোশাক দেখে আমার আনন্দ হয়েছিল।

গ্রাম ঘুরে যখন হোটেলে এলাম তখন সাথীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এত বড় গ্রামে এত কম হোটেল কেন? সাথী বললেন—এখানকার হোটেলওয়ালারা মুনাফা করতে পারে না। যত হোটেল দেখছেন সব হোটেলই গ্রামের লোক দ্বারা পরিচালিত হয়। গ্রামের লোকের নানা কাজ আছে। এই গ্রামে অনেক হোটেল ছিল। সে সব হোটেল আর নেই। লোকের অভাবই তার একমাত্র কারণ। অজ্ঞতাবশত কত হোটেলে দ্বিগুণ তিনগুণ পয়সা দিয়েছি তার হিসাবও করতে পারব না অথচ এখানে হোটেলের লোক মুনাফা নিতে পারে না, তা আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য মনে হ'ল। পুঁজিবাদীরা যেভাবে হোটেল চালায় এখানের হোটেলগুলি তার চেয়ে সহস্রগুণ ভাল ভাবে পরিচালিত হয়। হোটেলের বয় বাবুর্চি না বলে এখানে হোটেল-কর্মী বললেই ভাল হয়। হোটেলকর্মীরা জাপানী বয়দের মত সর্বদাই হাসিমুখ। পরিষ্কার কাপড় তারা পরে। দাঁতগুলি তাদের ধব্‌ধবে। নখগুলি সুন্দরভাবে কাটা। জুতা ব্রুস করা। গ্রামে বারবনিতা নেই বলেই হোটেলে বারবনিতা আসে না। প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই বিয়ে করেছে। সনাতন যুগের চীনে বিয়ে করাটা এক বিপজ্জনক কাজ। প্রথম বিপদ হ'ল বিয়ের খরচ। দ্বিতীয় বিপদ হ'ল ছেলে-পিলে যখন আসতে থাকে তখন যদিও ভাতের ব্যবস্থা হয় ত কাপড়ের ব্যবস্থা হয় না। এরূপ কষ্টে কে যেতে চায়?

এখানে সে চিন্তা করতে হয় না। আসুক না ছেলেমেয়ে যত খুশি, তাদের অভ্যর্থনার জন্য সুবন্দোবস্ত ক'রে রাখা হয়েছে। এদিকে বারবনিতারা গ্রাহক না পেয়ে দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

এই ত গেল হোটেলের কথা। পরের দিন নিকটস্থ একটা গ্রামে গেলাম। গ্রামে লোক ছিল না। গ্রামের বাসিন্দাদের অন্য গ্রামে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন এই গ্রামে অস্ত্র তৈরী হয়। অসংখ্য লোক কাজ করছিল। প্রত্যেকটি লোক চটপট ক'রে দক্ষতার সঙ্গে মন দিয়ে অস্ত্র তৈরীতে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছিল। সকলের মুখেই একটা চিন্তা, এই বুঝি কারখানা আক্রান্ত হ'ল। আক্রান্ত হোক আর নাই হোক, আমার তাতে কোন সম্পর্ক ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এরা দৈনিক কত মাইনে পায়? কারখানার ম্যানেজার বললেন—এরা কখনও পেট ভরে খেতে পেত না, কাপড়ের অভাব এদের লেগেই ছিল। এদের বাসস্থান ছিল শূকরের ঘরের মত। এরা এখন খেতে পায়, ভাল কাপড় পরে, তারপর দেখবেন এদের শোবার ঘর। কতক্ষণ ফ্যাক্টরী ঘুরে দেখলাম। কোথাও এমন কিছু দেখলাম না যার কথা এখনও মনে করলে নতুন বলে মনে হয়। বাস্তবিকই আমার মনটা একদম ভবঘুরেই হয়ে গিয়েছিল। সেই ভাবটি এখনও বর্তমান রয়েছে। একস্থানে দেখলাম বারুদ তৈরী করা হচ্ছে। জিনিসটা দেখেই শরীর শিউরে উঠল। অবশ্য এটা আমার কাপুরুষতারই লক্ষণ।

ফ্যাক্টরী দেখে মজুরদের থাকবার ঘরে গেলাম। এখানে এদের থাকবার একটা নতুন ব্যবস্থা হয়েছে যা চীনের অন্যত্র বড় দেখা যায় না। প্রত্যেক মজুরকে এক একখানা ঘর দেওয়া হয়েছে। ঘরের একদিকে একখানা খাট। খাটে একখানা পাতলা তোষক এবং তার ওপর এক-খানা সাদা চাদর বিছানো রয়েছে। মাথায় দেবার জন্য তুলোর বালিশ।

চীনদেশে তুলোর বালিশ এখানেই দেখলাম, নতুবা সর্বত্রই বাঁশের অথবা কাঠের বালিশ ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক রুমেই দুটো ক'রে টেবিল আর একখানা ক'রে চেয়ার। একটা টেবিলে চায়ের পট এবং কয়েকটা ছোট কাপ। অন্য টেবিলে বই সংবাদপত্র এবং কালি-কলম থাকে। এখানে দৈনিক সংবাদপত্র ঘরের দেয়ালে হাতে লিখে দেওয়া হয়। আমি যে চালিনে এসেছি, সে সংবাদ এবং হাতে আঁকা আমার চিত্রও দেওয়ালে দেখলাম। কাগজের অভাবই তার একমাত্র কারণ ছিল।

চীনদেশের সর্বত্র দেখা যায় দোকানে দোকানে মালপত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে, এখানে সেরূপ ব্যবস্থা নেই। দোকানগুলি প্রায়ই খালি। দোকানে কি জিনিস ছিল তার কিছুটা নিদর্শন পাওয়া যায়, যেমন ক'রে আমরা খালি গুদামে ইতস্তত ছড়ানো জিনিস দেখে বুঝতে পারি এই গুদামে হয়ত এসব মালই ছিল। খালি দোকান দেখে আমরা অনেক সময় ভুল ক'রে বসি। মনে করি দোকানে জিনিস নেই। জিনিস পাওয়া যায় না বলেই অথবা ক্রেতার অভাবে দোকানে জিনিসই রাখা হয় না আসলে কিন্তু বিষয়টা তা নয়। জিনিস আসা মাত্রই লোকে আপন আপন দরকার মত জিনিস কিনে নেয়। সেজন্যই দোকানে অবিক্রীত জিনিস পড়ে থাকে না। এখানে আমার নিজের কথাই বলছি তাতেই বিষয়টা বেশ ভাল ক'রে বুঝতে পারা যাবে। আমার সিগারেটের দরকার ছিল। একজনকে বললাম সিগারেটের দোকান দেখিয়ে দিতে, লোকটি আমাকে একটি দোকানে নিয়ে গেল। দেখলাম মস্তবড় একটা তাকে নানারূপ সিগারেট সাজানো রয়েছে। আমি এক টিন সিগারেট বাট সেণ্ট দিয়ে কিনলাম। বিদেশী বলেই আমার কাছে এক সঙ্গে পঞ্চাশটি সিগারেট বিক্রি করা হয়েছিল, কিন্তু মাও-সুতন্ দৈনিক মাত্র দশটি সিগারেট এই গ্রামে এসে কিনতে সক্ষম হন। এর মানে হ'ল, সিগারেট সাধারণ জিনিস। সকলেরই দরকার

হয়, এখানে ছোটবড় ভেদাভেদ নেই। টাকা দিলেও জিনিস না পাবার কারণ হ'ল, যা উৎপাদিত হয় তা সর্বসাধারণের ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই অনেকেই সোভিয়েট এলাকায় বাইরে থেকে জিনিস ক্রয় ক'রে আনবার চেষ্টা করে। এতে কোনও নিষেধ নেই। পুঁজিবাদীরা জিনিস বিক্রয় করতে কোনরূপ কার্পণ্য করে না। এরূপ কার্পণ্য না দেখাবার একমাত্র কারণ হল তারা চায় টাকা, যেদিক থেকেই টাকা আসে আসুক এতে তাদের লাভ ছাড়া লোকসান নেই। তবে পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়া আসা এবং পথে অপমৃত্যু বরণ করা অনেকেই পছন্দ করে না।

গ্রামের সোসিয়ালিস্ট চেয়ারম্যান বুড়ো মানুষ ; তিনি আমার কাছে বসে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। লক্ষ্য ক'রে দেখেছি তিনি যেন বলতে চান, যে দেশের লোক যত বেশী অন্যায় কাজ করে সেই দেশেই ধর্মের বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায় তত বেশী। চীনদেশে ধর্মের মতবাদ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, এটাকে সাধারণ একটা বিষয়ের মতই ক'রে নিয়েছে। তবুও এই বৃদ্ধের ধর্ম নিয়ে কথা বলার একমাত্র কারণ হ'ল, তিনি জানতে চান সত্যিই কি প্রফেটিক ধর্ম এযুগে মানুষের মঙ্গল করতে সক্ষম হবে না? স্থং পরিবার ধর্ম বদলেছে, মাও-স্থতন্ ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন। মুসলমানধর্মী মা-চান্দ-স্থান অগ্রণী হয়ে মানচুরিয়াতে কমিউনিজম্ প্রচার করছিলেন। এতে ক'রে তাঁর শক্তি যেমন বৃদ্ধি হচ্ছিল লোকেও তাঁকে তেমনি শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখছিল। এই বৃদ্ধও গ্রাম থেকে বৃটিশ এবং সুইডিস মিশনারীদের তাড়িয়েছেন, চীনা লামাদের যেতে বাধ্য করেছেন। ভাগ্য দেবতা, ভূত দেবতাকে পূজা দেবার জন্য যে কাগজ, মোমবাতি এবং মদের অপব্যবহার তা বন্ধ করেছেন। এসব ছিল অপব্যয় ; এই অপব্যয় হতে জনসমাজকে বাঁচিয়েছেন। বৃদ্ধ যাচাই ক'রে জানতে চান এসব কাজ ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে। আমি অনেকটা সেদিকে

এগিয়ে গিয়েছিলাম বলেই বৃদ্ধের কাজের প্রতিবাদ না ক'রে প্রশংসাই করেছিলাম। বৃদ্ধ আমার কথা শুনে একটা কাগজে কি লিখলেন ও আমাকে তাতে দস্তখত করতে বললেন। আমি নিজ ভাষায় আমার নাম সই ক'রে দিলাম। বৃদ্ধ আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে সেই কাগজটি গ্রাম্য সোভিয়েট-গৃহে কাঠের উপর আটা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে ধর্মের গোঁড়ামিটা বেশ বেড়ে গেছে। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবস্থা কোন মতেই ধারণা করতে পারা যায় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পুরাতন আচার-পদ্ধতি পরিত্যাগ করার আদেশ এসেছে সরকারের তরফ হতেই। চীন সোভিয়েটকে আমি সরকার বলতে পারব না, কারণ এখানে সর্বসাধারণই রাজত্ব করছে। প্রলিটারিয়েট ডিক্‌টেটরগণ কায়েমী নন, অস্থায়ী। আজ যাকে ডিক্‌টেটর নিযুক্ত করা গেল, কাল যদি তিনি কাজ না চালাতে পারেন তবে পরশু আবার নূতন ক'রে ডিক্‌টেটর নির্বাচন করা হয়, তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের আইন সভার সদস্য এবং মন্ত্রীরা একবার ভোট বাগিয়ে নিয়ে কায়েম হতে পারলেই সময়াভাবের অজুহাতে ইচ্ছামত পর্দার আড়ালে থাকতে পারেন। সোভিয়েটের চেয়ারম্যান এবং সদস্যেরা সেরূপ করতে পারেন না। তাঁহারা নিজেদের করণীয় কাজ তো করেনই, উপরন্তু সোভিয়েট পরিচালনার কাজও করেন এবং তা আনন্দের সঙ্গেই করেন। এতে তাঁদের বেশ পরিশ্রম করতে হয়। আমাদের দেশে কেন, রুশদেশ ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্রই সরকারী কর্মচারীরা সরকার কর্তৃকই মনোনীত হন। সোভিয়েট দেশে তা হবার উপায় নেই। তাঁদের সর্বসাধারণের দ্বারা মনোনীত হতে হয়। সেজন্যই জনসাধারণের প্রতি তাঁদের কোন অবিচার করার অধিকার থাকে না। আর সেইজন্যই অনেকে সোভিয়েটের সভ্য হতে চান না। যারা অম্লান-

দনে অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারেন, একদিকে জনসাধারণের কাছে নকে জলের মত নরম রাখতে সক্ষম হন আর অপরদিকে প্রতিক্রিয়াশীল-দের সামনে লোহার মত শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারেন তাঁরাই কেবল এই দে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী হন। সেইজন্য ন্যাশানালিস্ট এবং সোসিয়া-লিস্টদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখতে পাওয়া যায়। আকাশ-পাতাল প্রভেদটা কোথায় তা সহজে অনুমান করা যায়। একদিকে জনমতের প্রতিধ্বনি কার্যকরী হচ্ছে অপরদিকে মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীর উচ্চাকাঙ্খা জনমতকে দলন ক'রে আপন স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজছে। সোভিয়েট চীন জনসমাজের, আর সনাতনী চীন ছুং পরিবারের। এখানে আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে, পূর্বের পুরাতনপন্থী চীন আর সোভিয়েট চীন এখন একত্রিত হয়ে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, এখন আর ছুং পরিবারকে অভিসম্পাত করলে কোন লাভ হবে না। এখন ছুং পরিবারের কর্ণধার চীনের কর্ণধার হয়েছে, কমিউনিস্টরাও তা মেনে নিয়েছে। একেই বলে কালস্য কুটিলা গতিঃ।

গ্রাম দেখার কাজ অনেকটা সমাপ্ত হয়েছিল। এবার আমার গ্রাম ছেড়ে হেনচো-ফোর দিকে যাবার ইচ্ছা যদিও প্রবল হ'ল তবুও আমি আরও কিছু দেখবার জন্য কিয়াংসির দিকে এগিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করলাম আমার সঙ্গে যাবার জন্য সাথীরাও প্রস্তুত হ'ল। কিন্তু কথা হ'ল ওদিকে তখন বড়ই মারামারি কাটাকাটি চলছিল। কে কোন্ মতাবলম্বী, কে কাকে হত্যা করতে চায়, কোন্ সরকারের প্রাধান্য রয়েছে সাথীদের তা জানা ছিল না বলেই আমার ধারণা হয়েছিল, কিন্তু সাথীরা সবই জানত আমরা গ্রামে আরও দুদিন বিশ্রাম করলাম এবং তৃতীয় দিন গ্রাম হতে রওনা হয়ে কিয়াংসি প্রদেশের দিকে চলতে লাগলাম। পথ উঁচু নীচু এবং নানারূপ দুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ। আমার একটা ভরসা ছিল যে আমা

উপর কেউ অত্যাচার করবে না, কিন্তু সাথী দু'জন আমার মত লোক নয়, তারা কর্মী। তাদের বিপদ আপদ লেগেই আছে। সোভিয়েট এলাকায় আমাদের ভয়ের কোন কারণ ছিল না, তাই আমরা বিনা দ্বিধায় পথ চলতে লাগলাম।

চালিন-এর পূর্বদিকের গ্রামগুলিতেও সোভিয়েট স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু তখনও এদিকে রীতিমত কাজ চলছিল না। লোকের অভাব বেশ অনুভূত হয়েছিল। যারা যুদ্ধের অজুহাতে দু'পয়সা ক'রে নেবার সুযোগ খুঁজছিল তাদেরও এদিকে আসা যাওয়া ছিল। উত্তরদিক হতে পুরাতন মতবাদী চীনাদের অধীনে যে সকল "ইরেগুলার" সেপাই ছিল, তাদেরও উৎপাত ছিল। প্রকৃতপক্ষে দেশে শান্তি ছিল না বললে কোন দোষ হয় না। চীনারা এরূপ অশান্তিতে অনেকদিন থেকে অভ্যস্ত ছিল বলেই নূতন অশান্তিকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করছিল। কিন্তু অশান্তি জিনিসটা বড়ই কষ্টের, সেইটিই বার বার আমার দৃষ্টিতে এসে পড়ছিল। এখানে তার একটি নমুনা দিচ্ছি।

আমরা একটা রেঁস্তোরাতে গিয়ে বসে খেতে লাগলাম। সাথীরা নিজেদের পরিচয় দিলেন এবং আমাকেও রেঁস্তোরার মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রেঁস্তোরার মালিকের অশান্তিপূর্ণ চাহনি বার বারই আমার সাথীদের উপর পড়ছিল। সুখের বিষয় আমরা খাবার এবং থাকার বেশ সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের পরে যে একদল লোক এসেছিল তাদের প্রতি রেঁস্তোরার মালিকের খরদৃষ্টি দেখেই মনে করেছিলাম যে এদের প্রতি লোকটি ভাল ব্যবহার মোটেই করবে না। সে দু'খানা হাত পেছনের দিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নত ক'রে বলছিল— ব্যবসা করাটা আমার পেশা, কিন্তু ব্যবসা করার মত মাল না পেলে কি ক'রে ব্যবসা করি? আমাদের এখানে মুনাফা করা হয় না, এই সুযোগ

নিয়ে যদি অন্যস্থানের লোক এসে বাড়াবাড়ি করে তবে আইনের সাহায্য নিতেই হবে। বেশী আর কথা হল না। যারা খেতে এসেছিল, তারা গোপনে পকেট হতে অস্ত্র বের করল এবং রেঁস্তোরাওয়ালাকে আক্রমণ করবে বলে ভয় দেখাল। সাথীরা আমাকে নিয়ে বাইরে দাঁড়াল। হঠাৎ ঘরের ভেতর হ'তে কয়েকজন সেপাই বের হয়ে এসে দারুণ গুলি চালাতে শুরু করল। নিমিষের মধ্যে রেঁস্তোরা মৃতদেহে পরিপূর্ণ হ'ল। ভাত খাওয়ার পরিবর্তে অনেকে খেল পিস্তলের গুলি। যারা পিস্তলের গুলি খেল তাদের ক্ষুৎপিপাসা চিরতরে লোপ পেয়ে গেল।

এদিকে ভ্রমণ করাটা মোটেই ভাল লাগল না। পর্যটক এহেন মারাত্মক অবস্থার মধ্যে থাকতে মোটেই রাজি নয়। তারপর সাইকেল নিয়ে আমি মহাবিপদে পড়েছিলাম। এদিকে সাইকেল চালানো বড়ই কষ্টকর। পথঘাট নেই বললেও চলে। হেনচো-ফোঁর দিকে ফিরে যাওয়াই সংগত বিবেচনা করলাম কিন্তু সাথীরা তাতে রাজি হ'ল না। তারা সাইকেল রেঁস্তোরায় রেখে যাবার বন্দোবস্ত করতে লাগল। আমিও আর তাতে বাধা দিলাম না, কিন্তু সেই রাত্রিটি এখানে না থাকারই আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল। সাথীরা যখন বুঝল এখানে রাত কাটাতে আমার একান্তই অনিচ্ছা তখন অগত্যা তারা আমাকে নিয়ে অন্য গ্রামের দিকে চলল। আমরা পায়ে হেঁটেই রওনা হলাম, সাইকেলের কথা সাময়িকভাবে ভুলতেই হ'ল। আমরা সন্ধ্যার পূর্বেই অন্য এক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

এখানে অনেকগুলি সেপাই জড়ো হয়েছে। গ্রামের লোক তাদের জন্য পাক করেছিল। তাদের খেতে বসবার পূর্বেই আমরাও গিয়ে উপস্থিত হলাম। খাওয়াটা তাদের সঙ্গেই হ'ল। থাকবার আমাদের অসুবিধা হবার কথাই ছিল কিন্তু একটু রাত হয়ে যাবার পরই সেপাইএর দল কোথায় উধাও হয়ে গেল। আমরা একটা হোটেলে গিয়ে স্থান নিলাম।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক কথাই ভাবছিলাম। বেশীক্ষণ ঘুমোতে পারলাম না, উঠে বসলাম। একজন সাথীকে জিজ্ঞাসা করলাম—প্রতি-ক্রিয়াশীল সরকার জাপানীদের কি সমুদয় দেশটাই দিয়ে দিতে চান? তিনি বললেন—অনেকটা তাই। আপনি যখন মান্‌চুরিয়াতে যাবেন তখন দেখবেন মান্‌চুরিয়ার সঙ্গে আমাদের অতি নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। ডোভারকে যদি ইংলণ্ডের বাইরে বলা যায় তবে মান্‌চুরিয়াকেও চীনের বাইরে বলা যেতে পারে। আমি আরও চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আমার মনে হয় আপনাদের শত্রু ঘরে বাইরে বর্তমান, উভয় শত্রুকে দমন করা আপনাদের পক্ষে কষ্টকর হবে। সাথী বললেন, কথাটা ঠিক বটে তবে তার উত্তর দেওয়া চলে না। তার উত্তর যা হবে তা খাঁটি পলিটিক্স। আপনার সঙ্গে আমরা পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করব না।

এ বিষয় নিয়ে পরে পিকিংএ একদিন আলোচনা হয়েছিল। পিকিংএর কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে জানিয়েছিলেন তাঁরা যেন-তেন প্রকারে জেনারেল চিয়াং-কাই-শেককে দলে ভিড়াবেনই এবং তাঁর বর্তমান মত পরি-বর্তন করাবেনই। জেনারেল চিয়াং কাই-শেককে দলে না আনতে পারলে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভবপর হবে না এটা তাঁরা বেশ ভাল করেই বুঝেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি শুধু থিসিস কপ চিয়ে সময় না কাটিয়ে থিসিস যাতে কার্যকরী হয় তার চেষ্টা করেন এবং ১৯৩৭ সালের শেষভাগে তাঁরা যা করতে চেয়েছিলেন তাতে সফলকাম হন। জেনারেল চিয়াং-কাই-শেক মত বদল করেন কিন্তু কমিউনিস্ট দলের সাহায্যে তিনি জাপানের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার পূর্বেই জাপানীরা চীনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে।

যাক্—এখন আবার পূর্বের কথায় ফিরে আসি। রাতটা আরামে কাটিয়ে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ফের আমরা পথে বের হলাম।

এবার আমরা কোন দিকে যাচ্ছি অথবা কোন্ বিশেষ স্থানে যাচ্ছি সে সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না, শুধু ভাঙ্গা এবং গড়ার মাঝে কমিউনিজম কি ক'রে বিস্তার লাভ করছে তাই লক্ষ্য করতে লাগলাম। কোন কিছু জানতে হলে ধৈর্য ধরতে হয় এবং পরিশ্রম করতে হয়। আমার অভ্যাসই হ'ল পথে চলার সময় কোন কঠিন বিষয় নিয়ে চিন্তা করা। আমি চলতে চলতে ভাবছিলাম এত শত্রুর মাঝে কি ক'রে মাও-সুতন-এর নবজাত সোভিয়েট এখনও বেঁচে থাকতে সক্ষম হচ্ছে। মাঝে মাঝে যখন বিশ্রাম করতাম তখন চিত্র এঁকে সাথীদের দেখাতাম—এতগুলি শত্রু আপনাদের আছে, এ সব শত্রুকে জয় না করলে আপনাদের বেঁচে থাকবার কোন উপায়ই দেখছি না। কয়েকদিন ভ্রমণ করার পর সাথীরা আমার প্রশ্নবাণে অস্থির হয়ে বলেছিলেন—আমরা মরি বাঁচি তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু যে সকল স্থানে সোভিয়েট স্থাপিত হয়েছে সে সব স্থানের অধিবাসীরা বুঝতে পেরেছে সোভিয়েট কাকে বলে। সোভিয়েট হ'ল অমৃততুল্য, একবার যারা অমৃতের আস্বাদ পেয়েছে, তারা যাতে বরাবর তা পেতে পারে তার জন্য নিশ্চয় চেষ্টা করবে। একবার যদি সোভিয়েট প্রথা চলেও যায় আবার যাতে ফিরে আসে সে জন্য তারা নিজেরাই চেষ্টা করবে!

লোকে বলে লেখনী চমৎকার জিনিস। লেখনীর সাহায্যে অজানাকেও জানাতে পারা যায়। আমি কিন্তু অজানাকে জানাতে পারছি না। সোভিয়েট দেখবার স্থান, জ্ঞান অর্জনের উপযুক্ত স্থান, পৃথিবীর শান্তির স্থান, কিন্তু কিছুই যে প্রকাশ করতে পারছি না! এটা হয়ত লেখনীর দোষ নয়, এটা দেশ-কাল-পাত্রের দোষ। অতএব সোভিয়েট চীনের কথা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। যতই সোভিয়েট চীন দেখছিলাম ততই মনে হচ্ছিল কবে পৃথিবী সুদ্ধ সোভিয়েট হবে। এরূপ চিন্তা করা আমার পক্ষে অন্যায় হয় নি। যদি কেউ কোন ভাল জিনিস বিদেশে গিয়ে পায় তবে তাই দেশে

নিয়ে আসে দেশের লোককে দেখাতে, তা খাদ্য হলে দেশের লোককে বিলিয়ে দিতে। কিন্তু সোভিয়েট খাদ্য নয় যে কিনে এনে বিলিয়ে দেব দেশবাসীকে। সোভিয়েট কিনতে পারা যায় না, সোভিয়েট গড়তে হয়।

নতুনের পত্তন করতে হলেই শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম হয়। চালিন সোভিয়েট গড়তে গিয়ে মাও-স্থতন অনেক পরিশ্রম করেছিলেন। অধিক পরিশ্রমের জন্য তাঁর শরীর দু'বার ভেঙ্গে যায়। চীনারা যত পরিশ্রম করতে পারে ততটা ভারতবাসীর দ্বারা সম্ভব হয় না। ওয়াং যখন মাও-এর কথা আমার কাছে বলতেন তখন তিনি তাঁর ডান হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলটি দেখিয়ে বলতেন, মাও-এর মত কর্মবীর চীনদেশে আর জন্মায় নি। অনেক সময় তিনি বলতেন পৃথিবীতে যত বীর পুরুষ জন্ম নিয়েছেন মাও সকলের অগ্রগণ্য। আমি তাতে যখন প্রতিবাদ করতাম তখন ওয়াং বলতেন, চীনদেশ শত ভাগে বিভক্ত। বিদেশীরা চীনের বুকের উপর তাণ্ডব নৃত্য করছে, এমনি অবস্থায় চীনে সোভিয়েট গঠন করা শুধু মাও-স্থতনের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

আমি কাজ করেছি পল্টনে, শুধু হুকুম তামিল করতেই শিখেছি, কিন্তু কি ক'রে হুকুম দিতে হয় তা আমার অজ্ঞাত। মাও-স্থতন আদেশ দেওয়া এবং আদেশ মানা উভয় দিকেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তারপর কমিউনিস্ট পার্টির লোক কোন কথা সহজে মেনে নিতে চায় না। তারা যখন কোন কাজে হাত দেয়, তখন তার আগে কাজের ধারা ও উদ্দেশ্য ভাল ভাবে ঠিক ক'রে নেয়। সেই সময় ভয়ানক তর্কযুদ্ধ হয়। এই তর্কযুদ্ধে যে জয়ী হয় তাঁর কথাই সকলে মেনে নেয়। মাওকেও অনেক সময় তর্কযুদ্ধে নামতে হয়েছে। তর্কযুদ্ধ কর্মযুদ্ধের ভূমিকা। যারা ঠিক ঠিক কর্মী তারা দাসভাবের আওতায় থাকে না, সেজন্য মাও-কে কমিউনিস্ট পার্টিও একবার পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। মাও-এর কমিউনিস্ট দল পরিত্যাগ

করার কারণ ওয়াং আমার কাছে প্রায়ই বলতেন কিন্তু তাঁর কথায় বেশী কান দিইনি। তবুও যেটুকু মনে আছে তাই বলা দরকার মনে করি।

মাও কৃষক মজুরদের মধ্যে কাজ করতে ভালবাসতেন। ভারতবর্ষে কৃষক মজুর আমি অতি অল্পই দেখেছি। তারাও আবার ঠিক ঠিক কৃষক মজুর নয়। কৃষক ও মজুরের মধ্যে প্রায়ই আত্মীয়তার বন্ধন থাকে। সে জন্য ভারতের কৃষক মজুরের সঙ্গে চীনের এবং অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের কৃষক মজুরের কোনরূপ তুলনা হতে পারে না। ভারতে আছে শুধু কৃষক। এখানে এসব কথা আমি বিশেষ ক'রে বলতে যাব না কারণ এতে আসল কথা চাপা পড়বে এবং বইএরও কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে। মাও কৃষকদের সঙ্গে থাকতেন এবং তাদের ভেতরে গঠন কাজ চালাতেন। এই কাজের সময় তিনি এমনিভাবে কথা বলতেন যাতে ক'রে কৃষকদের মানসিক উন্নতি তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। কৃষক মজুরদের সঙ্গে থাকলেই বুঝতে পারা যায় তাদের অভাব এবং অভিযোগ কোথায়। তিনি তাদের সঙ্গে থেকে তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাদের অভাব ও অভিযোগের কথা বলতেও সক্ষম হয়েছিলেন। এ সব কারণেই তিনি কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিউনিস্ট দল তখনকার দিনে বিদ্রোহ পছন্দ করতেন না। ফলে জলন্ত আগুন স্তিমিত আগুন থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। মাও দক্ষিণ চীনের চারিদিকে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ আনয়ন করেন।

ওয়াং আমাকে বলেছিলেন মাও-এর বিদ্রোহের ফলে অনেক লোক অকালে মরেছে, অনেক শহর ও গ্রাম একদম লুপ্ত হয়ে গেছে। অনেক শহর রক্তের স্রোতে ভেসে গেছে। মাও তখন ছিলেন উগ্রপন্থী, বিদ্রোহ যেন তাঁর মজ্জাগত ছিল। এই বিদ্রোহের ফলেই চালিন-এ সোভিয়েট গড়ে ওঠে।

কিন্তু কথা হ'ল, এই ক্ষুদ্র সোভিয়েট এত বড় একটা শক্তির বিরুদ্ধে টিঁকে আছে কি ক'রে? চালিন্ হতে হেনচো-ফোঁ বেশি দূরে নয়। পথঘাটও এমন কিছু খারাপ নয় যে বড় বড় কামান অথবা সেপাই নিয়ে যাওয়া যায় না। এরোপ্লেনের কথা না বললেও চলে। জেনারেল হো একজন খ্যাতনামা বীর। তিনি বরাবর চাংসাতেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে সাহায্যও করেছিলেন। তাঁর ফৌজ অনেক ছিল। অর্থাভাব তাঁর মোটেই ছিল না। তবুও এত ছোট একটি নবজাত সোভিয়েটকে তাঁর ভয় করার কারণ কি তা জানবার সকলেরই ইচ্ছা হয়। আমি তার কারণ কিছুটা বুঝেছিলাম। আমি যে কয়টি কারণ খুঁজে পেয়েছিলাম তা যদি এখানে বলি তবে বোধহয় চালিনের প্রশংসাই হবে।

চীনদেশের সেপাইরা তখনকার দিনে মাত্র দশটি চীনা ডলার মাইনে পেত, তা হতে আবার ছয় ডলার খোরাকী বাবদ কেটে রাখা হ'ত। বাকি থাকত চার ডলার। এর দ্বারা কোন মতেই একজনের হাত খরচও চলত না। দারিদ্র্য ছিল চীনা সেপাইদের চিরসাথী। দারিদ্র্য কেউ পছন্দ করে না। দারিদ্র্য দূর করবার জন্য সকলেই চেষ্টা করে। চীনা সেপাইরাও তখনকার দিনে দারিদ্র্য অপসারণ করার চেষ্টা করত কিন্তু কি ক'রে দারিদ্র্য দূর হয় তাই ছিল জানবার বিষয়। লুটের ভাগে সেপাইরা ভাগ বসাতে অধিকারী ছিল না। ভাগ্য ফিরিয়ে আনবার মত লুঠ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। এটা খুবই সত্য কথা, উত্তেজনার জন্য সেপাইদের মদ খাওয়ানো হতো কিন্তু সেই মদের তেজ অতি অল্প। তাই নেশা বেশিক্ষণ থাকত না, যখন নেশা ছুটে যেত তখন তারা কি দেখত তা জানি না তবে আমি দেখতাম, সেপাইদের স্ত্রী হাতের বালা বন্ধক দিয়ে চাল কিনে আনছে, জমিদার এসে খাজনার তাগিদ করছে, পাওনাদার

এসে পাওনা চাইছে, সুদখোর এসে চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ চাইছে, বাড়ী নীলামে উঠছে, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হচ্ছে, রোগে অনেকদিন কষ্ট পেয়ে পুত্রকন্যা অকালে মরছে, ডাক্তারের একবারও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। এসব সংবাদ নিশ্চয়ই সেপাইরাও পেত! এই সংবাদ শুনে তাদের বুকের পাটা উঁচু থাকত কিনা জানি না তবে শোকে হয়ত তারা একটু আধটু নিশ্চয়ই দমে যেত। এইরূপভাবে যারা দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে কষ্ট পাচ্ছিল তাদেরই আত্মীয়-স্বজন ছিল জেনারেল হো-র সেপাই। এরূপ সেপাই নিয়ে সোভিয়েট আক্রমণ করা উচিত হবে কি না তাই বোধ হয় জেনারেল হো ভাবছিলেন। ভবিষ্যতে কিন্তু তাঁকেই চালিন আক্রমণ করতে হয়েছিল। তখন তাঁর সেপাইয়ের সংখ্যা চারগুণ বেড়ে গিয়েছিল, সেজন্যই বোধ হয় আক্রমণ ক'রে সোভিয়েট মতবাদীদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমানে সমানে লড়াই হলে নিশ্চয়ই পারতেন না।

চীনা সেপাইরা অন্ধ হয়ে বসে থাকত না। কংসী হতে তারাও বের হয়ে আসছিল সেপাই হবার জন্য। কংসীতে তারা নানাদেশের কথা ত শুনতই উপরন্তু স্থানীয় পলিটিক্স নিয়েও আলোচনা করত। শ্রেণীভেদ সেখানেই জেগেছিল। কংসী হতে বাইরে এসে সেই শ্রেণীভেদটা আরও স্পষ্টভাবে জাগরিত হয়েছিল। তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল তাদের জীবন বিক্রি হচ্ছে একমুঠা চালের জন্যই। যদি যুদ্ধে তারা মরে তবে তাদের স্ত্রীপুত্রের ভার কেউ নেবে না। তাদের স্ত্রীপুত্র কোথায় কি অবস্থায় থাকবে কেউ তার জন্য মামুলী দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলবে না, তাদের স্ত্রী-পুত্রকন্যা হবে পথের ভিখারী। জীবিত অবস্থাতেই তাদের পরিবারের লোক অনশনে মরেছে তাদের-মরণের পর ত অনশনে মরবেই। দারুণ অনশন হতে কি ক'রে রক্ষা পাওয়া যায় তার কথা তারাও চিন্তা করত।

একদিন হেনচো-ফোঁ-র কাছেই একজন আমেরিকান লেকচার

দিচ্ছিলেন। তাঁর লেকচার শুনবার জন্য আমিও দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি যা বলছিলেন তা বড়ই মুখরোচক ছিল। তাঁর কথা আর একজন লোক চীনা ভাষায় অনুবাদ ক'রে বলছিল। তিনি বলছিলেন—চীনে সোসিয়ালিজম্ স্থাপন করার জন্য যুবসমাজ যেভাবে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে অন্য কোন দেশে আজ পর্যন্ত তেমনটি দেয়নি। প্রাণ দেওয়াটা কতদূর ত্যাগ সকলে তা বোঝে না। প্রাণ দেবার আগে যদি আরও দুঃখ কষ্ট পেতে হয়, তবে হয় সোনায় সোহাগা। চীনের যুবক যুবতীরা সোসিয়ালিজ্‌ম্ স্থাপন করবার জন্য নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হচ্ছে। অত্যাচারে তারা মোটেই দমে যাচ্ছে না, একদল লোক যেই দুনিয়ার অন্তরালে চলে গেল অন্যদল তৎক্ষণাৎ তাদেরই কাজ নতুন তেজে করতে শুরু করল। বড় বড় রথী এবং মহারথী এসব বিপ্লবীদের দাবিয়ে রাখবার যতই চেষ্টা করছেন, কৌশল জাল বিস্তার করছেন তাদের তেজ, তাদের নিষ্ঠা, তাদের ত্যাগ ততই দুর্দমনীয় হয়ে উঠছে। এরপরও আপনারা বলতে চান চীনে সোভিয়েট হবে না ?

চারিদিক হতে বজ্রমুষ্টি ঊর্ধ্বে আকাশে উত্থিত হ'ল সে কথার শেষ ভাগে। আমি বুঝলাম এখানে শুধু মুখের কথা হচ্ছে না, বাচালতা হচ্ছে না, হচ্ছে প্রাণের বেদনার ঝঙ্কার আর সেই ঝঙ্কারে কেঁপে উঠছে সাম্রাজ্যবাদীর প্রাণ। তারপর তিনি বলছিলেন যদি এই সংগ্রামে চীন বাঁচে তবে পৃথিবীর সেরা দেশ আমেরিকাও বাঁচবে।

তখন বুঝিনি আমেরিকা কি ক'রে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল দেশ হ'ল। এখন আমেরিকা দেখে অনুভব হচ্ছে পরিষ্কার পথঘাট, বাড়ীঘর, ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা, গ্যাসের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে আমেরিকা নয়া সোসিয়ালিস্ট হলে নিশ্চয়ই চীনের সোসিয়ালিস্টদের মতই মতবাদ গ্রহণ করবে। চীনের সোসিয়ালিস্টরা অপরের দেশ কখনও জয় করতে ইচ্ছা করে

না, কিন্তু এও মনে রাখতে হবে চীনের সোসিয়ালিস্টরা নিজেদের দেশকে অপরের হাতে ছেড়েও দেবে না।

চীনা সোসিয়ালিস্টদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের সঙ্গে থেকে আমার একটা ধারণা হয়েছে। সেই ধারণাটি হ'ল—চীনের সোসিয়ালিস্টরা বড়ই উদার। তারা চায় পৃথিবীর নিপীড়িত জাতির মুক্তি। এতে তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যাদের এতবড় উচ্চ উদার আদর্শ তাদের জয় কামনা সকলেই করবে, আমি পূর্বেও করতাম এখনও করি, বলি—বিদ্রোহী চীন জয়লাভ করুক।

ভয়ঙ্কর আফ্রিকা

বোম্বে থেকে জাহাজে উঠে কয়দিনে মোম্বাসায় এসে পৌছলাম।

জাহাজ থেকে নেমে কাস্টম হাউসে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে যখন এস্‌ফাল্‌ট দেওয়া চওড়া পথে এসে দাঁড়ালাম তখন এই কথাটাই বেশী ক'রে মনে হতে লাগল, যারা আফ্রিকাকে শুধু ভয়েরই স্থান বলে বড় বড় পুস্তক লিখে গেছেন এবং এখনও যাঁরা গল্পচ্ছলে আফ্রিকাকে হীন ক'রে রাখেন তারা প্রকৃতই মানুষের শত্রু। পথের দুদিকে কি সুন্দর সাজানো বাগিচা, পাশে সুন্দর সুন্দর বাংলো ধরণের ঘরগুলি, দেখতে কি চমৎকার!

পথের লোকের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে পেটেল সমাজ-গৃহে উপস্থিত হলাম। পেটেল সমাজ-গৃহ বড়ই ডিমোক্রেটিক। সকল ধর্মের লোকেরই সেখানে থাকবার অধিকার আছে। তবে সপ্তাহে প্রত্যেককে ছয় শিলিং ক'রে রুমের ভাড়া দিতে হয়। পেটেল সমাজ-ঘরের সামনে একটি সুন্দর বাগিচা। বাগিচার ঠিক মধ্যস্থলে একটি আমগাছ। আমগাছে অনেকগুলি পাকা আম ঝুলছিল। এই দৃশ্যটি দেখেই আমি সাইকেল হতে নেমে অনেকক্ষণ পাকা আমের দিকে চেয়ে রইলাম। উপরের আম দেখে মনে হ'ল নিশ্চয়ই নীচে কোথাও আম পড়েও থাকতে পারে। তাই আম গাছের নীচটা দেখতে লাগলাম। দূর্বাঘাসের আড়ালে বেশ সুন্দর একটি পাকা আম পড়েছিল, তবে তা কাকের দ্বারা অর্ধ-ভক্ষিত। ছেলেবেলায় কাকে খাওয়া আম অনেক খেয়েছি, বিদেশে বয়স্ক অবস্থায় সেরূপ আম খেলে দোষ কি? আর বেশি চিন্তা না ক'রে আমটির কাকে খাওয়া দিকটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে দিলাম এবং নিকটস্থ জলের কলে গিয়ে আমটা ধুয়ে খেতে লাগলাম! আমটি সুমিষ্ট এবং সুস্বাদু। আমাদের দেশের যে কোন

সুমিষ্ট আমের সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে। আমি যখন আম খাচ্ছিলাম তখন পেটেল সমাজের মালী এসে বলল, "বানা, নো ইট্ দিস্, ইউ গ্যেট্ ফিভার।" আমিও সেই ভাবেই জবাব দিলাম, "আই নো গ্যেট্ ফিভার, আই লাইক ইট।" লোকটি আর কথা বলল না। এরপর একজন গুজরাটি এসেও আমাকে বললেন—এদেশের আম খেলে জ্বর হয়, আপনি আম খাবেন না। আমি তাঁর কথা শুনে রাখলাম কিন্তু কিছুই বললাম না। শুনে আনন্দিত হলাম এ দেশের লোক আম খায় না ; এখানে বেশ ক'রে আম খাওয়া যাবে।

পেটেল সমাজের জনৈক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে থাকবার বন্দোবস্ত করলাম। সাইকেল এবং পিঠ-ঝোলাটা রেখে দিয়ে বাজারে খাবারের সন্ধানে চল্‌লাম। পেটেল সমাজের ঘর হতে বাজার আধ মাইল দূর হবে। পথ দিয়ে যখন চলছিলাম তখন একটু দূরে পথের পাশে দেখতে পেলাম একজন নিগ্রো বেশ লোভনীয় এক রকম সামুদ্রিক মাছ নারিকেল তৈলে ভাজা ক'রে প্লেটে সাজিয়ে রাখছে। আমি তৎক্ষণাৎ তার কাছে মাছ ভাজা চাইলাম।

আমার অনুরোধ শুনে লোকটি থতমত খেয়ে গেল কারণ আজ পর্যন্ত কোনও ইণ্ডিয়ান পথের পাশের নিগ্রো দোকানে বসে কিছু খায়নি। আমি লোকটিকে অভয় দিয়ে বললাম, তার ভয়ের কোন কারণ নেই। শুধু মাছ ভাজা ত খাওয়া যায় না, তাই কিছু ভাতও দিতে বল্‌লাম। এরা ভাত পাক করার সময় আরবি ধরণে ভাতে নূন দিয়ে দেয় সেজন্য বোধ হয় ভাজা মাছে নূন কম ছিল। আনন্দের সঙ্গে যখন ভাতের সঙ্গে ভাজা মাছ খাচ্ছিলাম তখন কয়েকটি গুজরাতি হিন্দু আমাকে এরূপ দোকানে প্রকাশ্যে খেতে দেখে বলল, "রামনাথ, তোমার নাম শুনে মনে হয় তুমি হিন্দু, হিন্দুরা ত মাছ খায় না।" আমি বললাম, "তোমরা খাও না আমরা

খাই। তোমরা আসছ ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হতে আর আমি আসছি ভারতের পূর্ব প্রান্ত হতে, স্থানের দূরত্ব অনেক রয়েছে।" গুজরাটি হিন্দুরা আর কিছু বলল না। তারা আপন পথে চলে গেল। তারপর এল গুজরাটি মুসলমান। তারা এসে আমাকে তাদের ইচ্ছামত গাল দিতে লাগল। তারা ভাবছিল আমি তাদের কথার কোন প্রতিবাদ করব না। হাতের মাছখানা খেয়ে নিগ্রো দোকানীর কাছে একটু জল চেয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললাম, "তোমাদের উদ্দেশ্য কি হে?" ওরা বলল, "তুমি একজন ইণ্ডিয়ান, তুমি যদি নিগ্রোদের দোকান হতে খাবার খাও তবে আমাদের সম্মান থাকবে না; তাই বলছি এমন ক'রে আর নিগ্রোদের দোকানে বসে খেও না।" আমি ওদের স্বভাব অনেকটা জানতাম তাই নিগ্রোটিকে এক শিলিং দিয়ে বললাম, "তুমি ওদের কথায় ভয় পেও না, এরা তোমাদেরই মত হয়ে গেছে।"

বাজারে গিয়ে দেখার মত অনেক জিনিষই পেয়েছিলাম, সে সবের প্রতি বিশেষ কোনরূপ লক্ষ্য না ক'রে কতকগুলি সিগারেট কিনে একখানা সংবাদপত্রের সন্ধান করতে লাগলাম, কিন্তু বিকালে সংবাদপত্র মোটেই পাওয়া যায় না দেখে ফের পেটেল সমাজে ফিরে এলাম।

পরদিন প্রাতে সাইকেল নিয়ে মোম্বাসা শহরটা দেখতে বের হলাম। দেখে মনে হ'ল মোম্বাসা একটি দ্বীপ অথবা উপদ্বীপ হবে। শহরের চারিদিক ঘুরে দেখে মনে হ'ল কোনও এক সময়ে মোম্বাসা দ্বীপই ছিল। বর্তমানে একটি সেতুর সাহায্যে মেনল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযোগ করা হয়েছে। মোম্বাসার বুকখানা শুধু সমতল, তিন দিক হঠাৎ যেন খাড়া হয়ে সাগর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। একদিক ঢালু এবং সেদিকেই মেনল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক। দ্বীপটিতে কোনরূপ সংক্রামক রোগ নাই। প্রায়ই বৃষ্টি হয়, দিনের বেলায় বেশ গরম অথচ শেষ রাত্ত থেকে একটু শীত অনুভব হতে থাকে

এবং সকাল বেলা কম্বলেরও দরকার হয়। প্রকৃত পক্ষে মোম্বাসাকে একটি স্বাস্থ্যনিবাস বললে কোন দোষ হয় না।

দ্বীপটি পরিক্রমা ক'রে দুইটি সংবাদপত্র অফিসে গেলাম। দু'খানা সংবাদপত্রের একখানার নাম হ'ল 'মোম্বাসা টাইমস্'। জনৈক রিপোর্টারের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, তখন হঠাৎ সম্পাদক মহাশয় তাঁর কামরা হতে বের হয়ে এসে বললেন, "আপনি কোথা হতে ভ্রমণ শুরু করেছেন?" আমি বললাম, "আমার ভ্রমণ শুরু হয়েছে সিঙ্গাপুর হতে।" সম্পাদক আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "আপনি কি মিঃ বিশ্বাস?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"এখন কোথা হতে এসেছেন?"

"এখন এসেছি স্বদেশ ভারতবর্ষ হতে।"

"আপনি কোন্ কোন্ দেশ বেড়িয়েছেন?"

আমার হাতে ভ্রমণের একটি বিবরণী ছিল, তাতে লেখা ছিল আমি কোন্ কোন্ দেশ ভ্রমণ করেছি। সেই কাগজখানা সম্পাদকের কাছে দিলাম। তিনি তা পাঠ করে আমার করমর্দন করলেন এবং একখানা চেয়ারে বসতে দিলেন। সম্পাদক বললেন, তিনি আমার বিরুদ্ধে 'স্টেট্স্ টাইমস' পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ যদি না লিখতেন, তবে হয় ত আমি এত দেশ ভ্রমণ করতে সক্ষম হতাম না। বিরুদ্ধে লেখারও একটা সুফল আছে। এই বলে তিনি আমাকে তাঁর সম্পাদিত একখানা সংবাদপত্র দিলেন এবং এখন হতে তিনি আমার পক্ষে লিখবেন এই আশ্বাসও দিলেন। বিদায়ের পূর্বে কি ক'রে আফ্রিকা ভ্রমণ করতে হবে সে সম্বন্ধে আমাকে প্রচুর উপদেশ দিতেও তিনি ভোলেন নি। তাঁর উপদেশ আমার খুব উপকারে লেগেছিল সে কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। এখনও মনে আছে তাঁর সেই কথা—"যেমন করে ভারতে নীচ জাতীয় হিন্দুদের প্রতি

আপনারা ব্যবহার করেন, ঠিক সেরূপ ব্যবহারই এদেশে আপনারা আমাদের কাছ থেকে পাবেন, এর একটুও বেশী নয়। তা বলে ঘাবড়ে যাবেন না। পরিশ্রম ক'রে দেখুন এবং যা দেখবেন তাই লিপিবদ্ধ ক'রে দেশে গিয়ে প্রচার করুন, তাতে ভারতবাসীর অনেক উপকার হবে। এখানে আমি আপনাকে চেয়ারে বসিয়ে কথা বলছি; তা আজই করলাম, আগামী কাল তা আর হবে না। আমার শত্রুতার সুফল কিরূপ হয়েছে তাই দেখবার জন্যই এই আপ্যায়ন। এখন থেকে আপনি ইণ্ডিয়ান আর আমি শ্বেতকায়।" তাঁর আন্তরিক শুভ ইচ্ছা অনুভব করে তৎক্ষণাৎ তাঁর রুম ছেড়ে চলে এলাম এবং পেটেল সমাজে এসে সম্পাদকের দেওয়া মোম্বাসা টাইমস কাগজখানা একটু পাঠ করেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

দুপুর বেলাটাতে অনেক আম খেয়েছিলাম বলেই বোধ হয় বেশ ঘুম হয়েছিল। ঘুম থেকে উঠেই সংবাদপত্র পাঠে মন দিলাম।

মোম্বাসাতে আসার পরই অনেক ভারতীয় যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তারা আমাকে সাহায্য করবার জন্য বেশ উৎসুক ছিল।

মোম্বাসার ভারতীয় যুবকগণ বড়ই স্বদেশপ্রেমিক। একদিন কতকগুলি যুবক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার কাছে একটি গল্প বলেছিল। এখন যতদূর মনে আছে আমি তাই পাঠকের কাছে বলব।

আজ হতে ছয় শত বৎসর পূর্বে পোর বন্দরের বেনেরা আফ্রিকায় ব্যবসা করতে যায়। তখনকার দিনে আরবদের পূর্ব-আফ্রিকাতে খুব কম প্রভাবই ছিল। ক্রমাগত অনেকদিন ব্যবসা ক'রে অনেক বেনে মোম্বাসা, জানজিবার এবং পূর্ব-আফ্রিকার সমুদ্রতীরে বসবাস করে এবং রাজ্য স্থাপনও করে। পরে কোন প্রকারে পোর বন্দরের শাসনকর্তা যখন শুনলেন যে সমুদ্র পার হয়ে গিয়ে হিন্দুরা উপনিবেশ স্থাপন করেছে,

তখন তিনি উপনিবেশী হিন্দুদের বিধর্মী বলে ঘোষণা করেন এবং তাদের মুসলমান বলে নামকরণ করেন। যারা সাহায্য পাবার জন্য অর্থাৎ লোক লস্কর নেবার জন্য পোর বন্দরে এসেছিল তারাই সর্বপ্রথম পোর বন্দরের শাসনকর্তার আদেশে ইস্লাম ধর্ম কবুল করতে বাধ্য হয়। এসব লোকের মধ্যে অনেকেই আফ্রিকাতে ফিরে এসে অন্যান্য ভারতবাসীদের কাছে বলল যে তারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। এই সংবাদটি পৌঁছানো মাত্র আফ্রিকার হিন্দু কলোনীতে বিষাদের ছায়া পতিত হ'ল। অনেকেই দেশে ফিরে গেল এবং বলল তারা সাগর পার হয়নি, বম্বে থেকে অথবা ভারতের অন্য কোন বন্দর হতে ফিরছে। আফ্রিকাতে যারা রয়ে গেল সবাই হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ ক'রে ইস্লাম ধর্ম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করল। এরই ফলে ভারতীয়দের সমুদ্র যাত্রার উদ্যম চলে গেল। এর কয়েক বৎসর পরই আরবরা ভারতীয়দের আক্রমণ করে এবং আফ্রিকার ভারতীয় কলোনী দখল করে। এই গল্পটি বলার পর অনেক যুবকই ভারতীয় ধর্মের প্রতি নানারূপ অনুযোগ আনে এবং ভাল করেই বুঝিয়ে দেয় তারা সেই পুরাতন সংকীর্ণ প্রকৃতির কোনই ধার ধারে না। আফ্রিকায় ভারতীয়দের পূর্ব ইতিহাস যেমনই থাকুক না কেন বর্তমানে অনেকটা উন্নতি লাভ করেছে। পূর্বে আফ্রিকাতে শুধু গুজরাটিরাই যেত, বর্তমানে ভারতের নানা স্থান হতে নানা রকমের লোক গিয়ে বসবাস করছে।

কেনিয়াতে শিখরা এসেই প্রথম ভারতের হয়ে সুনাম অর্জন করেছিল। গুজরাটিদের সঙ্গে নিগ্রোরা এবং বর্ণ-সঙ্কর আরবরা হিসাব ক'রে চলত না, কারণ গুজরাটিরা আঘাত খেয়ে আঘাত ফিরিয়ে দিত না। সেজন্য স্থানীয় লোক ভারতীয়দের প্রতি একটু বেপরওয়া ভাবই দেখাত। শিখদের আসার পর শিখদের প্রতিও নিগ্রো, আরব এবং বর্ণ-সঙ্কর আরবরা তেমনি করেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। শিখরা অনেকদিন সে অত্যাচার সয়েছিল,

কিন্তু হঠাৎ একদিন কালাসিং নামক একটি শিখ তলোয়ার হাতে ক'রে মোম্বাসার বাজারের উপর ঘুরতে থাকে এবং আরব, নিগ্রো এবং বর্ণ-সঙ্কর আরবদের কয়েকজনকে হত্যা করে। এর পর থেকে শিখ সম্প্রদায়কে আরবগণ বেশ সম্মান করতে থাকে এবং শিখদের শিখ না বলে "কালা-সিংহা" নাম দেয়।

আরও কয়েকদিন মোম্বাসায় থেকে বুঝলাম এখানে সাথী পাওয়া যাবে না, তাই একদিন সকালবেলা পরিচিত লোকদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে একাই চললাম আফ্রিকার জঙ্গলের দিকে। মোম্বাসা দ্বীপটি সেতু দিয়ে মেইনল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। সেতুটি পার হয়েই একটি চড়াই। চড়াইটি এত খাড়া যে সাইকেল হতে নামতে বাধ্য হলাম। যে কয়জন বন্ধু সঙ্গে এসেছিল, তারা খাড়াটা পার হয়ে একটু সমতল ভূমিতে পৌঁছেই আমার কাছ হতে বিদায় নিল। উঁচু ভূমিটির উপর দাঁড়িয়ে মোম্বাসা শহর আর একবার দেখে নিলাম। তারপরই সাইকেলে উঠে পুরা দমে প্যাড্‌ল করতে শুরু করলাম। সামনে ক্রমেই চড়াই আসতে লাগল। ছোট পথটির দু'পাশে আনারসের বাগান। আনারসের বাগান আম কাঁঠাল এবং নারিকেল গাছে ভর্তি ছিল। তবে আমগাছে আম ছিল না, কাঁঠালগাছে কাঁঠাল ছিল। কতক দূর গিয়ে একটি কাঁঠাল গাছ হতে একটি পাকা কাঁঠাল পেড়ে তাই খেয়ে নিলাম। কাঁঠাল খেয়ে পেটটা বোঝাই হ'ল বটে কিন্তু গরম অনুভব হতে লাগল। আমি গরম সহ্য করতে পারতাম। মাথা হতে ঘাম টস টস ক'রে পড়তে লাগল। মাথার টুপি এবং চোখের চশমা খুলে নিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে চলতে লাগলাম। কি আনন্দময় সেই ভ্রমণ! কোথায় বন্যজীব? কোথায় ভয়ঙ্কর আফ্রিকা? মাইল দশ চলার পর বাগান শেষ হয়ে গেল। শুরু হ'ল জঙ্গল। কফি

ভাষায় জঙ্গলের কথা বলে লাভ নেই। জঙ্গলের শুরু হতেই বুঝলাম এখানকার জমির উপরটা ভয়ানক ভিজা আবার দু'হাত নীচেই একদম শক্ত পাথর। এজন্যই এই স্থানটাকে বলা হয় swampy land. মাটি সম্বন্ধে আমি অনেক বিষয় জানতাম তাই এরূপ স্থানে এসে তাড়াতাড়ি সাইকেল চালালাম না। সাইকেল হতে নেমে পড়লাম এবং ভিজা স্থানের চুয়ানো জল খাবার জন্য ছোটখাট একটি জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। জঙ্গলটি অবিকল মালয় দেশের জঙ্গলের মত—রবার চাষের উপযুক্ত। তখন যুদ্ধ শুরু হয়নি, তাই রবার চাষের এরূপ উপযুক্ত স্থান অনাবাদী পড়ে আছে দেখে মোটেই দুঃখ হ'ল না। এরূপ জায়গাতেই আমাদের দেশে বাঘ থাকে, কিন্তু আফ্রিকাতে বাঘ নাই আছে শুধু চিতা। একটা চিতাবাঘের সঙ্গে লড়াই করার বেশ ক্ষমতা আছে জেনেই জল খেতে জঙ্গলে যেতে কোনরূপ ভয় করিনি।

মধ্যাহ্ন সূর্য যখন আমার মাথার উপর, আমার কপাল হতে যখন টস টস ক'রে ঘাম ঝরছে, পা দু'খানা যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, তখন কাছেই দেখলাম দুটি নারিকেল বৃক্ষ ডাবে শোভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ জীবনে অনেক কাজই করেছি কিন্তু নারিকেল বৃক্ষে আরোহণ করবার মত সুযোগ কখনও হয় নি। পাড়ায় একটি মাত্র নারিকেল গাছ ছিল, তাও আমার জেঠিমার ঘরের পেছনে। জেঠিমাকে বড় ভালবাসতাম তাই তাঁর নারিকেল বৃক্ষটিকেও ভালবেসেই তার স্কন্ধে আরোহণ করিনি। এটা আফ্রিকা। যুগল নারিকেল-বৃক্ষ ডাবে শোভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এটা অনেকক্ষণ সহ্য করতে পারছিলাম না। কে এই গাছ দুটি রোপণ করেছিল সে কথা মোটেই ওঠে না, শুধু চিন্তনীয় বিষয় ছিল কি ক'রে ডাব পাড়া যায়। কতক্ষণ দাঁড়াবার পরই একটি নিগ্রোকে পথ দিয়ে যেতে দেখলাম। তাকে একদম ধরে এনে ডাব দেখিয়ে বললাম তা পেড়ে

দিতে। নিগ্রো কি চিন্তা করল তারপর গাছে উঠল। গাছে উঠে সে একটা ক'রে ডাব কেটে আমার হাতে ফেলে দিতে লাগল আর আমি লুফে নিতে লাগলাম। ডাব খেয়ে বেশ আরাম পেলাম তারপর আবার চলতে শুরু করলাম। অতি কষ্ট ক'রে বিকালে রোসাপি নামক স্থানে পৌছলাম। তথায় কয়েক ঘর ভারতীয়ের বাস ছিল। তাদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের কাছে আমার অবস্থা বোঝাতে পথশ্রমের পর যে শক্তিটুকু ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে গেল। তাই চিন্তা ক'রে ঠিক করলাম যত সত্বর পারি কোনও নিগ্রো গ্রামে গিয়ে নিগ্রো সাথী যোগাড় করতেই হবে। এতে অর্থব্যয় হয় হবে।

রোসাপি যাওয়াটাই আমার ভুল হয়েছিল। সেদিকে পথ চলেছে মেলিণ্ডির দিকে, তাই পরের দিন জংলী পথে চলতে লাগলাম এবং ঝাঁড়িপথ বের ক'রে পি, ডব্লিউ, ডি-এর পথে আসবার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমি জানতাম না এরূপ চেষ্টা করাটা আফ্রিকায় কেন, যে কোন জংলী পথেই চলে না। তবুও আমার একগুঁয়েমি ছাড়তে কোন মতেই রাজি ছিলাম না। পথে একাকী বেরিয়েছি। পথ কোন দিকে চলেছে তার কোন সংবাদ আমার জানা ছিল না। তবে পথ ছিল একথা আমায় বলতেই হবে। তারপর একজন খৃষ্টান আয়ারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন কয়েক মাইল যাবার পর আমি একটি গ্রাম পাব, সে গ্রামে হয়ত সাথী পাবার যথেষ্ট সুযোগও মিলতে পারে।

দুপুরবেলাতে এক গ্রামে পৌছে একটি ঘরের কাছে গিয়ে বসলাম। ঘরে কেউ ছিল না দেখে ঘরে প্রবেশ করিনি। কতক্ষণ বসার পর একটি যুবক এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই ইংরাজীতে বললাম, "এই নাও এক শিলিং, আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে এস।" সে আমার দিকে কতক্ষণ

তাকিয়ে থেকে বলল, "চাল, ডিম, নুন?" বুঝলাম যুবক আমার বেশ সাহায্যকারী হবে, তাই বললাম, "চাল, ডিম, নুন, দুধ, চিনি, চা, সিগারেট। এই নাও আরও এক শিলিং।" যুবক দুটি শিলিং নিয়ে জংলী পথে কোথায় উধাও হয়ে গেল, আর আমি বাইরেই বসে রইলাম।

আমি যে গ্রামে এসে বসেছি তার দ্বিতীয় পরিবার কোথায় এবং কত দূরে থাকে তা এখনও জানতে পারিনি, এমন কি দ্বিতীয় একখানা ঘর আছে বলেও মনে হল না, তবুও আমি এটাকে গ্রাম বলতেই বাধ্য হলাম। এ যে আফ্রিকা, এখানে এক ঘরেও গ্রাম হয়। ঘণ্টা দুয়েকে পর যুবক ফিরে এল এবং সঙ্গে ক'রে তার মা এবং ভাই-বোনদেরও নিয়ে এল। তারা এসেই আমাকে নমস্কার করল এবং আমার দেওয়া পয়সায় যে চা আনা হয়েছে তাই পাক করার ব্যবস্থা করতে লাগল।

এদের বাড়ির কাছে কোথাও জল ছিল না। আমার চিন্তা হ'ল নোংরা জল দিয়ে যদি পাক করে তবে কোন অনর্থ না ঘটে। তাই স্না করবার ছল ক'রে জলের সন্ধানে বের হয়ে পড়লাম। এ অঞ্চল পর্বতে পূর্ণ পর্বতগুলির একটা অন্যটার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই যেন ক্রমে পশ্চি দিকে উঁচু হয়ে উঠছে। এখানে নদীগুলি পূর্ববাহিনী বলে আমার মনে হ'ল হয়তো যুবক আমাকে কোনও নদীতে নিয়ে যাবে কিন্তু যেখানে নিয়ে গে তা নদী নয়, একটি ছোট নালা। তার জল নির্মল এবং শীতল। শীতল জ স্নান ক'রে নিলাম। যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম এই জল দিয়েই পাক কর ত? সে মাথা নেড়ে জানাল এই জল দিয়েই তারা পাক করে।

কথা প্রসঙ্গে তাকে বললাম, এখানে এমন কোন লোক পাওয়া যা কি যে আমার সঙ্গে যেতে পারে? আমার কথা শুনে যুবক বল "নিশ্চয়ই পথ ভুল করেছেন? যদি আপনার সঙ্গে আমি নাইরবী যাই ত ক্ষতি হবে কি?" "নিশ্চয়ই না, তুমি একা কেন আসবে, আরও দু-এ

জনকে নিয়ে আসতে পার। আমি তোমাদের খাইখরচ দেব, আর যদি মাইনে চাও তবে তাও পাবে।" যুবক যেন আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠল। পরদিন বিকালে যুবক আরও দু'জন বেশ পালোয়ান গোছের লোক নিয়ে এল। তাদের কারো বয়স আঠারো বৎসরের বেশী নয়। দেখলেই জংলী বলে মনে হয়। আমার কথামত তারা বিকালেই মস্তক মুণ্ডন করল, কান হতে কাঠের দুল খুলে ফেলল, পায়ে বেতের গয়না ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল এবং যুবকের সঙ্গেই গিয়ে স্নান ক'রে এল। এদের কাপড় ছিল না। আমাকেই তাদের পরনের কাপড়ের বন্দোবস্ত করতে হ'ল। এরা শহরের মুখ দেখেনি বলেই বোধ হয়। এদের শরীর বেশ মোটাসোটা ছিল।

পরদিন আমরা চার জনে মিলে অনেক খাদ্য সংগ্রহ ক'রে সেদিনই বন্য পথে রওনা হলাম। আমাদের সঙ্গে অস্ত্র বলতে কিছু ছিল না, শুধু কয়েকখানা লম্বা ছোরা ও দুটো বাতি ছিল। একটা টিপ্ বাতি আর অন্যটা সাইকেলের বাতি। আমরা সারা বিকাল পথ চলে সন্ধ্যা বেলায় একটি বৃক্ষহীন প্রশস্ত স্থানে এসে মশারি খাটালাম। মশারিটি তাঁবুর কাজ করল। আমিই শুধু মশারির ভেতর শুলাম, নিগ্রো যুবকগণ মশারির বাইরে শুয়ে থাকল। যখন মশা অত্যাচার শুরু করল তখন তারাও মশারির ভেতর চলে এল।

চারদিন পথ চলার পর আমরা তারু নামক স্থানে এলাম। আমার একটা বদ অভ্যাস, যা এখনও আমি ছাড়তে পারছি না, সেটা হ'ল কারো নাম না জিজ্ঞাসা করা। প্রথম-পরিচিত লোকটির নাম তারুতে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলেছিল তার নাম তাইরু। হয়ত যুবক তার নাম গোপন করেছিল তাই তারুতে এসে বোধ হয় তাইরু বলেছিল। এতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই ছিল না। আমিও তাকে তাইরু না বলে তারু বলেই ডাকতাম।

বলতে গেলে তারু হতেই আফ্রিকার অরণ্য শুরু হয়েছে। সর্বপ্রথম আমরা মোটরের পথ ছেড়ে দিয়ে তারুর বন্ধুদের জানা অরণ্যপথে এগুতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক চলার পরই সত্যিকারের বন শুরু হ'ল—শালবন নয়, এটা হল 'বুশ'। বনের অনুবাদ যদি ইংরেজিতে লেখা হয়, তবে তাকে বলে 'ফরেষ্ট'। পৃথিবীর সর্বত্র 'ফরেষ্ট নেই, এখানেও তাই। 'বুশ' নানা রকমের। তবে কোথাও ত্রিশ হাতের বেশী লম্বা গাছ দেখা যায় না। আমরা যে 'বুশে' এখন প্রবেশ করেছি, সেই 'বুশে'র প্রত্যেকটি বৃক্ষের গোড়া হতে ডাল পর্যন্ত কাঁটায় ভর্তি, সেই কাঁটা আমাদের দেশের ময়না কাঁটা হতেও ধারালো এবং শক্ত। এখানে যদি একটা বড় সাপ এবং একটা সিংহে লড়াই হয়—তবে উভয়েরই গাছের কাঁটা ফুটে মৃত্যু অনিবার্য। তারুর সঙ্গে যে দুইটি লোক এসেছিল, তাদের মধ্যে যেটি বয়সে বড় তার বেশ বুদ্ধি ছিল। পথ চলার সময়েই বুঝতে পেরেছিলাম এরূপ ভয়ঙ্কর পথ দিয়ে কেন সে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। এ পথ একদম জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে নিরাপদ।

আমরা যে পথে চলেছি তা একপায়ে চলার পথ। পথের দুদিকে গভীর জঙ্গল। কোন্ দিকে কতদূর বিস্তৃত তা জানবার কোন উপায় ছিল না। 'বুশে' যে সব গাছ ছিল তাদের শাখা মাটি পর্যন্ত নেমে এসেছে, সেজন্যই কোন বন্যজন্তু এ পথে আসতে পারে না। এমন কি উপন্যাসে বর্ণিত অথবা সিনেমাতে যে সকল জানোয়ার দেখানো হয় তাদেরও অনেকের এপথে প্রবেশ নিষেধ।

আমি একজন সামান্য মানুষ। মনের গতি সকল সময় ঠিক রাখতে পারি না। সেইজন্যই বোধ হয় ঘণ্টা চারেক চলার পর মনে হয়েছিল এরূপ জংলী পথে চলে কি লাভ হবে? অসাবধানতাবশত যদি পা পিছলে যায় এবং কাঁটার উপর গিয়ে পড়ি, তবে এ সব বিষাক্ত কাঁটার বিষেই ত

মারা যাব। কিন্তু ফেরবার আর উপায় ছিল না, অনেকদূর এগিয়ে এসেছিলাম। ঘড়িতে দেখলাম চারটে বেজেছে। সূর্যকিরণের উত্তাপ কমে গেছে। আশে পাশে জঙ্গলে এরই মাঝে মশার ডাক আরম্ভ হয়েছে। মশার জন্য আমাকে চিন্তা করতে হয় নি। কারণ আমার কাছে যে মশারি ছিল তাতে মশা ত দূরের কথা, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটও প্রবেশ করতে পারত না।

স্বাধীনভাবে বনে জঙ্গলে বেড়াতে হ'লে স্বাধীনভাবেরই চিন্তাই করতে হয়। আমার জন্ম পরাধীন দেশে, স্বাধীনভাবের চিন্তা কি ক'রে করতে হয় যদিও দেশভ্রমণের ফলে আমার জানা ছিল, তবুও অভ্যাস ছিল না। ক্ষিধে পেলে কি খাব ভেবে আমার দুর্বল মন চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। যে খাদ্য আমি সঙ্গে এনেছিলাম তা এর মধ্যেই শেষ হয়ে এসেছে। কেত্‌লীতে জল আর নেই। আমার সাথীরা সবাই নিগ্রো। আজ তাদের বোধ হয় কিছুই দরকার হবে না। কিন্তু আমি ত ওদের মত নই। যতই খাবারের চিন্তা বেড়ে গেল, ততই ক্ষুধা এসে কাবু করতে লাগল। আরও কিছুক্ষণ চলার পর পথের পাশেই বসে পড়লাম। তারুকে বললাম আমার দ্বারা আর চলা হবে না। তারু আমার কথা শুনে চিন্তিত হ'ল, তারপরই সে তার বন্ধুদের দিকে তাকাল। তার বন্ধুরা আমার কাছে এসে বসল এবং একজন আমাকে তার কাঁধে চড়তে বলল। তারুর বন্ধুর কাঁধে চড়ে আমি বেশ শান্তি বোধ করলাম।

আধ ঘণ্টা চলার পর আমরা একটি পরিষ্কার স্থানে এসে উপস্থিত হলাম। আমাদের সামনেই হরিণের পাল নির্ভয়ে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছিল। কাঙ্গারুর দল আমাদের দেখে পালিয়ে যাচ্ছিল, দু-একটা জেব্রা আমাদের দেখা মাত্রই ঊর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দিচ্ছিল। বন্যজীবের ছুটোছুটি দেখে আমি ভাবছিলাম এটাই বুঝি সত্যিকারের আফ্রিকা, কিন্তু তা নয়। কেনিয়া

সরকারের রিজার্ভ ফরেষ্টের এটা একটা অংশ। অদূরে একটি নিগ্রোর ঘর। পা চালিয়ে আমরা ঘরের কাছে গেলাম এবং তারুর সাহায্যে পঞ্চাশ সেণ্ট দিয়ে গৃহস্বামীর থেকে সমুদয় ঘরখানা ভাড়া নিলাম। গৃহস্বামী তার ছেলেমেয়ে নিয়ে নিকটেই আর একখানা ঘরে থাকবার বন্দোবস্ত করল। আমি একটি পাথরের ওপর বসে ছিলাম। আমার সাথীরা খাবার বন্দোবস্ত করছিল। যে খাদ্য তৈরী হয়েছিল তা তাদেরই খাদ্য। গরম জল দিয়ে বেশ ক'রে স্নান করলাম। কাফের কর্ণ্ এর লেই এবং এক টুকরা গোমাংস একত্রে সিদ্ধ করা হয়েছিল। তারই কতকটা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছিলাম। আমার সঙ্গীদের খাওয়া হয়ে গেলে তাদের একটা খরগোস ধরে আনতে বলেছিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে তারা একটি খরগোস ধরে এনেছিল। রাতে খরগোসের মাংস ও ভাতের বন্দোবস্ত হয়েছিল। খাবার খেয়ে ভাড়াটে ঘরখানা সাথীদের দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে শুলাম; রাতটা আরামেই কেটেছিল। পরের দিনও সেখানেই ছিলাম।

গ্রামের মাঝে ঘুরে ফিরে দিনটা কাটিয়ে দিলাম। গ্রামে মাত্র পাঁচখানা ঘর। জনসংখ্যা পনেরো হতে কুড়ির বেশী হবে না। গ্রামের লোকগুলোকে অসভ্যই বলতে হবে কারণ এখনও তারা প্রিমিটিভ অবস্থাতেই আছে। তারা কোন-কিছুকে প্রার্থনা করে না। অন্ধকারকে ভয় করে। কথা বেশী বলে না। কোনরূপ বাজনা বাজিয়ে সময় কাটাতে ভালবাসে। এরা একতারা বাজাতে জানে।

রাতে গ্রামের মধ্যে কোনরূপ বন্যজীব আসতে দেখলাম না। তারু বলেছিল এদিকে নাকি মাঝে মাঝে বন্য-হাতী আসে। বন্যজীবের দ্বারা আক্রান্ত হবার বিশেষ কোন ভয় না থাকলেও, শুধু এখানে নয় আফ্রিকার প্রায় সকল স্থানে 'ডু-ডু' পোকা হতে ভয়ের কারণ আছে। এই পোকার দ্বারা এখানকার অধিবাসীরা প্রায়ই আক্রান্ত হয়। আমিও 'ডু-ডু' পোকার

দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলাম। 'ডু-ডু' পোকা সাধারণত হাত এবং পায়ের নখের ভিতরে আমাদের অজান্তে এবং অদৃশ্য ভাবে প্রবেশ করে। নখের মধ্যে প্রবেশ করার পর নখের মাংস খেয়ে ফেলে। এতে নখে ভয়ঙ্কর ব্যথা হয়, যখনি ব্যথা হয় তখনি বুঝতে হবে 'ডু-ডু' পোকা আক্রমণ করেছে। সেজন্য ডাক্তার খুঁজতে হয় না। তা ছাড়া ডাক্তার খুঁজেও লাভ নাই। বনে জঙ্গলে ডাক্তার কোথাই বা পাওয়া যাবে। আফ্রিকার সর্বত্র নিগ্রোরাই কি ক'রে নখ হতে ডু-ডু পোকা বের করতে হয়, তা ভাল ক'রে জানে। যে কোন নিগ্রোকে 'ডু ডু' পোকার দ্বারা আক্রান্ত নখ অথবা অন্যত্র যে স্থানে 'ডু-ডু' পোকা আক্রমণ করেছে, সে স্থানটি দেখিয়ে দিলে তারা তৎক্ষণাৎ পোকা বের ক'রে ফেলে। অসাবধানতা-বশত যদি কেউ 'ডু-ডু' পোকার দংশনকে অবহেলা করে তবে দেখতে পাওয়া যায়, বাঁচতে হলে অঙ্গচ্ছেদ ছাড়া উপায় থাকে না। সেজন্যই আমি সকল সময় ও-বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকতাম। কোনমতে যদি বুঝতে পারতাম শরীরের কোথাও একটু চুলকোচ্ছে বা ব্যথা করছে তবে কাল-বিলম্ব না ক'রে কোন একজন নিগ্রোকে ডেকে দেখাতাম।

'অয়' পৌঁছাবার আগেই পথে একটি রেলস্টেশন পেয়ে গেলাম। শুনলাম সেই স্টেশনে কয়েকজন ভারতীয় কর্মচারী আছেন। রেলস্টেশনের কাছে পৌঁছে দেখলাম একটু দূরেই কয়েক খানা ঘর। এখানেই ভারতীয়রা থাকেন। মনে হয় তাঁরা যেন সবে নূতন ঘর তৈরী ক'রে বসবাস করছেন। আমাকে এক গুজরাটি তাঁর বাসায় দিন কয়েক থাকবার জায়গা দিলেন এবং আমার সঙ্গীরা সুখাদ্য খেয়ে এবং ভাল ক'রে বিশ্রাম করে শরীরটাকে কয়দিনেই আবার বেশ তাজা ক'রে নিল। আমিও কটা দিন ভাল খেয়ে ও ঘুমিয়ে শরীরের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠলাম। প্রায়ই দেখতাম, বিকালের দিকে আশেপাশের বন হতে হরিণ আসত এবং গ্রামের কাছেই ঘাস খেত।

এখানকার গুজরাটিরা সবাই হিন্দু এবং নিরামিষভোজী, এজন্য তারা বনের হরিণ দেখেই আনন্দ পেতেন, মারবার কোন চেষ্টা করতেন না। অন্য কেউ যদি হরিণ মারতে যেত তবে তাতে বাধা দিতেন। সেজন্যই বোধ হয় জায়গাটা কণ্ব মুনির আশ্রমের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাতে কিন্তু মাঝে মাঝে হরিণ তাড়িয়ে অন্যান্য হিংস্র জন্তুও ওদিকে আসত। সে সব জন্তুদের মধ্যে মাঝে মাঝে এক জাতীয় শৃগাল দেখতাম। তারা কোনো জীবকে বধ করে না। কোন পশু অন্য পশুকে হত্যা করে খেয়ে যা উচ্ছিষ্ট রেখে যায় তাই খেয়ে ওরা বেঁচে থাকে। এই জীবটিকে পূর্ববঙ্গে খাটাস বলে। আফ্রিকাতেও তার দর্শন পেয়ে বড়ই আনন্দ হল। স্টেশন ত্যাগ ক'রে আবার জংলী পথে রওনা হলাম এবং দুটো দিন অন্য আর এক গ্রামে কাটিয়ে আবার পায়ে হাঁটা পথ ধরে চলতে শুরু করলাম। লক্ষ্য 'অয়' নামক গ্রামের দিকে। পথের ধারে মাঝে মাঝে অনেক খালি ডাকবাংলো চোখে পড়তে লাগল কিন্তু সে সব বাংলোয় থাকার উপায় নেই। কেন না শুনেছি ডাকবাংলোয় শুধু ইউরোপীয়ানদেরই থাকবার অধিকার আছে। কথাটা শুনে আমার বড়ই দুঃখ হ'ল। যদি এসব ডাকবাংলোয় একটা রাতও কাটাতে পারতাম এবং ভাল ক'রে স্নান ক'রে জিরিয়ে নিতে পারতাম, তবে বোধ হয় পথক্লান্ত শরীরটা সুস্থ ও সবল হয়ে উঠতে পারত, শরীরে নতুন উদ্যম পেতাম। চলতে চলতে মাঝে মাঝে সাজানো ডাকবাংলোগুলোর দিকে চেয়ে চোখের কোণ দুটো জ্বালা ক'রে উঠত। নিষ্ফল আক্রোশে ও বেদনায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতাম। এই পীড়াদায়ক দৃশ্য না দেখার জন্যই সোজা পথ ছেড়ে বনের পথ ধরলাম।

আমাকে বনপথ ধরতে দেখে সাথীরাও যেন সুখী হ'ল। তারা যেন বনপথে দ্বিগুণ আনন্দে প্রবেশ করল। পথ চলেছি আর আনমনে কত

কি ভাবছি। পৃথিবী হতে একদিন হয়তো সাদা ও কালোর বৈষম্য দূর হবে, কিন্তু সেদিন আমি আর এ দুনিয়ায় থাকব না। যারা এই বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, তাদের প্রতি আমার মন রাগ ও বেদনার সংমিশ্রণে যেন পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল।

আমরা চলেছি জঙ্গলের পথ ধরে। বড়ই সুন্দর সে পথ। কিন্তু পথশ্রান্ত আমি, হাঁটতে যেন আর পারছিলাম না। অসহ্য পিপাসায় আমার গলা শুকিয়ে আসছিল। জঙ্গলের মাঝ দিয়ে কাঁটায় ভরা পায়ে-চলার দুর্গম পথ, এখানে বর্ণবৈষম্যের মর্ম-পীড়াদায়ক কাঁটা নেই। হঠাৎ চোখে পড়ল পথের ধারে গাছের নীচে একটা ছোট চিতাবাঘ একটা ছোট হরিণ মেরে দিব্য আরামে বসে খাচ্ছে। আশেপাশের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই তার নেই। এই অপূর্ব দৃশ্যটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম। মনে হচ্ছিল যেন একটা কুকুর একটা গরুর হাড় আরাম ক'রে চিবোচ্ছে।

'অয়' পৌছানোর আগেই আবার আমরা সড়ক ধরে চলতে লাগলাম। আমার কষ্ট দেখে নিগ্রোরা আমাকে ছেড়ে দিতে চাইল। কিন্তু আমার মন তাদের ছাড়তে চাইছিল না। পথ চলার পর ক্লান্ত হয়ে যখন শুয়ে পড়তাম তখন পদসেবা করতো তারাই। পথের খবর তারাই রাখত, আমি শুধু কষ্ট ক'রে এগিয়ে চলতাম। বনের মাঝে তারাই আমার জন্য বিশ্রামের শয্যা বিছিয়ে দিত, পিপাসায় কণ্ঠ শুকিয়ে গেলে তারাই এনে দিত তৃষ্ণার জল। অথচ প্রতিদানে তারা পেতো শুধু আমার শুক্‌নো মুখের একটুখানি হাসি, তার চাইতে বেশী কিছুই নয়। মাঝে মাঝে ভাবতাম আমি যেন লিভিংস্টোন আর ওরা আমার সাহায্যকারী।

'অয়' হতেই উঁচু ভূমি শুরু হয়েছে। উঁচু ভূমিতে ভারতবাসী জমি কিনতে পারে না, আপন ইচ্ছামত ঘর তৈরী করতে পারে না; ভারতবাসী ডাক-বাংলোতে গিয়ে টাকা খরচ করেও থাকতে পারে না। আরও যে কত

অসুবিধা রয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের ওসব বালাই ছিল না। আমরা চলেছিলাম জংলী পথে, আমাদের এসব আর চিন্তাও করতে হত না। জঙ্গল পরিষ্কার করেই শহর গড়া হয়েছে এবং তাতে আনা হয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার, আর তাকেই বলা হয়েছে সভ্যতা।

সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে চড়েছিল, পথ ছেড়ে তখন আবার আমরা জংলী পথে এলাম। সেদিন দুপুর বেলাতেই বনের পাশে বিশ্রামের বন্দোবস্ত করা হ'ল। এদিকে তারুর সাথী জল আনতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফুটে চিৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল। আমি তারুকে বলেছিলাম আগুনটা যেন ছোট করেই করা হয়, তারু তা না ক'রে, স্থানের ভয়াবহ অবস্থা বুঝতে পেরে, আমাকে না জিজ্ঞাসা করেই আগুন জ্বালিয়ে তাতে কতকগুলো কাঁচা ডাল এনে চাপিয়ে দিল। ছোট ছোট ডালগুলি পট্ পট্ ক'রে জ্বলে উঠল। যার পায়ে কাঁটা বিঁধেছিল সেও উঠে বসল এবং তার সঙ্গীদের কি যেন বলল। তারু এসে আমায় বলল, "এ জিজ্ঞাসা করছে, কোনো জন্তু যদি আক্রমণ ক'রে তবে তাকে ফেলে রেখে আমরা পালাব না ত?" আমি বললাম, "বলে দে তারু, আমি ইউরোপীয়ান নই, ভারতীয় ব্যবসায়ী অথবা কেরাণীও নই, আমি মানুষ, তোদের মতই। আমি একে ফেলে কোথাও যাব না।"

সুখের বিষয়, দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কোন জন্তুজানোয়ার আমাদের কাছেও এল না। বিকালে তিন জনে মিলে কতকগুলি কাঠ জমালাম এবং সূর্য অস্ত যাবার আগেই আগুনটাকে বড় ক'রে তুললাম যাতে অনেকদূর হতে সেই আগুন দেখা যায়। অনেক রাত পর্যন্ত লাকড়ি পুড়িয়ে সাথীরা একটু দুর্বল হয়ে পড়ল। তারপর আমিও উঠে আগুনে লাকড়ি দিয়ে দিয়ে যখন বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম তখন তারুকে ডেকে বললাম, "এ

সময়ে তুমি যদি উঠে একটু দাঁড়াও ভাই, আমি বড়ই ক্লান্ত।" ঘুমকাতর চোখে তারু টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল এবং এক-একটা শুক্না ডাল আগুনে দিতে গিয়ে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল। তার চীৎকার শুনে আমরা সকলে ধড়ফড় ক'রে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে বসলাম এবং ব্যাপার কি উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তারু বলল সে একটি ঔষধ পেয়েছে যা আমাদের সাথীটির পায়ের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ বিষক্ষয় হয়ে যাবে। বলেই কি একটা বুনো গাছের টুকরা দেখাল এবং সেই টুকরাটা লোকটির ক্ষতস্থানে জোর ক'রে চেপে বসিয়ে দিল। বোধ হয় আধ ঘণ্টাও হয় নি গাছের টুকরাটা লোকটার ক্ষতস্থানে একরূপ এঁটেই বসেছিল, তারপর যখন তা খসে পড়ল তখন সেটি আগুনে ফেলে দেওয়া হ'ল। তারুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আর সেরকম ডাল আছে?" সে বলল, "না, আর নেই, বন্যার জলে ভেসে এসেছিল কোথা হতে পচা একটি মাত্র ডাল।" পচা বৃক্ষের ছোট্ট একটি ডালের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে আমার তাক লেগে গেল।

সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে উলু নামক একটি ছোট রেল স্টেশনে এসে হাজির হলাম। স্টেশনে মাষ্টার একজন ভারতীয় গোয়ানী। তিনি আমার থাকবার এবং খাবার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। কিন্তু আমার সাথীদের জন্যে তিনি কিছুই করলেন না দেখে আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। আমি তাঁকে বললাম, "ওরা আমার সাথী, ওদের জন্যেও আপনাকে কিছু করতে হবে।" তিনি আমাকে বললেন, "আপনার সাথী যদি একটা বানর অথবা বেবুইন হয় তবে তার বন্দোবস্ত আপনিই করবেন!" আমি আর কথা না বলে সাথীদের সঙ্গে নিয়ে নিকটস্থ এক নিগ্রো গ্রামে গিয়ে হাজির হলাম। সুখের বিষয়, ষ্টেশন মাষ্টারের কাছ থেকে টিনের দুধ, চাল, চিনি, চা, টিনে ভর্তি মাছ কিনে নিয়ে দিলাম। সিগারেট একশতও কেনা

চিড়িয়াখানায় জীবনে একাধিকবার গিয়েছি এবং কলকাতার চি ব
আমরা যখন প্রবেশ করি তখন আমাদের একটা প্রবেশমূল্য
তারপর সেখানে যে সব জীবজন্তু দেখি তাও সব খাঁচার মা
থাকে—স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে তাদের দেওয়া হয় না অ
শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। বাঁদরগুলি যখন কিচির মিচির ক
আমরা তাদের চানা মটর কিনে দিই কিন্তু আফ্রিকার এই স্বাধীন রে
খানায় কোনও জন্তুকে কিছু কিনে দিতে হয় না। তারা স্বাধীন ব
আপন খাদ্য নিজেরাই খুঁজে বের করে। হরিণ একটা দুটো না
হাজার হরিণ এক সঙ্গে চলেছে; তেমনি চল্‌ছে বন-গরু, দ
উটপাখী, জেব্রা, জিরাফ। তাছাড়া অন্যান্য আরো হিংস্র জী
দিনের বেলায় কিন্তু সব গা ঢাকা দিয়ে থাকে, রাত্রে বের হয় এ
মত খাদ্য সংগ্রহ ক'রে আপন আপন আস্তানায় ফিরে যায়।
বা সব চাইতে আশ্চর্যকর দৃশ্য হ'ল যখন মাথা দুলিয়ে জিরাফ
দলে এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় যেতে থাকে তখন মনে হয়
ময়দানটার মাঝে মাঝে যেন কতকগুলি বাঁকা গাছ চলে যাচ্ছে
দৃশ্য আমি দেখতাম পথের আশে-পাশে। দুপুর বেলায় যা
লাগত তখন আরও কত রকম দৃশ্য দেখতাম তার অন্ত ছিল না
সব দৃশ্য দেখে অনেক সময় মনে হত একি স্বপ্ন দেখছি? এং
এল কোথা হতে? ভুলে যেতাম আমি পশুদের রিজার্ভ্‌ড বাসভূমি
দিয়ে চলেছি।

রিজার্ভ কথাটার অর্থ জানা নেই, দক্ষিণ আফ্রিকার গাড়িতে
জন্য রিজার্ভ্‌ড কামরা আছে, তাতে কোন ইউরোপীয়ান ঢুকে
করবে না। কেনই বা প্রবেশ করবে? যেখানে সব দি
লোকেরা বসে, সেখানে কি যেতে আছে? মালয়দেশে মা

ংগা রিজার্ভ্‌ড আছে। মালয় জাত বড়ই অলস বলে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাদের
্য পৃথক এলাকা নির্দেশ করে দিয়েছেন। সেখানে ভারতবাসী, চীন,
পানী, ইউরোপীয়ান কেউ গিয়ে বসবাস করতে পারে না, কেউ তাদের
মি কিনতে পারে না, কেউ যদি তাদের টাকা কর্জ দেয় তবে জমি বাড়ি
ছুই ক্রোক করতে পারে না। আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ানদের জন্যও
জার্ভ্‌ড জায়গা আছে। সেখানে একমাত্র রেড ইণ্ডিয়ান ছাড়া আর কেউ
সবাস করতে পারে না, এমন কি নিগ্রোরাও যেতে পারে না। রেড
ানদের শিক্ষাদীক্ষা নাই, তারা বর্তমান জগতের চালাকি মোটেই
ঝ না, তাই তাদের জন্যও রিজার্ভের ব্যবস্থা রয়েছে। আফ্রিকাতে
প পশুদের জন্যও রিজার্ভএর ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে তারা
ন্দ বিচরণ করে বনের নিয়ম মেনে; মানুষের রিজার্ভের মত পরাধীন-
শিকল চরণে এঁটে নয়—স্বাধীনভাবে, মনের অফুরন্ত আনন্দে।
নের আইন কানুন প্রায় মানুষের মতই। যার যত শক্তি, সে-ই
য়ে হীনবলকে হত্যা ক'রে খেয়ে ফেলে। আফ্রিকার জঙ্গলে
রিজার্ভে বন্য মহিষ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জীব। অনেক সময় দেখা যায়
হের কাছে একটা সিংহ হার মেনে নির্জনে গিয়ে বসে আছে।
ার মানুষের একের নম্বর শত্রু। মহিষ যদি মানুষকে দেখতে
পেছনে ছুটতে শুরু করে এবং যে পর্যন্ত মানুষটাকে হত্যা
তক্ষণ মহিষের বিশ্রাম নেই।
্য রিজার্ভে যদি মহিষ হত্যা করা হয় তবে কেনিয়া সরকার
রীকে কোনরূপ শাস্তি দেন না। সিংহ অথবা অন্য
হত্যা করলে সরকার থেকে আপত্তি ওঠে এবং কেন হত্যা
তার যথোপযুক্ত কারণ দর্শাতে হয়।
মধ্যে আর এক জাতীয় জীব বাস করে এবং তাদের সবাই

ভয় করে। তার নাম হ'ল হাতী। হাতীর পাল বড় বড় সিংহকে যখন একযোগে আক্রমণ করে তখন সিংহ ভয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য হয়। নেকড়ে বাঘ জঙ্গলে চুপ ক'রে থাকে। সুখের বিষয় এখানে হাতী নেই, হাতী থাকে জলাভূমির কাছে। মাঝে মাঝে জলাভূমি পরিত্যাগ ক'রে যখন শুষ্ক ভূমিতে এসে দেখা দেয়, তখন বনের রাজা সিংহও বন ছেড়ে লেজ গুটিয়ে কোথায় চলে যান তার ঠিক থাকে না। হাতীকে ভয় করে না বানর। সুযোগ পেলেই বানরের দল হাতীর পালে গিয়ে যোগ দেয়। হাতীও বানরের পাল পেলেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। বানর হাতীর গায়ের যত রকম উকুন তা ধরে খায়। কি সুন্দর সেবা হাতীর জন্য বানররা ক'রে থাকে তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। অথচ হাতী যদি ইচ্ছা করে তবে এক নিমিষে বানরের দলকে ইহধাম হতে বিদায় করতে পারে। একেই বলে বনের আইন-কানুন। পশুদের জীবনযাত্রা স্বচক্ষে যা দেখেছি তা এই ক্ষুদ্র বই-এ সবিস্তারে লেখা সম্ভব নয়।

আমাদের সাথীর পায়ের ঘা শুকিয়ে গেছে। তাকে বলেছিলাম, যদি কোনরূপ ঔষধের গাছ পায় তবে যেন সে আমার জন্য এনে রাখে। কিন্তু দু'বেলা সে গিনি ফাউল এনে হাজির করতে লাগল। তাকে কখনও রান্না করতে আমি দিতাম না। সে কাপড় কাচার কাজই করত এবং যখনই সুযোগ পেত ঢিল ছুঁড়ে গিনি ফাউল হত্যা করত। কি নরম এবং সুস্বাদু সে মাংস!

কয়েকদিন বন্যজীবন কাটিয়ে আর ভাল লাগল না। একদিন একটি রেল স্টেশনে গিয়ে একখানা টিকিট কিনে নাইরবী চলে যাব ঠিক করলাম। তারু প্রথমে আপত্তি করতে লাগল কিন্তু যখন তাদের বুঝিয়ে বললাম যে আমার টাকার দরকার তখন তারু আর তার সঙ্গীরা আমার কাছ থেকে

বিদায় নিতে স্বীকৃত হ'ল। কথা রইল ফের যদি মোম্বাসা যাই তবে তাদের খুঁজে বের করব। তারু বলল পেটেল সমাজের বাড়িটার কাছেই সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। যথা সময়ে ট্রেনে এসে চাপলাম। তাদের ফিরে যাবার খরচ দশ শিলিং দিয়ে এতদিনকার সুখদুঃখের সাথীদের অশ্রুসজল নয়নে গাড়ির দরজা হতে বিদায় দিলাম। এরূপ বন্ধুত্ব এবং বিদায় এ জীবনে কত হয়েছে তার হিসাব নেই।

নাইরবী স্টেশন দেখবার মত স্থান। গাড়ি হতে নেমে একখানা চালা ঘরের মধ্যে গেলাম। সাইকেলে পিঠ ঝোলাটা বেঁধে ভাবতে লাগলাম, এসব চালা ঘর কিসের জন্য তৈরী হয়েছে। এতে কি গরু রাখা হয় বিদেশে চালান দেবার জন্যে? না, গরুর জন্য এসব চালা ঘর নয়। আমাদের জন্য, নিগ্রোদের জন্য এসব চালাঘর ওয়েটিংরুম রূপে ব্যবহৃত হয়। কতকগুলি অর্ধনগ্ন নিগ্রো তাদের তল্পি-তল্পা নিয়ে একটা চালা ঘরে বসে ছিল। এসব দেখে মনে হতে লাগল নিগ্রোদের মানুষ বলেই স্বীকার করা হয় না, কোনদিন হবে কিনা, কে বলতে পারে? বেশীক্ষণ দাঁড়ালাম না, চললাম শহরের দিকে। ভাবতে লাগলাম, আমরাও অনেককে মানুষ বলে স্বীকার করি না। যে দোষে দোষী বলে অপরকে নিন্দা করছি, সেই দোষ আমাদের মধ্যেও আছে।

আর্য সমাজ গৃহে থাকব আগে হতেই ঠিক করেছিলাম, তাই আর্য সমাজের বাড়িটা খুঁজে বের ক'রে তাতেই থাকবার বন্দোবস্ত করলাম। এখানকার আর্য সমাজ কিন্তু ভারতের আর্য সমাজের মত নয়। আর্য সমাজের চক্ষু খুলেছে, তাই যে কোন ভারতবাসী জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এখানে স্থান পেয়ে থাকে। সেদিনের মত বিশ্রাম ক'রে পরের দিনে নাইরবী শহরটা বেড়াতে বের হয়েছিলাম।

আর্য সমাজে আমাকে একখানা ছোট সুন্দর ঘরে থাকতে দেওয়া

হয়েছিল। ঘরখানিতে আমার যথাসর্বস্ব রেখে একটি নিগ্রোকে ডেকে আনলাম। আমার শরীরের কোথায় কোথায় 'ডুডু' পোকা প্রবেশ করেছে তাকে তা বের ক'রে দিতে বললাম। লোকটি আনন্দের সঙ্গে আমার শরীর হতে 'ডুডু' বের ক'রে দিল। সে-ই আমাকে গরম জল ক'রে দিয়েছিল, তা দিয়ে স্নান ক'রে শরীরের ব্যথা অনেকটা কমেছিল।

অনেক দিনের পর একটি ভাল বিছানা পেয়ে এবং গরম জলে স্নান করাতে নিদ্রা আপনি এসে দেখা দিল। কি সুখের সেই নিদ্রা। ঘুমিয়ে রাতটা কেটে গেল। সকালে 'স্ট্যাণ্ডার্ড' নামক একখানা মাসিক সংবাদপত্র কিনে নিয়ে চললাম একটি রেঁস্তোরায়। রেঁস্তোরাটি ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত এবং ভারতীয়দের জন্যই। এদেশে রেঁস্তোরায় বসে সংবাদপত্র পাঠ করে না। আমাকে রেঁস্তোরায় সংবাদপত্র পাঠ করতে দেখে কয়েকজন ভারতীয় জিজ্ঞাসা করল, আমি কখনও এদেশে এসেছি কিনা। তাদের কথার জবাব দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রেঁস্তোরায় সংবাদপত্র পাঠ কবলে কি দোষ হয়? একজন বলল, "এই যে কাফেরগুলো (নাইরবীতে নিগ্রোদের কাফের বলা হয়) দেখ্‌ছেন, তারা সংবাদপত্র পাঠ ক'রে হয়তো ক্ষেপে যাবে, তখন আমাদের কি অবস্থা হবে?" আমি ভাবলাম হয়ত তাই হবে। মনে হ'ল কবিগুরুর কথা, যিনি আমাকে আফ্রিকা যাওয়ার সময় বলেছিলেন, "দেখ রামনাথ, নিগ্রো চরিত্রে যা ভাল দেখবে তাই বয়ে নিয়ে আসবে।" নিগ্রোচরিত্রে কি আর ভাল দেখব—মনিব হতে গোলাম পর্যন্ত সবাই-নিগ্রো নির্যাতনে পরম উৎসুক।

কেনিয়াতে ভারতবাসী মাত্রই স্থানীয় কংগ্রেসের অনুগত। এখানকার কংগ্রেস এমন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান যে তার ডাক সবাই শুনতে বাধ্য হয়। না শুনে উপায় নেই। আগা-খানি দল পর্যন্ত কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দেয় কারণ তাদেরও 'ধান্দা' অন্যান্য ভারতবাসীদের সঙ্গে

এক রশিতে বাঁধা। 'ধান্দা' মানে ব্যবসা। যদি ইণ্ডিয়ানদের ব্যবসা আজ বন্ধ হয়ে যায়, তবে এদেশে ভারতবাসীর অবস্থা ইহুদিদের মতই হবে। হাই ল্যাণ্ডে ভারতবাসী জমি কিনতে পারে না। মহামান্য আগা খাঁ যখন কেনিয়ার উঁচুভূমিতে চাযের জমি কিনতে চেয়েছিলেন, কেনিয়া সরকার তাঁকে সে অধিকার দেন নি। অপরাপর ভারতবাসীর কথা এ সম্বন্ধে আর উঠতেই পারে না।

নাইরবীতে আজকাল ইণ্ডিয়ানরাও একটু আধটু মজুরী করতে শুরু করছে। ইণ্ডিয়ানরা মজুরী পায় মধ্যম শ্রেণীর। নিগ্রোরা পায় তৃতীয় শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর মজুর (সব সময়ই ইউরোপীয়ান) যদি পায় এক শত টাকা, তবে ইণ্ডিয়ান পায় পাঁচ টাকা আর নিগ্রো পায় দু আনা। এই হ'ল প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর মজুরের তফাৎ।

নাইরবীর কথা এখন থাক। আমার মনটাও নাইরবী ছেড়ে অন্যত্র যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। তাই একদিন সুপ্রভাতে নাইরবীকে পেছনে রেখে এগিয়ে চল্লাম। এবার আমি একা। আমি চলছিলাম কিজাবীর দিকে। দ্বিপ্রহরে শহরে পৌছে উঠলাম গিয়ে টিকুউ গ্রামের ভারতীয় পোস্ট মাষ্টারের ঘরে।

পরদিন কিজাবীতে গিয়ে পৌছলুম। কিজাবী আমার কাছে যদিও নূতন তবুও মনে হ'ল যেন বহু পুরাতন। রেল ষ্টেশনের পেছনেই দেখলাম উঁচু পর্বতমালা আরও এগিয়ে চলেছে। পর্বত ঘন-কুয়াশায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল। কুয়াশা পর্বত-গাত্র থেকে নেমে এসে ঘরের ভিতর পর্যন্ত আসছিল। মুখ হতে ধোঁয়া বের হচ্ছিল, শরীর শীতে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিল। শীত থেকে রক্ষা পাবার জন্য উঠলাম গিয়ে রেলওয়ের এশিয়াটিক বিশ্রাম গৃহে।

ঘরখানা আট ফুট লম্বা, ছয় ফুট চওড়া। তারই মধ্যে একটা খাট।

খাটে স্প্রিং এবং তার উপর গদি। আমার সঙ্গের চাদরটা তাতে বিছিয়ে কম্বল গায়ে দিয়ে হাতকে বালিশ ক'রে কতক্ষণ বিশ্রাম করার পর গ্রামে গেলাম। গ্রামে গুজরাটি এবং পাঞ্জাবীরা বাস করে। নিগ্রোরা সেই গ্রামে থাকতে পারে না। এক পাঞ্জাবীর বাড়ীতে রাত কাটালাম। সকালে প্রস্রবণের গরমজলে স্নান করতে যাব ঠিক হয়েছিল। পাঞ্জাবী ভদ্রলোক উর্দু এবং পাঞ্জাবী ভাষায় পণ্ডিত। এদিকে গ্রন্থিকের কাজও করেন। গ্রামের পাশেই আর একটা গ্রাম। এই গ্রামে সোমালী এবং নিগ্রোরা বাস করে। পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে একটি সোমালী ছেলে দিয়ে বললেন, "এই ছেলেই আপনার গাইড, এ ইংলিশ বেশ বলতে পারে।" আমি তাকে নিয়েই পর্বতের দিকে রওনা হলাম।

পর্বত বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ। মাঝে মাঝে যেন পাহাড়ে আগুন লেগেছিল বলে মনে হয়। পোড়া পাথর ও পোড়া মাটির স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। পোড়া মাটি এবং পোড়া পাথর এ জীবনে অনেক দেখেছি সত্য কথা, কিন্তু এখানে আগ্নেয়-পর্বতের সজীবতা বেশ ভাল ক'রেই অনুমান করতে পেরেছিলাম। ক্রমাগত এক ঘণ্টা চলার পর আমরা একটা উষ্ণ প্রস্রবণের কাছে পৌঁছলাম। নিগ্রো যুবক আমাকে তথায় স্নান করতে বলল। গা-সওয়া গরম জলে বসে আমি স্নান করতে লাগলাম। যুবক আমাকে স্নানের জায়গা দেখিয়ে দিয়েই নির্জনে বসে একটা নিগ্রোবাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগল। সেই বাজনায় কোনরূপ অপ্রাকৃত সুর না থাকায় আমার কাছে বেশ লাগছিল। আমরা যেমন ক'রে গান গাই তা অপ্রাকৃত। এতে জোর ক'রে লালিত্য আনা হয় কিন্তু প্রাকৃতিক সুর অন্য রকমের, তাতে সুর আপনা হতে আসে এবং সকল ক্ষেত্রেই সকলের উপযোগী হয়।

একদিকে গানের মৌলিকত্ব নিয়ে চিন্তা, অন্য দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এ দু'টি বিষয় আমাকে আফ্রিকার কথা ভুলিয়ে সীতাকুণ্ডের কথাই বার-

বার মনে করিয়ে দিচ্ছিল। স্নান ক'রে ওঠবার সময় দেখি আমার কোমর হতে নীচের দিকটা ফুলে গিয়ে দ্বিগুণ অথবা তিন গুণ বড় হয়ে গেছে। হঠাৎ যদি শরীরের এইরূপ পরিবর্তন হয় তবে লোকে সাধারণত হা-হুতাশ করে এবং ভগবানকে ডাকতে থাকে, আমি সেরূপ কিছুই করলাম না; চিন্তা হয়েছিল গ্রামে যাই কি ক'রে। আমার চলবার ক্ষমতা মোটেই ছিল না। কোন রকমে গামছাটা জড়িয়ে নিয়ে নিগ্রো যুবককে চীৎকার ক'রে ডাকলাম। অনেকক্ষণ চীৎকার করার পর তার ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। নিগ্রোরা যখন তাদের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে আরম্ভ করে তখন ওদের বাহ্যজ্ঞান লোপ হয়ে আসে। সে সম্বন্ধে আমার নানা অভিজ্ঞতা ছিল। তাই আরও চিন্তিত হয়ে পড়ছিলাম এবং ভাবছিলাম কেন যুবককে বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে ক'রে আসতে দিলাম। নিজের উপর নিজেরই রাগ হতে লাগল। অনেক চীৎকার করার পর সে এল। আমার শরীরের অবস্থা দেখে তার চিন্তা তো হ'লই না, বরং সে দাঁত বের ক'রে হাসতে লাগল। তার হাসি দেখে আমার আরও রাগ হ'ল। কাছে এসে আমাকে ওঠাতে বললাম। অতি কষ্টে সে আমাকে গরম জল হতে উঠিয়ে শুক্‌না জায়গায় বসালো। যদি সঙ্গে ক্যামেরা থাকত এবং শরীরের একটা ফটো ওঠাতে পারতাম তবে সেই ফটোটা হ'ত এক আশ্চর্য জিনিস। যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, বল তো এখন কি ক'রে ফিরে যাই? সে বলল, এ সম্বন্ধে সে কিছুই বলতে পারবে না। অনেক চিন্তা ক'রে লোকটিকে আমার কোটের পকেট থেকে একখানা কাগজ আনতে বললাম এবং তাতে যা লিখে ছিলাম তারই অবিকল নকল এখানে দেওয়া হ'ল। একখানা পত্র লিখেছিলাম রোমান হিন্দিতে।

Hamara Badan Suj-Giya, Jaldi Ekh Char-pai Laykey'
Char Admi Ana, Cholne Nehe Sekta, Ramnath.
Stan—Garam Chasma.

Time—Ekh Bajke Ponoro Minute.

রোমান হিন্দিতে চিঠি লেখার নানা কারণ ছিল। গুজরাটি এবং পাঞ্জাবীরা কেউই ইংলিশ জানত না, আমি ওদের ভাষা বলতে পারতাম কিন্তু লিখতে জানতাম না। অনেক চিন্তা ক'রে রোমান অক্ষরে হিন্দিতে চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। পত্র লেখার ফলও ভালই হয়েছিল। আমাকে নিয়ে যাবার জন্য চারজন শিখ এবং ছয়জন গুজরাটি একটি চারপাই নিয়ে এসেছিলেন। নিগ্রো যুবককে বিদায় দিয়ে আমি অকেজো হয়ে বসে থাকি নি। আমার কাছে একটি ছোট্ট আগুন জ্বালিয়ে তাতে শরীরটাকে সেঁকৃতে লাগলাম। পায়ের দুটো পাতা দশ মিনিটের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছিল। তারপর গামছাখানাকে আগুনে গরম ক'রে যতদূর সম্ভব শরীরে সেঁক দিতে লাগলাম। এতে আমার অনেকটা আরাম বোধ হচ্ছিল। গ্রাম থেকে লোক যখন এল, তখন আমি চলতে সক্ষম হয়েছিলাম। পাহাড় থেকে নামবার ক্ষমতা তখনও হয়নি। চারপাই-এ করেই আমাকে সমতল ভূমিতে গিয়ে নামতে হয়েছিল। গ্রামের লোককে বিদায় ক'রে দিয়ে ধীরে ধীরে নিগ্রো যুবকের হাত ধরে চলতে লাগলাম।

এ অঞ্চলে অনেক ইউরোপীয়ান বাস করে। একজন শিকারী ইউরোপীয়ান আমাকে নিগ্রো যুবকের হাত ধরে চলতে দেখেছিল এবং কাছে এসে বলেছিল নিগ্রোর হাত ধরে ইণ্ডিয়ানদের চলতে নেই। যখন ইউরোপীয় লোকটি আমার দুর্দশার কথা শুনলো তখন আর আমাকে বাধা দিল না। নিগ্রো যুবক কিন্তু আমাদের কথায় বেশ দুঃখিত হয়েছিল। আমি তখন রাগ ক'রে বলেছিলাম, এ কথা বেশ বুঝতে পার কিন্তু কি ক'রে গ্রামে যাব তা বুঝতে পার নি? ইউরোপীয় যা বলেছে ঠিক বলেছে, তোমাদের সংস্পর্শে থাকলে আমিও তোমাদের মতই হয়ে যাব। যুবক

সে কথার উত্তর দিতে না পেরে বলল, তখন আমার কি করা উচিত ছিল মিস্টার? আমি বললাম, তখন তোমার উচিত ছিল আমাকে সাহস দেওয়া এবং না হাসা। সন্ধ্যার পূর্বেই গ্রামে ফিরে এসে আবার গরম জলে ভাল ক'রে স্নান করাতে আমার সকল রোগের অবসান হয়েছিল।

রাত তখন আটটা হয়েছে। আমি রেল স্টেশনের এশিয়াটিক রুমটাতে বসে ম্যাপ দেখছিলাম। এমন সময় একজন ভীমাকৃতি শিখ এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন এবং বললেন, "অডি"? 'অডি' মানে, ভেতরে আসতে পারি কি? দরজা খুলে দিয়ে ভদ্রলোককে বসতে দিলাম। তিনি সময় নষ্ট না ক'রে আমাকে পোশাক পরতে বললেন। কোন চিন্তা না করে অন্ধকার রাত্রে ঘর হতে বের হয়ে পড়লাম। কোথায় কি করতে হবে যদিও আমার জানা ছিল না, তবুও আমি এটা জানতাম যে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ানের প্রাণনাশ করবে না। কতক দূর যাবার পর শিখ ভদ্রলোক তার পরিচয় দিল। সে শুনেছিল আমি এখানে আছি, তাই সে আমাকে দেখতে এসেছিল এবং আমার সাহস আছে কিনা তাও পরীক্ষা করতে চাইছিল। বাস্তবিক সে একজন স্পোর্টস্‌ম্যান।

গ্রাম ছেড়ে আমরা নিগ্রোদের গ্রামে এলাম। তিনজন দীর্ঘকায় নিগ্রো পিতম সিং-এর অপেক্ষায় ছিল। আমরা সেখানে পৌঁছানো মাত্রই তারা গাড়িতে উঠল এবং আমার হাতে একটা বন্দুক এবং কয়েকটা সিংহ মারার বুলেট দিয়ে বলল, ভয়ের কোন কারণ নেই, আমরা এখন নরকে যাব। সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবার একটা কারণ আছে। সেখানে গিয়ে সব বলব। কিন্তু মনে রেখো, যে পথে আমরা চলেছি তা ভয়ানক দুর্গম পথ। প্রত্যেক মুহূর্তে প্রাণ যাবার ভয় আছে। এই পথ বন্যজীবে ভর্তি। যদি ভুলে সিংহের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেই তবে আর

বাঁচবার কোন উপায়ই থাকবে না। কথার স্থচনা দেখেই বুঝলাম, বিপদের কোন কারণ নেই। আমি বললাম, বেশী কথা বলে কি লাভ, চল না এখনই বেরিয়ে পড়ি। পিতম সিং দেরী না ক'রে কয়েকখানা "মাকাটি" অর্থাৎ রুটি নিল এবং কতকটা পানীয় জল একটা টিনে বোঝাই ক'রে নিল।

লরীটার "বডি" অন্যান্য গাড়ির মত নয়। ভেতরে মোটা লোহার পাত দিয়ে মোড়া, কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না যে ভেতরে এরূপ রক্ষা কবচের বন্দোবস্ত আছে। আমরা দুজনে সামনে বসলাম। পেছনে দুটি নিগ্রো দুটো বন্দুক নিয়ে মেসিনগানের মত ক'রে বসে রইল। সেই দুর্গম পথ দিয়ে আমাদের মোটর চলল। ঘণ্টা খানেক চলার পরই পথের দুদিকে ছোট ছোট আলো দেখতে পেলাম। কিছুই জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা হ'ল না, কিন্তু হঠাৎ পিতম সিং মোটরের বেগটা থামিয়ে দিয়ে তার বন্দুকটা নিয়ে কয়েকবার গুলি ছুঁড়ল। এতে পাশের বাতিগুলি একদম নিভে গেল। সে-ই আপনা হতে বলল, অনেক চিতা আমাদের চারিদিকে ছিল, ওদের একটু তাড়িয়ে দিলাম, ভাল করি নি? আমি বললাম, নিশ্চয়ই, এখন এগিয়ে চলুন। এগিয়ে চলা আমাদের হ'ল না। পেছন থেকে একজন নিগ্রো গাড়ি থেকে নেমে কতকটা পেট্রোল নিয়ে ঘাসের উপর ছড়িয়ে দিল এবং তাতে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ছুঁড়ে দিল। আগুন দাউ দাউ ক'রে জলে উঠল। আগুনটা যখন বেশ ভাল ক'রে জলে উঠল তখন পাশের জঙ্গলে যেন ভূমিকম্প শুরু হ'ল। চারিদিকের গাছ ভেঙ্গে জংলী হাতীর দল পালাতে লাগল। আফ্রিকার জঙ্গলে চিতা বাঘ পেছন দিক হতে যাকে তাকে আক্রমণ ক'রে বসে, সেজন্য এই জানোয়ারকে যখনই যে পায় তখনই হত্যা করে। হাতীও তদ্রূপ, মানুষ পেলেই আক্রমণ করবে এবং পিষে ফেলবে, এটা হ'ল এদের

চরিত্রগত দোষ, কিন্তু হাতীকে যতটুকু পারা যায় ততটুকু মানুষ এড়িয়ে চলে। পিতম সিংও হাতীর দলকে কড়াবার জন্য গুলি ছুঁড়েছিল, তারপর বনে আগুন লাগিয়ে দিয়ে হাতীকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

নাইরবী হতে কিজাবী, নরক, মারা, হয়ে লাংগরেন পর্যন্ত একটি সরকারী রাস্তা গিয়েছে। তারপরই রাস্তার শেষ, আমরাও স্বাধীন হলাম; কারণ জঙ্গলের মাঝে বৃটিশ রাজত্ব ছিল না, এর পর হতেই পার্বত্য জাতির বাস। আজ পর্যন্ত কেউ পার্বত্য জাতির কাছ থেকে কোনরূপ ট্যাক্স আদায় অথবা আইন ও শৃঙ্খলা প্রচলন করতে সক্ষম হয় নি। বনের জানোয়াব যেমন স্বাধীন, এই অঞ্চলে যারা বাস করে তারাও তেমনি স্বাধীন। সভ্য দেশের লোক স্বাধীনতার জন্য চীৎকার করে, এখানে সেই বালাই নেই। বন জঙ্গলের স্বাধীনতার স্বরূপ কি তা সকলে জানে না।

পথে একজন পাঞ্জাবী হিন্দু আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। লাংগরেন ছাড়ার পূর্বে লোকটি প্রচুর পরিমাণ খাদ্য এবং অনেকগুলি বুলেট যোগাড় করেছিলেন। শিখ ড্রাইভার, পাঞ্জাবী হিন্দু এবং তিনজন নিগ্রো—সকলে আপন আপন মতলব মত কাজ করবার ফন্দি আঁটছিল, শুধু আমি নিশ্চিন্ত মনে অন্ধকারের আফ্রিকার কথাই ভাবছিলাম। গ্রাম পরিত্যাগ ক'রে আমি নিবিড় বনে প্রবেশ করি নি। আমি নিবিড় বন দেখতে পাব আশা করছিলাম, কিন্তু কোন বনই আমার সামনে আসছিল না, যতদূর দেখতে পাচ্ছিলাম তা শুধু পর্বতমালা। পর্বতমালায় উচ্চ বৃক্ষ একটিও ছিল না, নদী নালা যেখানে যত গড়ে উঠেছে সেখানে শুধু কয়েকটি ঝোপ, ঝোপের ভিতর দিয়ে হয় প্রস্রবণ নতুবা কল্লোলিনীর জল বয়ে যাচ্ছিল। অনেক কল্লোলিনীর জল পরিষ্কার ছিল। আবার অনেক নালায় দুর্গন্ধময় ঘোলা জল কল কল ক'রে বয়ে যাবার

চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

এরূপ দুর্গন্ধযুক্ত একটি কল্লোলিনীর কাছ দিয়ে যাবার সময় সাথীদের জিজ্ঞাসা ক'রে অবগত হলাম, এখানে একটি হাতী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। সাথীদের মোটর লরী থামাতে বলায় তারা বলল এরূপ স্থানে কোন মতেই যাওয়া উচিত নয়। এসব স্থানে নানারূপ হিংস্র জীব ত থাকেই, উপরন্তু একরূপ বোলতা থাকে যারা সাধারণত পচা হাতীর মাংসেই ডিম প্রসব করে। পচা হাতীর কাছে গেলেই তারা তাজা মাংসের মধ্যেও হুল ফুটিয়ে ডিম প্রবেশ করিয়ে দেয়। সে ডিম ডাক্তারগণ শরীর থেকে বের করতে পারেন সত্য কথা, কিন্তু সকল সময় অপারেশন কৃতকার্য হয় না। শিখ ভদ্রলোক পরিশ্রান্ত থাকায় তিনি মোটর থামাতে রাজি হলেন। আমি বিনা অস্ত্রে ঝোপের দিকে রওনা হলাম।

দূর থেকে ঝোপ কাছে বলেই মনে হয়, কিন্তু পায়ে হেঁটে যেতে কষ্ট হয় এবং ঝোপগুলি যে অনেক দূরে তা বুঝতে পারা যায়। ক্রমাগত এক ঘণ্টা চলে যখন ঝোপের কাছে গেলাম তখন বুঝলাম এটা ঝোপ নয়, একটা বিরাট বন। এই বনে প্রবেশ করলে দিক্‌ভ্রম হবে নিশ্চয়ই এবং বের হয়ে আসা সম্ভব হবে কি না তাও বিবেচ্য বিষয়। দূর থেকেই বন দর্শন ক'রে ফিরে আসতে হ'ল। যার ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস হল না, তার সম্বন্ধে কথা বাড়িয়ে লাভ নাই। আমি লরির কাছে ফিরে এলাম। নাকে দুর্গন্ধ লেগেছিল, সেই দুর্গন্ধ ছাড়াতে আমাকে অনেক সময় নষ্ট ও কষ্ট করতে হয়েছিল। পাঞ্জাবী হিন্দু বললেন, বাবু সাহেব এ টেংগানাইকা অথবা কেনিয়ার উলুবন নয় যে গণ্ডায় গণ্ডায় সিংহ, হাজারে হাজারে হরিণ, দলে দলে খরগোস, বন-গরু, জেব্রা, উটপাখী এসব দেখতে পাবেন। এটা হ'ল আসল আফ্রিকা, এখনও ইউরোপীয়রা কেন আরবরাও এরূপ স্থানে আসতে ভয় পায়।

এখানে আমি শিখ ভদ্রলোকের পরিচয় দিব। তার নাম জানি না তবে তাকে পাঞ্জাবী ভদ্রলোক পিতম সিং বলেই ডাকতেন। পিতম সিং যে শিখ ড্রাইভারের নাম নয় তা আকার ইঙ্গিতে বুঝতে পেরেছিলাম। তিনি প্রায় যেখানে বৃটিশ রাজত্ব কায়েম হয় নি সেরূপ স্থানেই বাস করেন। যখন তাঁর পেট্রল এবং মোবিল তেলের দরকার হয় তখন তাঁর এজেন্টগণ তেল এনে দেন। তিনি ডাকাত নন অথবা কারো অনিষ্টও করেন না। তাঁর বন্দুকের লাইসেন্স ছিল না। তাঁর সঙ্গের তিনটি নিগ্রোই ভবঘুরে অথবা জেলপলাতক বলেই বুঝতে পেরেছিলাম। পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে একজন দালাল বলেই মনে হয়েছিল কিন্তু যখনই তিনি হিন্দু সভ্যতার কথা বলতেন তখন তাঁকে পণ্ডিত বই আর কিছু ভাবতে পারতাম না। তাঁর ইংরাজী ভাষায় প্রচুর অধিকার, পারসী ভাষা যেন তাঁর মাতৃভাষা এবং সোহেলী তিনি বেশ বলতে পারতেন, আরবী তিনি আরবদের মতই বলতে সক্ষম হতেন। পণ্ডিত, লোভী অথবা নরঘাতী এই তিন রকমের লোকের সঙ্গে আমার ভাগ্য ভাসিয়ে দিয়েছিলাম পনেরো দিনের জন্য। পনেরোটি দিন যদিও আমি কমই বিশ্রাম করতে পেয়েছিলাম, তবুও আজও আমার মনে আছে এই পনেরো দিনে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জনের স্থবিধা পেয়েছিলাম সেরূপ স্থবিধা জীবনে আর পাব কি না সন্দেহ।

সেদিন চলার পথে আমরা খুব কমই বিশ্রাম করেছিলাম। সন্ধ্যার পূর্বে একটি সমতল ভূমিতে মোটর-লরী থামিয়ে, থাকবার এবং খাবারের বন্দোবস্ত করার জন্য আমরা সকলে মিলে কাজে লেগে পড়লাম। ঘিয়ে ভাজা মোটা মোটা চাপাটি, যাকে নিগ্রোরা বলে "মাকাটি", তা আমাদের সঙ্গে ছিল। কতকগুলি সব্জী আমরা এনেছিলাম তাই ভেজে নিয়ে সকলে মিলে খেয়ে চা তৈরী ক'রে প্রত্যেকে এক এক মগ চা খেলাম। তার পর বিশ্রাম।

আমাদের সঙ্গে তাঁবু ছিল না। মোটরের বডিটা প্রকাণ্ড একখানা ঘরেই মতই ছিল। তাতে তিনজন ক'রে ঘুমোতে লাগলাম এবং তিনজন ক'রে পাহারা দিতে লাগলাম। আমি ভেবেছিলাম হয় ত কোন জানোয়ার আক্রমণ করবে, কিন্তু তা নয়, এখানে নাকি ডাকাত আছে। ডাকাতেরা প্রায়ই নিগ্রো এবং আরবে মিশানো এক জাতীয় লোক। তারা মোম্বাসা, নাইরবী, কাম্পালা এবং অন্যান্য শহরে থাকে এবং সুবিধা পেলেই বিনা লাইসেন্সে হাতীর দাঁত, সোনার "ওর", মূল্যবান কাঠ, ছোট ছোট মুক্তা এসব নিগ্রোদের কাছ থেকে কিনে গোপনে শহরে বিক্রয় ক'রে মোটা টাকা রোজগার করে। এরূপ একদল চোর অন্য চোরকে পেলে মিতালী করার বদলে শত্রুতা করে এবং সেই শত্রুতার ফলে খুনোখুনিও হয়। আমি বুঝতে পারলাম কি রকম লোকের সঙ্গে এড ভেন্‌চার করতে এসেছি।

ভ্রমণের পর সাধারণতই আমার বেশ ঘুম হয়। আমার সাথীরাও চেয়েছিল আমি ঘুমিয়েই থাকি। আমি ঘুমিয়েছিলামও, কিন্তু কয়েক জন লোক একসঙ্গে কথা বলায় জেগে উঠলাম। সোহেলী ভাষা আমি অতি অল্পই শিখেছিলাম। শুধু শুনলাম, সর্দারজী বলছে "সিংগা, সিংগা"। কথাটা আমি বুঝলাম। আফ্রিকাতে আরব, নিগ্রো
ভয় ক'রে চলে। ভয় করে চলার কারণও আছে। শিখরা যা[illegible]
তবুও দরকার হলে সিংহে পরিণত হতে পারে। তবে এদের সিংহে পরিণত করতে চারণ-গীতের দরকার হয়, মদের দরকার হয় না। আফ্রিকাতে বৃটিশ সরকার প্রথম গুজরাটবাসীদেরই ইমিগ্রেণ্ট হিসাবে নিয়ে যান। অহিংসা ধর্ম তারা আজ নূতন ক'রে গ্রহণ করে নি,—বহু পূর্বকাল হতে এদের মধ্যে অহিংসা ধর্ম প্রচলিত ছিল। হিজ্ হাইনেস দি আগা খানের শিষ্যরাই প্রথম সেখানে যান। পেছন দিক হতে ছোরা

়ারা তারা শেখে নি, কেনিয়াতে এখনও তাবা এ বিষয়ে একদম অজ্ঞ। তারা আরব এবং নিগ্রোদের বেশ ভয় করেই চলে।

কালক্রমে শিখরা গিয়ে আফ্রিকায় হাজির হ'ল। শিখরা দেখল, আগাখানীদের সঙ্গে তাদের বেশ বনে। তাই তারা আগাখানীদের সঙ্গেই থাকত এবং আগাখানীরা শিখদের তাদের স্বধর্মের লোক বলেই পরিচয় দিত। এতে আরব এবং নিগ্রোরা ভাবল, তবে আর কি, এদের প্রতিও সমান ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই একদিন কথা কাটাকাটি হওয়ায় একজন আরব একটি শিখকে ছোরা মারতে আসে। শিখটি তাকে ছোরা মারার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে নিমিষের মধ্যে তলোয়ার দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করেই তার দলেব নিগ্রো এবং আরবদের আক্রমণ করে। ফলে অনেক হতাহত হ'ল। তার পর থেকে শিখদের প্রতি নিগ্রো এবং আরবরা ভাল ব্যবহার ক'রে আসছে।

এখন শিখরা অনেক সময়ই আরব-সঙ্গ পছন্দ করে। কারণ শিখের জুড়িদার যদি আফ্রিকায় কেউ থাকে তবে আরব, সোমালী এবং অর্ধ-আরব। বীর বীরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, অন্যকে করুণা দেখায় মাত্র। শিখরা আফ্রিকাতে 'সিংগা সিংগা' নামেই পরিচিত।

বার বার 'সিংগা সিংগা' কথাটা শুনেই মনে হ'ল, হয়ত কোন বিপদ নতুবা জাতের নাম বলার দরকার কি? আমি চুপ করেই রইলাম, শুনলাম শিলিং-এর গোণাগুণি হচ্ছে। বুঝলাম বিপদ কেটে গেছে নতুবা শিলিং-এর আদান-প্রদান হত না। তারপর আর কোন সাড়াশব্দ নেই। আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে শান্ত্রী পরিবর্তনে ঘুম ভাঙ্গত বটে, কিন্তু পরিশ্রান্ত থাকায় বেরিয়ে আসতাম না।

রাত যখন চারটে তখন সবাই উঠে বসল। মোটর ঘরঘর ক'রে উঠল। আমি উঠে এসে সামনে বসলাম। তখনও রাতের অন্ধকার কাটে নি।

মাঝে মাঝে দু-একটা চিতা বাঘ পথ ছেড়ে পালাচ্ছে। খরগোসগুলি ঝুপঝাপ ক'রে সরে পড়ছে। বন-মোরগ এবং ঢুবি শ্রেণীর এক জাতীয় পাখী, যার মাংস সুস্বাদু এবং ইউরোপে যার দাম সকল মাংস অপেক্ষা বেশী, তারা মোটরের শব্দ শুনে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পালাচ্ছিল। আমি তারকারাজি খচিত সুন্দর আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রভাতের সুমিষ্ট বাতাসে ওদের প্রাণভয়ে উড়ে যেতে দেখে যেন স্বপ্নপুরীতে পাখার সাহায্যে বিচরণ করছিলাম। ড্রাইভার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ বাবু? এসব মুক্তা নয়, হীরা নয়, খাঁটি আকাশ আর খাঁটি মাটি, এই দেখে ভাববার কি আছে? আমি কিছুই বলি নি, শুধু চুপ ক'রে আফ্রিকার নির্জনতার কথাই ভাবছিলাম।

সকাল হ'ল। গাড়ি থামল। কয়জন নিগ্রো চা তৈরীতে মন দিল। আমি গরম জলে হাত-ধুয়ে চা পান ক'রে সিগারেট ধরিয়ে নিকটস্থ দৃশ্যাবলীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। এমন সময় সর্দারজী বলল, বাবুজী এবার একটু বেড়িয়ে এস, আমরা একটু ঘুমোব। আচ্ছা বেশ, বলে আমি নিকটস্থ পাহাড়ের দিকে চললাম। ভাবলাম এরা রাত্রে কি বেচাকেনা করেছে তা আমাকে দেখাতে চায় না। যাক্‌গে আমার এসব জেনেও কি লাভ হবে, পাহাড়-পর্বত আর নির্জন প্রান্তর দেখাই ভাল।

নির্জন বলতে যা বোঝায়, শহরের লোক তা অতি অল্পই বুঝতে সক্ষম হয়। পাতাটি নড়লে তার শব্দও কানে আসে। মাটির নীচ হতে পোকা ডাকলে বেশ ভাল করেই শোনা যায় কি রকম তার শব্দ হচ্ছে। এরূপ নিস্তব্ধতার মাঝে লরী হতে প্রায় এক মাইল দূরে গিয়ে ভাবতে লাগলাম যেসব বৈদেশিক পর্যটক আফ্রিকা সম্বন্ধে লেখেন তাঁরা নিশ্চয়ই এসব স্থানে আসেন এবং এসব স্থানে বসেই তাঁদের অভিজ্ঞতা লেখেন। এই ত চারিদিকে পাহাড় এবং উঁচু জমি। মাঝে মাঝে যে সকল খাল-

বিল সৃষ্টি হচ্ছে তার মাঝে অবশ্য নানারূপ বৃক্ষ, নানা রকমের পাখী এবং জানোয়ার আছে। ওদের দিকে কি তাঁরা দিনের পর দিন ওৎ পেতে বসে থাকেন? বামনদের সম্বন্ধে তাঁরা যে সকল ছবি দেশ-বিদেশে পাঠান তাদের কথা স্টান্‌লী লিভিংস্টোন লেখেন নি। হটেনটট্ বলে এক জাতীয় মানুষ ছিল, এখন তারা আর নেই। নিগ্রোরাই তাদের বংশ লোপ করেছিল। তবে কেন ওদের নিয়ে এখনও এত মাথা ঘামানো হচ্ছে? দূর্বাদল-শ্যামল ভূমির উপর আমি দাঁড়িয়েছিলাম। ইচ্ছা করলেই এই ভূমি চাষ করা যেতে পারে এবং প্রচুর শস্য উৎপাদন ক'রে পৃথিবীর লোকের অভাব পূরণ করা যেতে পারে। যে সকল পার্বত্য খালবিল দেখতে পাওয়া যায় তাতে প্রচুর মাছ রয়েছে। বন্যজীব প্রচুর আছে। এসব সুন্দর স্থানকে কেন ইয়েলো ফিভারের জন্মভূমি বলা হয়েছে? হয়ত তার পেছনে একটা মতলব আছে। সেই মতলবটা কি তাই আমি ভাবছিলাম। অনেকক্ষণ বসে থেকে একটা ঝোপের কাছে গিয়ে মনে হ'ল, এক রকমের কতকগুলি জীব যেন তাতে বসে আছে। ভেবেছিলাম হয়ত প্রকাণ্ড সাপ হবে নিশ্চয়ই কিন্তু একটু ভাল ক'রে দেখেই বুঝলাম এগুলি সাপ নয়, কতকগুলি ধূসর বর্ণের খরগোস, আমার ভয়ে ভীত হয়ে লুকিয়ে আছে। খরগোসগুলি দেখতে বেশ বড়, কিন্তু এতগুলি খরগোস এত ছোট একটি স্থানে লুকিয়ে থাকতে পারে দেখে আশ্চর্য লাগলো। আমি খরগোসগুলিকে বিরক্ত না ক'রে নিকটস্থ আর একটা জঙ্গলের দিকে রওনা হলাম। জঙ্গলে একটিও ত্রিশ হাতের বেশী লম্বা গাছ ছিল না। গাছগুলির ডালপালাও এত বেশী ছিল না যে দিনের বেলাতে অন্ধকার দেখায়। তাই বিনা চিন্তায় ছোট বনটিতে প্রবেশ ক'রে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। চিতা বাঘ, সিম্পাঞ্জি, সাপ, সিংহ,—এসবের কথা আমি কখনও চিন্তা করি নি। কিন্তু একটু দূর যাবার

পরই একটা গাছে যেন একটা সাপ জড়িয়ে আছে বলে মনে হ'ল। দূর থেকে তা দেখতে পেয়েই প্রাণটা কেঁপে উঠল। মনে হ'ল, আর কি, এবার নিশ্চয়ই মৃত্যু। সাপ কি আমায় ছাড়বে? বুকটা কেঁপে উঠল। জিভ শুকিয়ে গেল। মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। কান দুটো গরম হয়ে উঠল। উষ্ণ নিশ্বাস নাক দিয়ে বইতে লাগলো। কিন্তু একটি মাত্র কথা হঠাৎ মনে হয়ে আমাকে সাহস এনে দিল—হয়ত এটা মোটা একটা লতাও হতে পারে। জড়ানো মোটা লতা দেখেই বোধ হয় লেখকগণ সাপের ছবি এঁকেছিলেন। রঙিন্ চশমাজোড়া চোখ হতে খুলে কাছে দেখবার চশমা হাতে রাখলাম, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হ'ল গল্পের বইয়ে পড়েছি সাপ চোখের আকর্ষণে ভক্ষ্য জীবকে কাছে নিয়ে গিয়ে আক্রমণ করে। আমি কি সেরূপ ভাবেই মেসমেরিজম্ শক্তির প্রভাবে চলেছি? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে মনে হ'ল সাপের চোখে প্রভাব থাকলে নিশ্চয়ই আমাকে টেনে নিয়ে যেত, দাঁড়াতে দিত না। তারপর বোধ হয় তিন চেন দূর থেকে বুঝলাম এটা সাপ নয়, এটা সত্যিই একটা লতা। লতার রং সাপের মত। তবে মাটি থেকে বের হয়ে গাছটাকে বেড়িয়ে বেড়িয়ে একদম সাপের লেজের মতই হয়েছে।

আরও একটু সাহস করলাম। আরও কাছে গেলাম। তারপর গাছের গোড়ায় গিয়ে লতাটার একদিকে ছুরি বসাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু লতা হলেও সে একটি পুরনো ঝুনো গাছ। তাতে ছুরি প্রবেশ করানো শক্ত কাজ।

অতি কষ্ট ক'রে কতকগুলি বাকল কেটে নিয়ে গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, যদি ক্যামেরা দিয়ে এই লতা-বৃক্ষটির ছবি লোকসমাজে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারতাম তবে লোকসমাজের অন্ধকারের আফ্রিকার অনেকটা ধাঁধা চলে যেত।

লতা-বৃক্ষের বাকল পকেটস্থ ক'রে আর একটু এগিয়ে একটা গাছের গোড়ায় বসে ভাবতে লাগলাম, আমার দ্বারা এসব গাছের বাকল যোগাড় ক'রে কি লাভ! কে কিনবে এ সব! লাভ শুধু বয়ে নিয়ে যাওয়া—এই বলেই বাকলগুলি দূরে নিক্ষেপ ক'রে সাথীদের কাছে ফিরে গেলাম।

তাদের সঙ্গে এইভাবে দিন কয়েক নানা দুর্গম স্থানে ঘুরে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেক কষ্টে আবার কিজাবিতে ফিরে যাই।

এই সময়ে আমি আফ্রিকার বিখ্যাত নায়েগ্রা, ঝিন্‌ঝা ও ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত দেখেছি।

এরপরও আমি বহুদিন আফ্রিকায় ছিলাম। আগের কথা মত আবার মোম্বাসায় ফিরে গিয়ে পূর্ব সংগী তারুকে পাই এবং তাদের নিয়ে আফ্রিকায় আরো অনেক দ্রষ্টব্য ও নিগ্রো পল্লী ঘুরে বেড়াই।

সেই সব বিচিত্র স্মৃতি আজও আমার মনে জাগরিত আছে।

আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের অভিজ্ঞতা অতি অল্প। আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের দেশের লেখকগণ যে-সব প্রবন্ধ লিখে থাকেন, সেগুলোর গোড়ায় রয়েছে চর্বিত-চর্বণ বৃত্তি। বৃটিশ লেখকদের লেখা থেকে যতটা নিতে পেরেছেন তাকেই নিজের ভাষায় আরও একটু বাড়িয়ে আফ্রিকাকে আরও একটু কালো ক'রে তুলেছেন। ইউরোপীয় সংবাদপত্র-সেবীগণ আফ্রিকাকে বলেন 'ডার্ক কন্টিনেন্ট'। এখানে ইউরোপীয় বলতে বৃটিশ লেখকদের কথাই আমি বলছি! বৃটিশ লেখকগণ নিরপেক্ষভাবে কিছু লিখতে গেলেই তাঁদের স্বার্থে আঘাত লাগে, সেজন্যই তাঁরা সকল দিক বজায় রেখে লেখবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই দেখেছি, বাঙ্গালী লেখকরা বৃটিশ লেখকদের কেতাব না ঘেঁটে আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছুই লিখতে সক্ষম হন নি। তাঁদের কাছে বৃটিশ লেখকদের কেতাবমালা অথরিটি বলেই গণ্য হয়ে থাকে। আমার বেলা কিন্তু তা চলবে না, আমিও তাঁদের মতই বেড়িয়েছি। আমারও তাঁদের মত বিবেক বুদ্ধি আছে। এখানে যদি বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে এসব চতুর লেখকদের কাছে আফ্রি-

আত্মসমর্পণ করি তবে আমার মূর্খতার অবধি থাকবে না। সেজন্যই আজ প্রকাশ্যেই বলছি, আফ্রিকা 'ডার্ক কন্টিনেণ্ট' নয়, আফ্রিকা আলোতে ভর্তি। আফ্রিকার লোকের শরীরের রং যেমন বদলাচ্ছে, আচার-ব্যবহার এবং শিক্ষারও তেমনি উন্নতি হচ্ছে। আফ্রিকা একদিন সভ্যসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করবে।

বেদুইনের দেশে

ইরানের শীতল পার্বত্যভূমি পার হয়ে, ইরাকের নিকট এসে বুঝলাম অদূরেই মরুভূমি। দ্বিপ্রহরে রোদ যখন সাদা রং ধারণ করেছিল—তখন পরিশ্রান্ত হয়ে 'কাচ্‌রা-সিরিন' নামক একটি শহরে পৌঁছলাম। শহরটি ইরানের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু আরবের গন্ধ তাতে এসে লেগেছে। একটি আরব হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হোটেলখানা ভদ্রলোকদের বাসের অনুপযুক্ত, কারণ এ হোটেলে প্রায়ই আরব এবং কুর্দ চাষারা এসে বাস করে। হোটেলের মালিক আমাকে বুঝিয়ে বলল, এ হোটেলে কোন ভদ্রলোক এসে বাস করেন না, বিদেশের কথা ত' উঠতেই পারে না, তবুও যদি আমি থাকতে চাই তবে আমার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হবে এবং সেজন্য সময়েরও দরকার। হোটেলের মালিককে বুঝিয়ে বললাম আমি মোটেই ভদ্রলোক নই। আমিও একজন দরিদ্র হিন্দু, অতএব সঙ্কোচ করবার কিছুই নেই। হোটেলের মালিক আমাকে আর কিছু না বলে একখানা রুম—যাকে আরবী ভাষায় বলে "কামরা" দেখিয়ে বলল "আফেন্দী," বাইরে যাবার সময় রুমের তালা বন্ধ ক'রে যাবেন নতুবা কোন অভদ্রলোক আপনার জিনিস ওলট-পালট করতে পারে। কথাটা বেশ ভাল করেই বুঝলাম। বিদেশে গেলে এরূপ ইঙ্গিতেই যথেষ্ট

উপকার হয়। বিদেশে গিয়ে বারবার "কেন" বলতে নেই, আক্কেল খাটিয়ে কথা বুঝতে হয়।

স্নানাগারে গিয়ে শীতল জলে স্নান ক'রে এসে আরবের সজ্জিত বিছানা পরীক্ষা করলাম। তূলার নরম একখানা তোষক এবং তারই উপর মোটা খদ্দরের চাদর বিছানো ছিল। ছুটো বালিশ তুলারই তবে সেই বালিশে মাথা রাখলে মোটেই গরম লাগে না, কারণ বালিশের ঢাকা বেশ মোটা খদ্দরের ছিল। খদ্দর গরমে শীতল আর শীতে গরম থাকে। তা দেখেও আমি সন্তুষ্ট হলাম না, একেবারে বিছানা উল্‌টিয়ে চারপাইখানাও পরীক্ষা করতে লাগলাম! আরবের হোটেলে চারপাই-এর বাহাদুরী ছিল। ভেড়ার লোমের রশি দিয়ে করা হয়েছিল চারপাই এবং ঠিক মধ্যস্থলে একটি পদ্ম বোনা ছিল। আর দেখার কিছুই ছিল না। বিছানা পেতে ভাল পোশাক পরে নিকটস্থ খাবারের দোকানে গিয়ে কিছু খেয়ে এসে শুয়ে পড়লাম। শোয়ামাত্রই চোখের পাতা বুজে এল।

অনেক দিন পূর্বে আরব দেশ বেড়িয়ে এসে আজ আমি সে দেশ সম্বন্ধে ভ্রমণ-কাহিনী লিখছি। ১৯৩৪ সালের কথা! তবে আমার মনে হয়, ভ্রমণ-কাহিনী পুরোনো হয় না। আজও 'কাচরা-সিরিনের' কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা জানি না। আজও বোধহয় এ শহরে "স্পাইং এবং কাউণ্টার স্পাইং" চলছে, আজও বোধহয় রাজনীতিকদের নির্জনের বাসস্থান বলে 'কাচরা-সিরিনের' নাম সুপরিচিত। এ সম্বন্ধে আরও বলার ছিল, তবে 'কাচরা-সিরিন' আরব দেশের বাইরে বলেই এ শহরটির সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলা হ'ল না।

হোটেলওয়ালা বড়ই দয়ালু। সে বুঝে গিয়েছে আমি মামুলী মানুষ আর মামুলী মুসাফির। তবে আমি "হিন্দি" বলেই। বোধহয় একটু জাতক্রোধ। আজ স্বদেশে শুনতে পাচ্ছি অনেকগুলি "স্তান" তৈরী

হবে, কিন্তু হিন্দুস্থানের "হিন্দি"কে বলছি, তুমি যে ধর্মের লোক হও ভেব না, বিদেশে গিয়ে ধর্মের মারফতে কিছু সহানুভূতি পাবে। মনে রেখো তুমি শুধু হিন্দি, আরব দেশে আমাদের 'হিন্দি' বলেই ডাকা হয়।

পরের দিন বের হবার পূর্বে বাগদাদের পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করলাম। আরবগণ আমাদের মত "এগিয়ে যান" বলে না। তাদের কথার মূল্য আছে এবং আমাদের দেশে যারা বলে 'ঐ সামনেই' তাদের মত দায়িত্বজ্ঞানহীনও নয়। আমার পথের সন্ধানের সঠিক সংবাদ জানানোর জন্য বেশ এক সভা বসে গেল। অনেকেই উটের পথ জানে, মোটর রোডের সংবাদ অতি অল্প আরবই রাখে। একটি আরব বলল, "পথে অনেক সময় ধূলা এসে জমা হয় এবং সেই ধূলার উপর মোটর পিছলিয়ে যায়, সাইকেলেরও সেরূপ পিছলানোর সম্ভাবনা আছে।

কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, "পথে বেদুইন ডাকাতের আক্রমণের সম্ভাবনা আছে কি ?" আমার কথা শুনে অনেকেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। একজন বলল, "পর্যটক! মরণকে ভয় কর কেন? কোন পর্যটক মরণের ভয় করে না।" কথাটা শুনে বাস্তবিকই দুঃখ হয়েছিল। কত ইউরোপীয় পর্যটক আরবদেশে একাকী ভ্রমণ করেছে কতজন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে তার ইয়ত্তা নেই, আর আমার ভীত হবার কারণ কি? কথাটা চিন্তা ক'রে বড়ই দুঃখ হ'ল। আর দাঁড়ালাম না, এক হাত উঠিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম এবং শুধু দোকানীকে আলিঙ্গন ক'রে পথে বেরিয়ে এলাম।

আরব্য রজনী নয়, আরব্য দিবা। পথ ভালই। যেদিকে চাইছি সেই-দিকেই বালুকণা ধূ ধূ করছে। ইচ্ছা হয় গ্রামে ফিরে যাই। গ্রামটা যেন আমার জন্মভূমি, পেছন থেকে যেন আমাকে ডাকছে। পথে লোক নেই,

একজনও না, একটা উটও না। মনে হচ্ছিল যদি একটা বাঘ দেখতুম তবুও ভাল হ'ত, তবুও শান্তি পেতুম। আমি জীব। জীবের দর্শন চাই, সে শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক। কিন্তু কোথায় জীব, কোথায় জল; শুধু জলের কথাই মনে হতে লাগল। দুদিকে রাশি রাশি বালুকণা, উপরের আকাশের দিকে চাইতেও ভাল লাগল না। অতি পরিষ্কার সে আকাশ। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আকাশের শেষ সীমা পর্যন্ত দেখ্‌ছি। গভীর সাগরে—যেখানে স্বচ্ছ এবং গাঢ় নীল জল দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে যেমন কুড়ি পঁচিশ হাত জলের নীচে কি আছে খালি চোখে দেখা যায়, তেমনি আরবের আকাশের শেষ সীমাও যেন দেখা যায়। এসব কথা যেমন ক'রে ভাবছিলাম, তেমনি ভাবছিলাম,—ঐ যে গ্রামখানা পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল তা গেল কোথায়? কুক যেমন পৃথিবীর গোলত্ব সাগরের জলে জাহাজের মাস্তুলের অগ্রভাগ দেখে ঠিক করেছিলেন, আমাদের দেশের লোক তেমনি কেন আরব গ্রামের খেজুর গাছের অগ্রভাগ দেখে বলে নি—পৃথিবী গোল?

ঐ দেখা যাচ্ছে খেজুর গাছের অগ্রভাগ। নিশ্চয়ই ভূমি হবে। আমি এখন কলম্বাস, সমুদ্র যাত্রা করেছি হিন্দুস্থান আবিষ্কার করতে। আমার খুব আনন্দ। ঐ খেজুর গাছের পাতা, তারপর খেজুরের গুচ্ছ! কত সুমিষ্ট ফল! সে ফল জীবন বাঁচায়। খেজুর গাছের নীচে নিশ্চয়ই কুয়া আছে। সে কুয়ার জল নিশ্চয়ই মিষ্ট, স্বচ্ছ, সুন্দর জীবনে ভর্তি। সে জল পান ক'রে জীবন ফিরে পাব। সামনে গ্রাম। কত সুন্দর সে গ্রাম। গ্রামে গৃহ। গৃহে লোক আছে। লোকে নিশ্চয়ই খাবারের দোকান করেছে, সেখান থেকে খাবার কিনে খাব। ঘরে গিয়ে বসব। নিশ্চয়ই শীতল বায়ু বইছে, সেই ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর ঠাণ্ডা হবে, আরাম হবে, শান্তি পাব। ঐ গাছে রয়েছে ভগবানের গুণগান। নিশ্চয়ই ভগবান আছেন। জল তাঁরই সৃষ্টি,

রুটি তাঁরই স্বষ্ট, গ্রাম এবং খেজুর গাছ তাঁরই স্বষ্ট। এরূপ চিন্তাধারার ভেতর দিয়ে গ্রামে পৌছলাম।

রৌদ্রে শরীর জ্বলছিল, শরীরের চামড়ায় ফোস্কা পড়বার মত হয়েছিল, কারণ সাইকেলের উপর থাকার দরুণ একটু বাতাস পেয়েছিলাম তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আরও গরম লাগছিল। ধীরে ধীরে গ্রামে গিয়ে পৌছলাম। গ্রাম নীরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দু'একটি লোক গাধার উপর বসে এবং গাধা তাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। কাউকে কোনরূপ অভিবাদন জানালাম না; শুধু চেয়ে দেখতে লাগলাম গ্রামের কোথাও শহরের গন্ধ আছে কিনা?

সামনেই একখানা বইয়ের দোকান দেখতে পেয়ে আনন্দিত হলাম। তাতে নানারূপ আরবী অক্ষরে লেখা সংবাদপত্র রক্ষিত ছিল। দু'এক খানা ফ্রেঞ্চ ভাষার বইও ছিল। দোকানী আমার সঙ্গে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলল। আমি বললাম, "উরদু ফামিদী?"। অর্থাৎ হিন্দুস্থানী বোঝ কি না? দোকানী বললো, "নেই"। আমি বললাম, "মন ইরাণী ফামিদম।" অর্থাৎ আমি ইরাণী ভাষা জানি। নিজের দরকার অনুযায়ী ইরাণে থাকার সময় কতকগুলি ইরাণী কথা শিখেছিলাম, তারই যে দু'চার কথা মনে ছিল তাই দিয়ে কথা সুরু করলাম। পথিকের চাই কি? সর্বপ্রথম বিশ্রাম। লোকটি তা বুঝতে পেরে নিকটস্থ সরাইখানা দেখিয়ে বলল, "পাকতি ইসি রুই কাতল" অর্থাৎ এই পথ দিয়ে চলে যাও। একটু এগিয়ে গিয়েই একটা মেটে ঘরের কাছে এসে দেখলাম, কতকগুলি লোক বসে রয়েছে। ইংলিশে বললাম, এটা কি সরাইখানা? একজন লোক বলল, হাঁ এটা সরাইখানা; যদি থাকতে চান ত আসুন! আমি সাইকেলটা বাইরে রেখে, যে লোকটি কথা বলেছিল তারই গালিচাতে গিয়ে বসলাম এবং কোথায় জল পাব তাই জিজ্ঞাসা করলাম। লোকটি তৎক্ষণাৎ একটি লোককে জল এনে দিতে বলল। আমি নীরবে জলের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একবারও হুঁ হাঁ কোনরূপ শব্দ করলাম না, তারপর জল যখন এল তখন ভাল ক'রে উজু ক'রে নিয়ে ফের গালিচায় বসে একটি ছোট কাপে এক-কাপ জল ধীরে ধীরে চায়ের মত খেয়ে শুয়ে পড়লাম। পরিশ্রমের পর নিদ্রা এল, আমি গরমকে ফাঁকি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম থেকে উঠে ফের জল আনিয়ে উজু ক'রে কফি আনতে বললাম। কফি আনিয়ে দিলেন পরিচিত লোকটি। আমাকে সেজন্য একটা পয়সাও দিতে হ'ল না। তারপর উভয়ে মিলে খাবার আনিয়ে পেট বোঝাই করে খেয়ে নিলাম। খাওয়া বড়ই আরামের হয়েছিল। দুম্বার মাংসের কাবাব আর আরবী রুটী। খাবারের পর কতকগুলি ফল পেয়েছিলাম। আমার প্রচুর ভোজন দেখে ভদ্রলোকের তাক লেগে গেল। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এর চেয়ে বেশী খেতে পারেন কি ? আমি বললাম, নিশ্চয়ই বন্ধু। আরবগণ খুব কম খেয়ে থাকে বলেই আমার খাওয়া দাওয়া দেখে ভদ্রলোক আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। ইংলিশ জানা একজন আরবকে পেয়ে আমার মনে কত আনন্দ হয়েছিল তা বলবার নয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম তিনি এ গ্রামে তিন দিন থাকবেন তারপর যাবেন বাগ্দাদ্। সোজা যাবেন না, গ্রাম থেকে গ্রামান্তর ঘুরে যাবেন। আমি তার সঙ্গী হতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি আমাকে বললেন, "আমার সঙ্গে যদি আসতে চান তবে এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে রেলপথ আছে, সেখানে গিয়ে সাইকেলটা বাগ্দাদে বুক ক'রে দিন এবং আমার সঙ্গে উটে করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলুন। আমি তাতেই রাজি হলাম। কিন্তু কথা হোলো এত টাকা পাই কোথায়! আরব ভদ্রলোক কারপেট এবং জাপানী খদ্দরের ব্যবসা করতেন। যে মুহূর্তে আমি তাঁর কথায় রাজি হলাম তৎক্ষণাৎ তিনি বয়কে বলে আমার জন্যে নূতন একটা কারপেট খুলে দিতে বললেন এবং তারই উপর বয় বিছানা সাজিয়ে

দিল। আমাকে সওদাগর বললেন, "বন্ধু, এখন আপনি আমার অতিথি, আপনার নাম বলুন।" আমি বল্লাম আমার নাম রামনাথ বিন বিরাজনাথ, জাতে হিন্দি, ধর্মে বিরাজনাথ হিন্দু অতএব আমিও তাই। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি? ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম আবদুল্লা বিন হাণিফ। হাণিফ ধর্মে ইসলাম তাই আমিও ইসলাম; অতএব উভয়েই আমরা পিতৃধর্মের অনুগামী। পিতা যদি চোর হতেন তবে আমরাও চোর হতাম। অবশ্য কথাটা খুলে বলিনি।

আমার বিছানা হয়ে যাবার পর বিছানায় বসে সিগারেট ফুঁকতে লাগলাম এবং চিন্তা করতে লাগলাম, বিকালে একবার গ্রামটা দেখে নিতে হবে। কিন্তু আরবের অতিথি হওয়া বড়ই কষ্টকর কাজ, কোথাও যেতে হলে বলে যেতে হয়। 'শ্লাম আলিকুমের' ব্যবহার খুবই কম দেখলাম। যখন কেউ বিদায় নেয় তখন বলা হয় "এখন যাই আবার দেখা হবে।" যিনি বিদায় দেন তিনি বলেন, "নির্বিঘ্নে ফিরে এস।" আমার এসব কথা মোটেই মনে থাকত না, তাই কিছুই বলতাম না।

বিকালে আবদুল্লা বিন হাণিফ আমাকে সরাইখানার সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার পরিচয় হবার পর ওরা আমাকে হিন্দুধর্ম কি তাই জিজ্ঞাসা করল। আমি যা বলে গেলুম মিঃ আবদুল্লা তাই তাদের বলতে লাগলেন। আমি বলেছিলাম, হিন্দুধর্মের মধ্যে একেশ্বরবাদ, পৌত্তলিকতা এবং নাস্তিকতা সবই আছে। প্রত্যেকে ইচ্ছামত ভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারে। এই হ'ল হিন্দুধর্মের মোট কথা। কিন্তু আমি এসবের কিছু ধার ধারি না। অতএব বন্ধুগণ আমার সত্য কথা বলার জন্য কেউ আমার প্রতি রাগ করবেন না। ধর্ম সম্পর্কে কেন, যে কোন বিষয়ে আরবদের কাছে কথা বলতে হলে ভূমিকা করতে নেই সোজা কথায় বিষয়টা বুঝিয়ে দিতে পারলেই হ'ল।

আমার কথা শুনে আবদুল্লা তৎক্ষণাৎ আমাকে ফিলজফার উপাধি দিয়ে আপ্যায়িত করলেন।

আরব গ্রামে তিনটে দিন বেশ ভালই কেটে ছিল। গ্রামের লোক রাষ্ট্রনীতি নিয়ে কথা বলতে বড়ই ভালবাসত। এতে ফল ভালই হয়। আনাড়ী লোকও নানা কথা অপরের কাছ থেকে শুনে অনেক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। আমাদের পরাধীনতা আমরা সকল সময় অনুভব করতে পারি না এমন কি অনেক সময় তো ভুলেই যাই, আরবগণ কিন্তু তাদের স্বাধীনতার সম্বন্ধে সকল সময়েই সচেতন। আরবগণ যে পরাধীন সে কথাটি প্রত্যেকেই জানত এবং তা অনুভবও করত।

আরব যাযাবর জাত। এক স্থানে বেশী দিন থাকতে ভালবাসে না। আরবগণ যাযাবর হয়েছে স্বেচ্ছায় নয়, প্রাকৃতিক উপসর্গই তার একমাত্র কারণ। গত মহাযুদ্ধের পর আরব দেশটাকে নানা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক দেশের সীমান্ত পার হতে আরবদের বেশ বেগ পেতেও হয়। পূর্বে কিন্তু এরূপ ছিল না, আরবগণ চায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে। আরবগণ প্যান ইস্‌লাম-এর ধার ধারে না। তার নানা কারণও আছে। এসব কথা পরে বলা হবে।

গ্রামে আমার মত লোকের আগমনে সবাই রাষ্ট্রনৈতিক চর্চা করছিল এবং আমি যাতে এসব কথা বুঝতে পারি তারও ব্যবস্থা করছিল। তাদের রাষ্ট্রনৈতিক কথার উপসংহারে আমি কেঁপে উঠতাম আর দেশের কথা ভাবতাম। প্রত্যেক দিন আবদুল্লাকে বলতাম, "আমার দেশের অশিক্ষিত লোককে আপনারা ক্ষমা করবেন।" আবদুল্লা বলতেন, "হিন্দুস্থান হ'ল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আড্ডাস্থল। নানা রকমের লোক হিন্দুস্থানে বাস করার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বেশ সুবিধাই হয়েছে। তারা হিন্দিতে হিন্দিতে যেমন বিবাদের সূত্রপাত ক'রে দেয় তেমনি অপরকে নির্যাতন

করার জন্যও হিন্দিদের সাহায্য পায়।

সকাল সন্ধ্যা প্রায়ই রাষ্ট্রনীতি নিয়ে কথা হত, শুধু বিকাল বেলাতেই আমি গ্রাম দেখতে বেরিয়ে পড়তাম। তৃতীয় দিন বিকাল বেলা মনে হ'ল আমি আজ ঠিকই বেদুইন হয়ে গেছি। সাইকেল আমার সঙ্গে ছিল না, পূর্বেই সাইকেল পার্সেল ক'রে বাগ্‌দাদ্ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কাল সকালে আমি বেদুইনের সঙ্গে বেড়াতে বের হব, কত কি দেখব এই ভরসায় আমি মস্‌গুল হয়ে পড়লাম। রাষ্ট্রনীতির কথা একদম ভুলে গেলাম।

সাদা সূর্যের মুখ দেবার পূর্বেই আমরা আমাদের উটগুলি লাদাই করলাম। 'লাদাই' শব্দটা আমাদের ভাষায় ব্যবহার করতে চাই। কারণ লাদাই করা মানেই হল উটের মাল বোঝাই করা। এই শব্দটি আরব, ইরাণী, পাঠান, তুরুক, হিন্দুস্থান সবাই ব্যবহার করে, অতএব এই শব্দটির বাংলা ভাষায় স্থান পাওয়া সমূহ দরকার মনে করি। উট লাদাই হয়ে গেলে উটের জুথা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম গ্রামের বাইরে। তখনও আকাশের নক্ষত্ররাজির দীপ্তি নিভে যায়নি, তখনও শুভ্র বালুকার চকমকে আভা একটুও কমেনি। এখনও আরব মরুর শীতল স্নিগ্ধ বাতাস বইছে। আমি উটের পিঠে বসে ভাবছিলাম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা। তুমি আরব মরুতে উটের পিঠে চড়া কল্পনা করেছিলে, আর আমি তা অনুভব করছি।

আমাদের উট চলেছে উত্তর দিকে, বাগ্‌দাদ্ পশ্চিম দিকে। দিক মনে রাখার দরকার ছিল না। আমার দরকার "আরব্য রজনী" অনুভব করা। ক্রমে সূর্য পূর্বের আকাশে এসে দেখা দিল। সূর্যকে দেখা মাত্র রাগ হ'ল। সূর্য ক্রমে একটু একটু ক'রে উপরে উঠল, আর আমাদের উট এগিয়ে চলল। দূর থেকে উটের লহরকে সমুদ্র তীরের নারিকেল বৃক্ষ

বলে অনেক সময় ভুল হয়। যেখানে শুধু উটরূপে নারিকেল বৃক্ষ এবং বালুসমুদ্র, সেখানে মরীচিকা যে কি তা আর বলে দরকার নেই। সেজন্যই উটের পিঠে বসলেই চোখ ভেঙ্গে ঘুম আসত। কিন্তু সকলের ঘুম আসে না। যাদের ঘাড়ে দায়িত্ব নেই তাদেরই ঘুম আসে। আমি বসে বসে ঘুমোচ্ছিলাম; আমার উটটি জুথার মাঝে ছিল। সামনে এবং পিছনে জুথায় আরও উট ছিল। আমার উটের নাকের রশি অন্য উটের লেজে বাঁধা ছিল। দলভ্রষ্ট হইবার মোটেই আশঙ্কা ছিল না।

আমাদের চারিদিকে বালুকারাশি ধূ ধূ করছিল। আবতুল্লা সামনের দিকে তাকিয়ে আমাদের গতি নির্দেশ করছিলেন। উটের একটা বেশ গুণ আছে। কম্পাস যেমন সর্বদাই উত্তর দিকে থাকে, উটও তেমনি জলের. গন্ধ দূর হতে পায় বলেই যেদিকে জল আছে সেদিকেই চলতে থাকে। নাবিকেরা যেমন বাতাসের উল্টো দিকেও জাহাজ চালিয়ে যায় তেমনি উটের গতিও নির্দেশ করতে হয়, নতুবা নিকটস্থ জলের কাছে গিয়ে উট আপনি হাজির হয়। তখনও দশটা বাজে নি, কিন্তু আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল যেন বেলা তুপুর হয়েছে। আরব দেশের দ্বিপ্রহর স্থরু হয় বেলা ন'টা থেকে এবং ক্রমাগত উত্তাপ বেড়ে বিকেল চারটে পর্যন্ত থাকে। বিকেলা চারটের সময় হঠাৎ সূর্যকিরণের রং বদলে যায়। বিকেলের দিকে সূর্যকে একটু রক্তাভ বলেই মনে হয়। মরুভূমিতে দ্বিপ্রহরে চলার ক্ষমতা সকলের থাকে না। দশটার পূর্বেই আমরা একটা ছোট গ্রামে এসে পৌছলাম। গ্রামে মাটির পাঁচিলে মাত্র তিনখানা ঘর, আর কোন ঘর ছিল না; আর সবই তাঁবু। এরই মাঝে একটি মসজিদ। মসজিদ সিয়া শ্রেণীর! স্থন্নিরা ভুলেও সেখানে প্রবেশ করে না। গ্রামের তিনখানা ঘরের একখানা সরাই। এখানে সরাই মানে খয়রাতী ঘর নয়, বিশ্রামাগার। এখানে অর্থের বিনিময়ে বিশ্রাম

করতে পারা যায়। আমরা একখানা ছোট রুম ভাড়া নিলাম। তিনশত ফিলিস সে রুমটির দৈনিক ভাড়া। তিনশত ফিলিসে তিন শিলিং হয়। আবদুল্লা তিন শিলিং দিয়েই রুমটা নিলেন। ঘরের দেওয়ালগুলি বেশ মোটা। একটি মাত্র দরজা। রুমে দিনের বেলাই অন্ধকার অনুভূত হয়। সেজন্য ঘরটা আরামপ্রদ। বয়রা আমাদের জন্য কারপেট বিছিয়ে দিল, তারপর উটগুলিকে খাবার দিল। আমরা হাত-পা ধুয়ে অর্থাৎ উজু ক'রে কারপেটে বসলাম। আমাদের সঙ্গেরই একটি লোক একটি থলি থেকে রুটি, কতকগুলি খেজুর এবং একটা বদনাতে ক'রে এক বদনা জল এনে দিয়েই, এক এক পেয়ালা ক'রে কফি প্রত্যেককে খেতে দিল। আমাদের শরীর তেলে জলে বাঁধা। আমরা জলই খেতে চাই প্রথম। আরবগণ কিন্তু আমাদের মত নয়, তারা গরম কফি খায় সর্বাগ্রে। এতে খাম-খেয়ালী ক্ষুধার লোপ হয়। আমরা কফি খেয়ে উভয়ে এক টুকরো রুটি এবং দুটি ক'রে খেজুর খেয়ে নিলাম। আবদুল্লা একটুও জল খেলেন না, আমাকে কিন্তু জল খেতে হ'ল। আবদুল্লা আমার জল খাওয়া দেখে একটু হাসলেন এবং বললেন, হিন্দিরা জল না খেয়ে থাকতে পারে না।

সামান্য খাবার খেয়ে আমরা বিশ্রাম করতে লাগলাম। আমার তরফ থেকে কথা বলার মত কিছুই ছিল না। গরমে আমাকে কাবু করেছিল। আবদুল্লা কিন্তু চুপ ক'রে থাকবার পাত্র নন। তিনি বার বার সোভিয়েট, 'বলসেভিজম্', ভগবান এসব নিয়েই নানা কথা উত্থাপন করছিলেন। আমি হাঁ হুঁ ক'রে তাঁর প্রশ্নের জবাব কাটিয়ে যাচ্ছিলাম। আবদুল্লার ধারণা যদি আরব দেশে সোভিয়েট হয় তবে ভগবান মরবে। ভগবানকে তাঁর জীবিত রাখা চাই-ই। অনেকবার তিনিই ইংলিশ ভাষায় বলছিলেন, "ভগবান দীর্ঘজীবী হউন।"

সূর্য তখন অস্ত যায় যায় হয়েছিল। দলে দলে লোক এই ছোট গ্রামখানিতে

এসে জড়ো হতে লাগল। সন্ধ্যার একটু পরেই তাঁবুতে তাঁবুতে সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট বাতি জ্বলে উঠতে লাগল। প্রত্যেকেই আপন আপন পণ্য তাঁবুর সামনে সাজাতে লাগল। সব সাজানো হয়ে গেলে, কেউ কিনল আর কেউ বেচল। আবদুল্লা বেশ ভাল মুনাফাই করলেন এবং সে মুনাফার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। তারপর আরম্ভ হ'ল "খানা আর পিনা"। একে অন্যের তাঁবুতে গিয়ে একটু-আধটু কিছু খেতে লাগলেন আর পান করতে লাগলেন আরক। আরক আমাদের দেশী মদের মতই এক প্রকারের মদ, তবে তাতে ভেপ্‌সা গন্ধ ছিল না এবং জলে ঢালা মাত্র সোডার জলের মত একটু ঘোলাটে হবার পরই সাদা রং ধারণ করে। এইরূপ মদ বড়ই উগ্র এবং চায়ের পেয়ালার এক পেয়ালা খেলেই ভয়ানক নেশা হয়। আমি এবং আবদুল্লা প্রত্যেক তাঁবুতে গিয়ে একটু খাবার এবং ছোট পেয়ালাতে এক পেয়ালা আরক খেতে লাগলাম।

"খানা এবং পিনা" শেষ হয়ে গেলে আমার বেশ গরম অনুভব হতে লাগল। তবে দিনের গরম এক, এটা হ'ল পেটের গরম। পেটের গরম কমাবার জন্য বাইরে গিয়ে বালির উপর শুয়ে রইলাম।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। আকাশের তারকারাজি ঝলমল করছিল। শীতল বাতাস প্রাণে মাদকতা এনে দিচ্ছিল। বালুকারাশির উপর রূপ কীট পতঙ্গ না থাকায় বালুকারাশিকে তুলার মতই অনুভব মাঝে মাঝে দু একটা যুবক সারেংগী বাজিয়ে গান ধরছিল।

রাত্রি গভীরতর হয়ে এসেছে। কোন প্রাণীর চলাফেরা নেই। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ। আমি আরামে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম। এমনি সময় কে আমার শরীরে হাত দিল। হাতের স্পর্শেই বুঝলাম এটা ডাকাতের হাত নয়, বহুরূপীর। বহুরূপীকে তাড়িয়ে দিলাম। পরের দিন সকাল বেলা বহুরূপীকে চিনলাম। সে একটি চাকর মাত্র। সে রাত্রে ম্যাসেজ করে

কিছু রোজগার করে। আমি তখন ম্যাসেজের পক্ষপাতী না থাকায় শ্বেতকায় আরবগণ আমাকে নিগ্রো শ্রেণীর পর্যায়ে ফেলেছিল।

পরের দিন রোদের তেজ আরও একটু বেড়েছে। তাপমান যন্ত্রে উত্তাপ বোধহয় একশত কুড়ি ডিগ্রিতে উঠেছে। আকাশে বালুকণা একটুও উড়ছে না। আমরা আধমরা হয়ে দরজায় খিল দিয়ে শুয়েছিলাম, ভৃত্যদেরও সেই অবস্থাই হয়েছিল। জিহ্বা যখন শুকিয়ে যেত তখন সামান্য জল দিয়ে জিহ্বা ভিজাতাম। এরূপভাবে সময় কাটাতে মোটেই ভাল লাগছিল না। দ্বিপ্রহরে নামাজের সময় এল! সাথীরা সবাই উজু করতে গেল, আমি উঠলাম এবং জল চেয়ে নিয়ে তাদের মত উজু করে অনেকটা শান্তি পেলাম। সাথীরা নমাজ পড়ল, আমি বসে তাই দেখলাম।

কাজ কিছুই ছিল না অথচ ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আমাকে কাতর ক'রে ফেলছিল। গরম দেশে খাবারের প্রবৃত্তি যেমন হয় ঠাণ্ডা দেশে তেমন হয় না। সন্ধ্যায় কেনাবেচা হয়ে গেলে আমি ঘরে ঢুকলাম না, মরুভূমিতে একাকী বেড়াতে লাগলাম। রাতে মরুভূমিতে বেশীদূর যাওয়া উচিত নয়, সেজন্য বেশীদূর যাই নি। পথের ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। শুধু পথে ভুলের ভয় নয়, আরও ভয় আছে। মরুভূমিতে বেশ ডাকাতি হয়। মরুভূমির আরব পারত পক্ষে চুরি করে না, ডাকাতি করতেই পছন্দ করে তবে পুরাতন শত্রুর বাড়ীতে ডাকাতি করতে না পারলে চুরি করাটা দোষের নয়। এখানে পুরাতন শত্রুতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে মরুভূমিতে এখনও নানারূপ নিয়ম প্রচলিত আছে সেই নিয়ম-কানুনগুলি অনেক কমেছে। খৃষ্টান মিশনারীরা অনেক অজানা বিষয় সর্বসাধারণে জ্ঞাত করেছেন সত্যকথা কিন্তু তাঁদের কথার মাঝে এমনি একটা টান রয়েছে যাতে ক'রে লোককে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাঁরা যা দেখেছে তার আর অদল বদল হবে না! আরবদের সম্বন্ধে যারা সেই প্রথা

কথা পরিবর্তন হবে না বলে ধারণা করবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ঠকবেন কারণ মানুষের স্বভাব এবং সমাজের স্ট্যাণ্ডার্ড অনবরত বদলাচ্ছে। আরবরাও মানুষ অতএব তাদেরও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আরবদের মধ্যে যে সকল পুরোনো নিয়ম এখনও বর্তমান রয়েছে তার পেছনে রয়েছে ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত গ্রহণ করার অভাব।

রাতে ধনী ব্যবসায়ীরাই পথে চলে। ব্যবসায়ীদের অপর নাম বেদুইন। বেদুইনরা সকল সময় অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। লোকজনও কম থাকে না, খণ্ড-যুদ্ধ প্রায়ই হয়। লোকক্ষয় মন্দ হয় না। এরূপ লোকক্ষয় যাতে না হয় সেজন্য বিদেশী শাসকশ্রেণী আরবদেরও ভারতবাসীর মত নিরস্ত্র করার পক্ষপাতী, কিন্তু আরব এমন আইন মানে না যে আইন তাকে এবং তার সমাজকে পুরাপুরিভাবে রক্ষা করতে পারে না। সেজন্য আরব অস্ত্র বানায়, বেচে এবং কেনে, অন্যায় আইন মেনে চলে না।

যে সকল আরব নিরীহ এবং গরীব তারা অস্ত্রও রাখে না এবং সেজন্য শক্তিশালী আরব তাদের কোন অনিষ্টও করে না। আমাদের সঙ্গে অস্ত্র ছিল না, সেজন্য ধনী আরব আমাদের ঘাঁটাত না। একদিন দিনের বেলা হঠাৎ আমাদেরই একটা লোক চীৎকার করতে থাকে। কতক্ষণ পর কতকগুলি ঘোড়সওয়ার আমাদের কাছে এল এবং দেখল আমাদের কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা। যখন তারা দেখল আমরা নিরস্ত্র এবং মামুলি ব্যবসায়ী তখন তারা আমাদের বাঁয়ে রেখে একটু এগিয়ে মোড় ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

একটু বেড়িয়ে এসে যখন আমি কেনা-বেচা দেখছিলাম তখন হঠাৎ একদল আরব গ্রামের কাছে এসে দেখা দিল। অনেকেই কেনাবেচা বন্ধ ক'রে চীৎকার করতে লাগল। নবাগত আরবদল একটু দূরে তাঁবু গেড়ে করতে লাগল। তারা প্রত্যেকে তলোয়ার এবং বন্দুকে সজ্জিত

ছিল এবং যে কোন মুহূর্তে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল। এদিকের আরব শ্বেতকায়, দীর্ঘ এবং চিক্কণ। তাদের শক্তি প্রচুর অথচ খায় অতি কম। অতি অল্প সময় এরা ঘুমোয়। মন তাদের অতি সরল অথচ রাগ সিংহের মত। মরণ ওদের সকল সময়েই পদানত, তবুও তারা পরাধীন। বৃটিশ, ফ্রেঞ্চ, ইতালি, তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এর কারণ কি তাই অদূরে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম।

আরব দেশের বেদুইনের কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যেরূপভাবে বলে গেছেন, পৃথিবীতে এমনভাবে কোন কবি আরবদের গুণগরিমা গাইতে সক্ষম হন নি। কিন্তু এই আরব জাতের মধ্যে নানারূপ দাসত্ব দেখে আমার মন ক্রমাগত আঘাত পাচ্ছিল। ভারতের সঙ্গে তুলনা করেই সকল জিনিস, সকল গুণ বুঝতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু আরব দেশে গিয়ে আর ভারতের কথা মনেও হয় নি। ভারতের চির-নির্যাতিত দরিদ্র হরিজনের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। যারা চিরদিনের পদদলিত, নির্যাতিত তাদের দোষ গুণ নিয়ে বিচার করা সকল সময় ভাল লাগত না।

আরব দেশ যদিও খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে নানা শ্রেণীর উগ্রসাম্রাজ্যবাদীর দ্বারা শাসিত হচ্ছে তবুও আশা আছে আরবজাত বেশীদিন পরাধীন থাকবে না। ভাষা দিয়ে মানুষের জাতের নির্ণয় হয়। আরব দেশের সর্বত্র আরবী ভাষা চলে। অতএব আরব জাত একদিন একত্রিত হবেই। অনেকেই বলবেন ইংলিশ এবং আমেরিকান একই ভাষা, তারা একত্রিত থাকে না কেন? তার প্রথম কারণ হ'ল ভৌগোলিক বিভিন্নতা এবং একদিন একে অন্যকে শাসন করেছিল। আমেরিকানরা যখনই তাদের পুরোনো ক্ষতের দাগ দেখে তখনই তারা মনে করে—শাসিত এবং শাসকের প্রভেদ।

মরুভূমি অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে এরপর একদিন আবদুল্লার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে রেলের টিকিট কিনে বাগ্‌দাদের দিকে রওনা হলাম।

উঁচুনীচু ভূমি। তারই ভেতর দিয়ে রেলপথ এঁকেবেঁকে চলেছে। গাড়িতে ভ্রমণ বেশ আরামের মনে হচ্ছিল। দুদিকের দৃশ্য তেমন আরামদায়ক ছিল না। গাড়ি কঙ্করময় ভূমির ভেতর দিয়ে চলছিল। দুপুরবেলা একটা পরিত্যক্ত কঙ্করভূমি ভেদ ক'রে গাড়ি বাগ্‌দাদ স্টেশনে এসে দাঁড়াল। স্টেশনের লাগেজ রুম থেকে সাইকেল বের ক'রে সাইকেলটা পরীক্ষা ক'রে দেখলাম ঠিকই আছে। অনেকদিন পর সাইকেলের সাক্ষাৎ পেয়ে বেশ ভাল লাগল। সাইকেলে পিঠ-ঝোলা বেঁধে, শহরের দিকে চললাম। বাঁ দিকে প্রকাণ্ড প্রাসাদ। প্রাসাদের চারিদিকে নানা-রকম ফুলের বাগিচা। পথে পিচ দেওয়া। সাইকেল চালাতে কষ্ট হচ্ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই "মোদী' ব্রীজের কাছে এলাম। ব্রীজ পার হতে হলে ট্যাক্স দিতে হয়। আমিও তাই দিলাম। ব্রীজটা বড়ই সুন্দর। নীচে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তাইগ্রীস নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীতে নানারূপ দেখবার জিনিসও ছিল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাই দেখলাম। নদীতে বড় বড় হাঁড়ি দিয়ে এক প্রকার ভেলা তৈরী হয়। সে ভেলার উপর কয়েকজন লোক বসে নদী এপার ওপার করতে পারে। কতকগুলি বড় হাঁড়িও দেখলাম। তাতে আরাম করে দুটো লোক বসে ছোট হাতের সাহায্যে নদী পার হচ্ছে। দৃশ্যটি আমার কাছে নূতন ছিল না। আমাদের গ্রামেও এরূপ বড় বড় হাঁড়িতে ক'রে গরীব লোক বর্ষার সময় নদীতে পারাপার করত। বর্তমানে কচুরী-পানার জন্য সেরূপ "অর্ণবপোতের" ব্যবহার লোপ পেয়েছে। পৃথিবী বিখ্যাত হারুণ-অল-রশিদের শহরে এখনও এ সনাতন [illegible]া বর্তমান আছে দেখে নিজের গ্রামের কথা আপনিই মনে হ'ল।

তাইগ্রীস নদীর তীরে একজন বিহারী ওভারসিয়ার থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বাঙ্গালী, তাই তাঁর বাড়িতেই যাওয়া মনস্থ করে ম্যান্‌ রোডের [illegible]ার দিয়ে চলতে লাগলাম। ম্যন রোডের নাম কি ক'রে ইংলিশ নাম

হ'ল তা আমার জানার ফুরসুৎ হয় নি। প্রায় তিন মাইল চলে গিয়ে বাঁদিকে ফিরলাম। পথ নেই বললেও চলে। আরব গ্রামের মধ্যে দিয়ে যে পথ যায় তার দু'পাশে থাকে খেজুরের গাছ। এখানে খেজুর গাছ ছিল তবে কেটে ফেলা হয়েছে। অতি কষ্টে ভারতীয় ভদ্রলোকের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। ভদ্রলোক অনুগ্রহ ক'রে থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। ভদ্রলোকের কথার মধ্যে প্রাদেশিক ভাব পুরোমাত্রায় ছিল। এরূপ লোকের মধ্যে প্রাদেশিক ভাব থাকা স্বাভাবিক। প্রাদেশিকতার কথা ভুলে গিয়ে বিশ্রাম করার জন্য শুয়ে পড়লাম, কারণ তখন দ্বিপ্রহরে রৌদ্র তাতিয়ে তুলেছিল।

বিকেল বেলা স্নান ক'রে তাইগ্রীস নদীর তীরে গিয়ে সবেমাত্র বসেছি, এমন সময় একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক জাল নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে এলেন। ভদ্রলোক বাঙ্গালী মুসলমান। প্রথমবার জাল ফেলার পর মোটা মোটা প্রায় দশ-বারোটা পুঁটি মাছ ধরা পড়ল। দ্বিতীয়বারে আরও বেশী। তীরে বসে আমি মাছ ধরা দেখছিলাম। লালচাঁদ অফিস থেকে ডেকে বললেন—আমার বাড়িতে আজ একজন বাঙালী অতিথি আছেন, কটা মাছ দিয়ে যাবেন। বাঙালী ভদ্রলোক কথাটি শুনেই আরবী ভাষায় কি বললেন তা আমি বুঝলাম না, তন্ময় হয়ে মাছ ধরার দৃশ্যই দেখতে লাগলাম। ভদ্রলোকের কাছে যে ব্যাগটি ছিল তা মাছে ভর্তি হবার পর তিনি নদীতীরের পথ ধরে চলে গেলেন, একটা মাছও দিয়ে গেলেন না। বিকেলবেলা যখন বের হয়ে যাবে তখন লালচাঁদ আমাকে ডেকে বললেন, বিকেলে আপনার নিমন্ত্রণ আছে, সত্বর চলে আসবেন।

সেদিন বিকেলবেলা বেশী দূরে না গিয়ে নিকটস্থ আর্মানী পাড়ার কাফেতে গিয়ে বসলাম। আর্মানীরা দেখতে ইউরোপীয়ানদের মতই। কিন্তু তাদের কাফেতে কালো লোক গেলে কোনরূপ অভদ্র ব্যবহার করে

না। আরমানীরা আরব এবং ইরাণীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার বজায় রাখতে বড়ই উৎসুক। আরবরাও আরমানীদের বন্ধু বলেই ভাবে। এই আপনা আপনি ভাবের একটা কারণ আছে। উভয় জাতের মধ্যেই তুরুক-বিদ্বেষ প্রচুর। ভারতের লোক হয়ত ধারণাও করতে পারবে না, যে আরবগণ তুরুকদের মোটেই পছন্দ করে না। যদি সময় হয় তবে এ সম্বন্ধে বিশদ-ভাবে বলা হবে। শুধু এখানে এইটুকু বলে রাখলেই ভাল হবে, যখন স্বাতের মধ্যে জাতীয় ভাব বিকশিত হয় তখন ধর্মের বন্ধন কেটে গিয়ে শাসিত ও শাসকের সম্বন্ধ বড় হয়ে ওঠে। একথা যে-ই অবজ্ঞা করবে তাকে বাতুল ছাড়া এ যুগে আর কোন পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে না।

আরমানী রেঁস্তোরা থেকে ফিরে এসে চাঁটগাঁয়ে ভদ্রলোকের বাড়িতে চললাম। বাড়িখানা একটি গলির ভিতরে। বাগ্দাদে গলি থাকাটা সকলেই যেমন পছন্দ করে আমিও তেমনি পছন্দ করি। দ্বিপ্রহরে রৌদ্র বাড়ে। যখন পথে চলা অসম্ভব হয় তখন গলিপথে চলা বেশ আরামদায়ক। রাত্রে গলিপথে চলা একটু কষ্টকর। সঙ্গে লোক থাকায় গলিতে চলতে আমার মোটেই কষ্ট হয় নি। তবে লক্ষ্য করলাম গলিপথ আরব্য রজনীর সমূহ পরিচয় দিয়ে থাকে।

দেশীয় ভদ্রলোকের বাড়ির সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক সদর দরজার কড়াতে দু'বার নাড়লেন। তারপর আর নাড়লেন না। কিছুক্ষণ পরে একটি লোক এসে দরজা খুলে দিয়ে এক দিকে বেরিয়ে পড়ল। আমরা ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। বাগ্দাদের প্রত্যেক বাড়ির সদর দরজা খোলার জন্য কড়া নাড়ার বিশিষ্ট নিয়ম আছে। কোন বাড়িতে দু'বার, কোন বাড়িতে তিনবার কড়া নাড়তে হয়। অপরিচিত লোক কড়া নাড়তে প্রায়ই ভুল করে সেজন্য কেউ দরজা খুলে দেয় না।

অতিথি এলে নীচের তলাতেই খাবার এবং থাকার বন্দোবস্ত হয়।

আমাদের জন্যও নীচের তলায় খাবারের বন্দোবস্ত হয়েছিল। নিমন্ত্রিতের মধ্যে আমিই বিদেশী আর সবাই ছিলেন আরব। চাটগাঁয়ের ভদ্রলোক আরবভয়ে ভীত ছিলেন, সেজন্য আমার কাছে এসে বললেন, খাবারের পূর্বে যেন বিসমিল্লা বলে খেতে আরম্ভ করি। তিনি জানতেন না আমি আরবদের আচার ব্যবহার বেশ ভালই জানতাম। আরবগণ বড়ই উদার। নামাজ পড় আর না পড়, বিসমিল্লা বল আর না বল, তুমি মুসাফির এই এই পর্যন্ত জানলেই হ'ল।

যে সকল ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ইংলিশ জানতেন। চাটগাঁয়ের ভদ্রলোক ইংলিশ জানতেন না, তাতে আমার বেশ সুবিধা হয়েছিল। দেশবিদেশের নানা কথা বলে আমরা সময় কাটাতে লাগলাম। আসর বেশ জমে উঠছিল। আরাম ক'রে মাছ ভাজা, মাছের তরকারী, অন্যান্য আরবী খাদ্য খেয়ে চলে এলাম। আমাকে পৌঁছে দেবার জন্য চাটগাঁয়ের ভদ্রলোক এসেছিলেন। পথে চলতে চলতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবু আপনি মুসলমান নন, অথচ এরা আপনাকে আজ যে সম্মান দিল আজ পর্যন্ত স্থানীয় কোন ভারতীয়কে সেরূপ সম্মান দেয়নি।"

বাগ্‌দাদ পুরোনো শহর। অনেকেই এই শহর সম্বন্ধে বড় বড় বই লিখেছেন। আমার চক্ষে কিন্তু বাগ্‌দাদের রূপ গরিমা কিছুই ধরা পড়ল না। বড় বড় মসজিদের মিনারগুলি দূর থেকে দেখতে বড়ই সুন্দর লাগত, কিন্তু যখন অত বড় বড় মসজিদের চারিদিকে দরিদ্র লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতাম তখন বড় মিনারের কথা ভুলে গিয়ে দারিদ্র্যের কথাই ভাবতাম। আমি ভাবতাম অনেক কথাই, তবে সে ভাবনার কোন মূল্য ছিল না। মধ্যে মধ্যে পরিশ্রান্ত হয়ে বড় বড় "কাওয়া"-তে গিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকতাম। এখানে "কাফে"র অপর নাম "কাওয়া"। দু'একদিন কাওয়ায়

খেয়েছি। বাগ্‌দাদের আরবরা কফিতে দুধ অথবা চিনি ব্যবহার করে না। সেজন্য জিনিসটি ভয়ানক কটু হয়। যার কাওয়াতে খেয়ে অভ্যেস নেই সে তা খেতে পারে না। আমি কিন্তু কাওয়াতে চিনি মিশিয়ে দিতে বলতাম। বয় আমার কথা মত চিনি মিশিয়ে দেবার জন্য বেশী পয়সা চার্জ করত না!

বাগ্‌দাদে ইউরোপের নানা জাতের লোক দেখতে পাওয়া যায়। এখানে তারা ব্যবসা করতে আসে। নবাগতের মধ্যে ইউরোপীয় ইহুদীদের সংখ্যাই বেশী। ইহুদীরা অতি কম কথা বলে এবং ব্যবসায়ে অতি পটু। এখানে ইহুদী এবং ইণ্ডিয়ানদের একই অবস্থা। এদের কেউ দেখতে পারে না। উভয় জাতের লোকই বৃটিশের ধামাধরা এবং ইহধামকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে মরণের পর কল্পনার স্বর্গে গিয়ে বাস করবে এই ধারণা পোষণ করে। ইহুদীরা শিক্ষিত আর ভারতবাসীরা অশিক্ষিত। এখানে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতদের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখলাম না। অশিক্ষিত আরব নিজের দেশের জন্য বিনা দ্বিধায় প্রাণ দিতে এগিয়ে আসে বলেই পৃথিবীর লোক আরবকেই আরবের বাসিন্দা বলে মেনে নিয়েছে, কিন্তু ইহুদীকে আরবের বাসিন্দা বলে মেনে নিতে কেউ রাজি নয়। তবে এখানে নূতন ধরণের কয়েকজন ইহুদীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তারা বাস্তবিকই শিক্ষিত এবং বৃটিশের অনুগ্রহপ্রার্থী নয়। তারা এসেছে জার্মানী হতে পালিয়ে। তারা জার্মানীতেই ফিরে যেতে চায়, প্যালেস্টাইন-এ বৃটিশের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে থাকতে রাজি নয়। 'কখন কি ক'রে তারা জার্মানীতে ফিরে যেতে সক্ষম হবে' জিজ্ঞাসা করায় তারা বলেছিল "যেদিন বৃটিশের এজেণ্ট হিটলার জার্মানী ছাড়বে সে দিন তারা জার্মানীতে ফিরে যাবে।" রাষ্ট্রনীতি বড়ই গভীর। বৃটিশের এজেণ্ট হিটলার কথাটা তখন আমার মনে একটি বাতুলের প্রলাপই মনে হয়েছিল, কিন্তু যেদিন 'চেক'রা হাত উঠাল সেদিন

মনে করলাম হিটলার সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের এজেণ্ট না হউন মিত্র ত বটেই। তবে কালস্য কুটিলা গতি।

পৃথিবীতে সাতটি আশ্চর্য জিনিস আছে। তার মধ্যে একটি 'ব্যাবিলোনের শূন্য উদ্যান'। বৃটিশ লেখকগণ ব্যাবিলোন সম্বন্ধে কি লিখেছেন তার সবটা আমি জানি না। তবে তাঁরা লিখেছেন "হ্যাংগিং গার্ডেন্ অব্ ব্যাবিলোন"—আমি আজ তাই দেখতে চলেছি। এক-ঘোড়ার গাড়ীকে টাঙ্গা বলে। টাঙ্গা পাঞ্জাবী শব্দ। আমিও এই শব্দটি ব্যবহার করলাম কারণ আরব দেশে টাঙ্গার প্রচলন ছিল না। পাঞ্জাবীরাই টাঙ্গা গাড়ী আরবে প্রচলন করেছে। টাঙ্গার চালক হিন্দুস্থানী বলতে জানত এতে আমার বেশ সুবিধা হয়েছিল। রেল স্টেশন থেকে ব্যাবিলোন চার মাইল পথ হবে। পথের দুদিকে বালি। বালিগুলি পরীক্ষা করলাম তাতে প্রচুর ফসফরাস এবং ফেল্‌স্‌পার ছিল। সমুদ্র তীরের বালিতে শুধু ফসফরাস এবং ফেল্‌স্‌পার প্রচুর থাকে। চার মাইল চলে গিয়ে টাঙ্গা থেকে নামলাম।

একটু হেঁটে গিয়ে একটি প্রস্তর-মূর্তি দেখলাম। প্রস্তর মূর্তিটি গ্রেনেট পাথরের। গ্রেনেট পাথরখানা সলিড। পাথরটির উপরে একটি লোক শায়িত এবং তার উপর একটা সিংহ মানুষটাকে যেন খেতে যাচ্ছে মানুষটির শরীরের গঠন 'এপ' মানুষের মত। হাত পা বেঁটে, বুক প্রশস্ত কপাল চওড়া, কান বড় বড়। চুলগুলি লম্বা তবে যারা কখনও চুল কাটে না চুলের যত্ন নেয় না তাদের চুল যেমন খর্ব থাকে, এপ্ মানুষটির চুলও সেইরূপই। দাঁত একটু লম্বা তবে পশুর মত নয়। গাল লম্বা ও ভাঙ্গা চোখ ছোট, ভ্রূর চুল নেহাৎ কম নয়। শরীরের গঠন এবং মুখের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় লোকটি ক্লান্ত।

সিংহের দিকে তাকালেও মনে হয় এটা এ-যুগের সিংহ নয়। সিংহের

ঘাড় হতে লেজ পর্যন্ত শরীরের অনুপাতে কম লম্বা, কেশরও খর্ব। পায়ের থাবার নখ শক্ত এবং ছোট। মুখের দাঁত ছোট এবং ধারাল। চোখ অতি উজ্জ্বল এবং ছোট। মুখের হাঁ ছোট। কাছেই এই মূর্তির ছবি বিক্রয় হয়। একখানা কিনে দেখলাম ফটোতে মূর্তির সবটা প্রকাশ পায়নি।

মূর্তিটার কাছেই একটা প্রকাণ্ড গহ্বর। গহ্বর চুইয়ে জল আসছিল। যাঁরা পুরোনো স্থান রক্ষা করেন তাঁরা পাম্পের সাহায্যে জল বাইরে ফেলার বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছেন। গহ্বরটার নীচে নামা যায়, আমি তাতে না নেমে উপরে রক্ষিত একখানা ইট পরীক্ষা করলাম। ইটখানা ধূসর রংএর। একটু ভেঙ্গে দেখলাম ইটের ভেতরের রংও ধূসর বর্ণ। এটা আরব যুগের ইট নয়, আরব যুগের ইট ছোট এবং পাতলা। তাতে কর্মসুনিপুণতা দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাবিলোনের ইটে তার অভাব ছিল। মাটি দেখলে বোঝা যায় স্থানটি একদিন সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল। দুইশত সত্তর মাইল ব্যাপী স্থান নদীর কাদায় এবং এবং সমুদ্রের ঢেউ দ্বারা আনীত বালিতে মিশে চড়া পড়তে পড়তে অনেক সহস্র বৎসরের দরকার হয়। এতেই প্রমাণিত হয় ব্যাবিলোন অনেক সহস্র বৎসরের পুরাতন সভ্যতার আবাস-ভূমি ছিল।

আমার মনে হয় আমাদের দেশের পুরাতন ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজ ব্যাবিলোন সম্বন্ধে পূর্বে কিছুই জানতেন না। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁরা 'ওভার হ্যাংগিং গার্ডেন" বলে যখন কিছু পাঠ করছিলেন তখন তার অনুবাদ করেছিলেন "শূন্য-উদ্যান"। যাকে সন্ধি ক'রে ভূগোলে লেখা হয়েছে "শূন্যোদ্যান"। এরূপভাবে অনুবাদ করাটা তাঁদের মোটেই দোষ হয় নি; কারণ তখনকার দিনের বইগুলি এরূপ আজগুবি কথাতেই পূর্ণ ছিল।

তাদের কথা ছেড়ে দিয়ে আসল কথা বলতে চাই। খাড়ি জমিতে সিঁড়ির মত ক'রে বাগিচা করা হয়েছিল। সিঁড়ি যেমন ধীরে ধীরে উঁচুর দিকে

তির্যকভাবে হেলে গিয়ে মেঝেতে মেশে এটা কিন্তু সেরূপ ছিল না। এই সিঁড়িগুলি তির্যকভাবে সাগরের দিকে ঝুঁকে রয়েছিল। সেইজন্যই বলা হয়েছে—"ওভার হ্যাংগিং গার্ডেন"।

ব্যাবিলোন এত পুরাতন স্থান যার অতীতের কথা এখনও প্রত্নতত্ত্ববিদরা ঠিক করতে সক্ষম হন নি। অতি পুরাতন যুগে ব্যাবিলোন ছ'চার বিঘা জমি নিয়ে গড়া হয়েছিল। সেরূপ বাগিচা পৃথিবীতে বোধ হয় তখনকার দিনে একটিই ছিল। সেজন্যই এ বাগিচার এত নাম এবং পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যের মধ্যে তারও নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বিস্ময়ের অনেক আছে, তবে সে বিস্ময় সাধারণ লোকের কাছে ছিল না এবং এখনও নেই। ইতিহাস নিয়ে যাঁরা ঘাঁটাঘাটি করেন তাঁদের কাছে স্থানটি সপ্তাশ্চর্যের এক আশ্চর্য এবং অন্যের কাছে তা কেরাণীবাবু কথিত "অশ্বডিম্ব ছাড়া" আর কিছুই নয়।

জানি না, ঘোড়ার ডিম দেখলাম না আর কিছু দেখলাম। তবে 'ব্যাবিলোন' আমার দৃষ্টিশক্তির তেজ বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমার মধ্যে যে সংকীর্ণতা ছিল তার আর-এক পরত ব্যাবিলোন এক ঝাপটে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আরব সাগরে ফেলে দিয়েছিল। আমি এর পর থেকে পৃথিবীটাকে অন্যভাবে দেখতে আরম্ভ করি। সেই গল্পটার কথা এখনও মনে হয়। নর আর সিংহের লড়াই, মানুষ পরাজিত আর পশু বিজিত। আদিম যুগে মানুষ পশুকে ভয় ক'রে চলতো; আর এ যুগে মানুষ পশুকে ভয় করে না, পশুকে পশুর মত হত্যা করে। মানুষ এ যুগে পশুজয়ী। আজ যদি ব্যাবিলোনে সিংহের উপর একটা মানুষকে চড়িয়ে তার হাতে একটা চাবুক দিয়ে দেওয়া হয় তবে অন্যায় হবে না। একেই বলে মানুষের উন্নতির দিকে পরিবর্তনের সাক্ষ্য।

আজ আমরা যেমন ক'রে ব্যাবিলোন সম্বন্ধে ভাবি দশ বৎসর পূর্বে

রকেট, উড়ন্ত বোমা, ইলেকট্রোন এসবের কথা কেউ ভাবতাম না। মানুষ নিশ্চয়ই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যাবিলোন দেখে তা অনুভব করেছি বলে আমি গর্ব অনুভব করি।

সেদিনই বিকেল বেলা গাড়ি পেলাম এবং ফের তাতে চেপে বসরার দিকে রওনা হলাম। গাড়ীতে নানা রকমের লোক যাত্রী ছিলেন, আমি কাউকে ঘাঁটালাম না! কয়েক ঘণ্টা পরেই আর একজন ভারতীয় যাত্রী গাড়ীতে উঠলেন। ভারতীয় যাত্রী মহাশয়ের মাথায় ফেজ ছিল। রং তাঁর কুচ্ কুচে কালো। রেঙ্গুন থেকে এসেছেন। তাঁর আমার প্রতি কি এক ধারণা হ'ল বলতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে কাছে এসে বললেন, "আপনাকে রেঙ্গুনে কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে, তাই নয় কি?" নিশ্চয়ই আমাকে সেখানে দেখেছেন, ভারতের জীবন-প্রদীপ ব্রহ্ম প্রদেশে আমি ভ্রমণ করেছি।

লোকটি জারবেদী। জারবেদীরা ভয়ানক এন্‌টি-ইণ্ডিয়ান এবং ফেনাটিক। ব্রহ্মপ্রদেশকে ভারতের আয়ুরেখা বলায় লোকটির ভয়ানক রাগ হয় এবং তিনি আমাকে বার বার বলতে থাকেন—"ব্রহ্মদেশবাসীর নিজের ভাগ্য নির্ণয় করবার অধিকার আছে, আমরা ভারতের সঙ্গে থাকতে চাই না।"

কথা অনেকই হয়েছিল, এখানে ব্রহ্ম প্রদেশের কথা টেনে আনতে চাই না, তবে একটা কথা বলবার অধিকার আছে, যারা সোভিয়েট রুশিয়ার অনুকরণে সেল্‌ফ ডিটারমিনেশনের কথা বলে উজ্‌বেগীস্তানের উল্লেখ করে, তারা জানে না। উজবেগদের মানুষ করতে স্ট্যালিনের কত বেগ পেতে হয়েছিল। আগে নিজে মানুষ হয়ে অপরকে মানুষ কর, তারপর সেল্‌ফ ডিটারমিনেশনের কথা বলা উচিত; এর পূর্বে নয়। সেল্‌ফ ডিটারমিনেশনের অর্থ নানা রকমের হয়। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সেল্‌ফ ডিটারমিনেশনের নাম ক'রে অনেক দেশেই চুটিয়ে রাজত্ব করেছে।

গাড়ী সকাল বেলা 'মারগিলে' এসে থামল। স্টেশন থেকে নেমে রেলওয়ে গার্ডদের মেসে গিয়ে উঠলাম। একজন গার্ড তাদের মেসে যাওয়ার জন্য আমাকে বলেছিলেন। আরব এবং ইণ্ডিয়ান উভয় জাতের লোক একই মেসে থাকে। মেসের পাচক একজন ইহুদী। লোকটির পাক আমি খাইনি, তবে তার পোশাক দেখে হাসি পেত। লাল ফেজ মাথায় দিয়ে পা পর্যন্ত একটা লম্বা কোটের উপরে কোমরে লম্বা কাপড় বেল্টের মত বেঁধে যখন সে বাজারে বেরিয়ে যেত তখন অনেকক্ষণ তার দিকে আমি তাকিয়ে দেখতাম।

এদিকের আরবরা মাথায় ফেজ দেয় না। একদিন তুরুকরা ফেজ মাথায় দিত বলে আজও যারা তুরুক ভয়ে ভীত তারা ফেজ ব্যবহার করে। আরবদেশের আরব যেমন ফেজ ব্যবহার করে না, তেমনি তারা প্যান-ইস্‌লামেও যোগ দেয় না। প্যান-ইস্‌লামে তুরুক ভয় যেন এখনও জড়িত আছে। আরব অনেকদিন তুরুকের অধীন ছিল, সেইজন্যই তারা এখন ফেজকে বিদেশী শিরস্ত্রাণ বলেই গণ্য করে।

প্যান-ইস্‌লাম নিয়ে কখনও আমি কথা বলিনি। কিন্তু অনেক আরব নিজে এসে আমাকে প্যান-ইস্‌লামের প্রচারক ভেবে এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছেন। আমি তাদের কথা আগ্রহ করে শুনেছি কিন্তু যখন উত্তর দেবার পালা এসেছে তখনই আমি মামুলি পর্যটক বলে পরিচয় দিয়ে এসব বাজে কথা হতে রক্ষা পেয়েছি।

মারগিল্‌ হতে বস্‌রা পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। বাস প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর যাওয়া আসা করে। পরের দিনই বস্‌রাতে রওনা হলাম। পিচ দেওয়া পথের দু'দিকে একরকম লম্বা ঘাস হয়েছে। সে ঘাসগুলি অতি সূক্ষ্ম এবং দুটো দিকই একটু ধারাল। গরম দেশে বালুকণার উপর এরূপ ঘাস প্রায়ই দেখা যায় কিন্তু আরব কবি এই ঘাসের সৌন্দর্য লিখে,

তার গান গেয়ে রবীন্দ্ররচনাবলীকে বহু পেছনে রেখে অনেক এগিয়ে গিয়েছেন।

বস্‌রা সমুদ্রতীরে অবস্থিত নয়। সমুদ্র হতে কয়েকটি উল্টো জলস্রোত বস্‌রার তিন দিক ঘিরে ফেলেছে। অন্য কথায় বলা যেতে পারে, সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট ভূমিখণ্ডের উপর বস্‌রা শহর গড়ে উঠেছে। বস্‌রাতে কয়েকটি বাগিচা আছে। তাতে গোলাপ হয়। সে গোলাপ অন্য দেশের গোলাপ হতে একটুও উৎকৃষ্ট নয়, তবুও কবি গাইছেন বস্‌রার গোলাপের কথা। সেই কথার ঢেউ আরব সাগর পার হয়ে বাংলা দেশ পর্যন্ত এসেছে। বাঙ্গালী ভাবে বস্‌রা গোলাপময়। প্রকৃতপক্ষে কলকাতার যে কোন ওয়ার্ডের উৎপন্ন গোলাপ একত্রিত করলে বস্‌রার গোলাপের পরিমাণ থেকে অনেক বেশী হবে। আমি সাইকেল নিয়ে বস্‌রার গোলাপোদ্যান দেখতে বের হয়ে দু'শ ফুটন্ত গোলাপও দেখতে পাই নি। বস্‌রা আরবের কাছে প্রিয়, অতএব বস্‌রা গোলাপে ভর্তি আরবের কাছেই।

বস্‌রার আশে-পাশে অনেক ঐতিহাসিক স্থান আছে তবে সেই স্থানগুলি আমাকে টানতে পারে নি। আমি মারগিলের বাবুরোডে অনেক দিন কাটিয়েছি এবং বাবুরোডের কথা ভেবে দু'এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেছি। শুনতে পাওয়া যায় বস্‌রার বাবুরোড বাবুদের দ্বারাই তৈরী হয়েছিল। একজন ভারতীয় জমাদার পথ প্রস্তুতের সুপারভাইজার ছিল আজ। বাবুরোডের দুদিকে সুন্দর ফুলের বাগিচা হয়েছে। তাতে গোলাপের গন্ধে সকাল বেলা বাবুরোড আমোদিত হয়। বাবুরোডে বাবুদের দ্বারা রোপিত গোলাপের গন্ধ অনুভব করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বাবুরোডের কথা অনেকেই ভুলতে যাচ্ছিল কিন্তু সেই বাবুরোড আবার লোকারণ্য হয়েছে গত মহাযুদ্ধের জন্য।

ভারতের সঙ্গে ইরাকের রেলের মিলন নিশ্চয়ই হবে। পুঁজিবাদী জাহাজ কোম্পানীর কথা ভবিষ্যতে কেউ শুনবে না। মারগিলের বৈচিত্র্যময় বিশিষ্টতা একদম লোপ পাবে। স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য যদি করা যেতে পারে তবে জলপথে কে যেতে চায়? বৃটিশ বণিকদের সেদিকে স্বার্থ হানি হবে বলেই তারা এখনও ভারতের সঙ্গে আরব দেশের রেলপথের সংযোগ করছে না।

'মারগিল' সম্বন্ধে এখনও পত্ত লেখার সময় হয় নি, কারণ 'মারগিল' অথবা বস্‌রা এলাকাতে লোকের বসতি অতি কম। সমুদ্র পথে ব্যবসা -বাণিজ্য যা হয় তা শুধু ভারতের সঙ্গেই। বড় বড় নৌকার সাহায্যেও ব্যবসা হয় তবে তা শুধু আরবের উপকূলভাগেই হয়। অতএব এর মধ্যে রোমাঞ্চ বলে কিছু বের করবার নেই। আরব্য রজনী রচনা করার মত অনেক কিছু সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়।

মারগিলে কয়েক জন বাঙ্গালী কেরাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার পর এক দিনের মধ্যে তৈরী হয়ে পুনরায় বাগ্‌দাদের দিকে রওনা হইলাম। দেখবার উপযুক্ত যদি কিছু থাকে তবে বস্‌রাতেই ছিল। মারগিলে কিছুই দেখবার অথবা জানবার ছিল না।

যাঁরা আরব-সভ্যতা সম্বন্ধে কিছুটা জানেন, তাঁরা দামাস্কাস নগরের সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর সংবাদ নিশ্চয়ই রাখেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পৃথিবী পরিবর্তনশীল। কেউ কোনদিন ভাবেনি মরুভূমির উপর দিয়ে মোটর বাস হন্‌হন্ ক'রে চলবে। কেউ ভাবেনি আরব দেশ নানা ভাগে বিভক্ত হবে, কিন্তু আজ আরবের মরুভূমিতে বিজলী বাতির আলো প্রজ্বলিত হয়েছে, মরুভূমির উপর দিয়ে মোটর চলেছে, আরব জাত পরিবর্তনের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

আরবের মরুভূমিতে পরাধীনতা বলে কিছু ছিল না। আরব বেদুইন

কখনও কারো কাছে মাথা নত করে নি। আরব বেদুইন মাথা নত করে শুধু আল্লার কাছে, আর মাথা নত করে যখন তার মাথা তলোয়ারের আঘাতে শরীর থেকে চ্যুত হয়। আরবের ভিখারী পর্যন্ত উন্নত শিরে "জাকাত" আদায় করে, ভিক্ষা তারা চায় না।

বাগ্দাদ থেকে দামাস্কাস চারশত একষট্টি মাইল দূরে অবস্থিত। এর মধ্যে চারশত মাইলব্যাপী এক মরুভূমি। স্থানে স্থানে মরূদ্যান আছে। কিন্তু বাগ্দাদ থেকে সাড়ে তিনশত মাইল না গেলে একটিও মরূদ্যান পাওয়া যায় না। শিক্ষিত ভারতবাসীরা আমাকে সেরূপ মরুভূমির মধ্য দিয়েই সাইকেলে চলে যেতে বলেছিলেন। কয়েক মাইল গিয়েও ছিলাম, কিন্তু সুবুদ্ধির উদয় হওয়ায় ফিরে এসেছিলাম। নতুবা আজ আর আমাকে ভ্রমণ কথা লিখতে হতো না। মরুভূমির মধ্যে বালিতে চাপা পড়ে থাকতে হত।

বাগ্দাদ থেকে অনেকগুলি বাস দামাস্কাসে যায়। তারই একটি বাসে দুই পাউণ্ড (ছাব্বিশ টাকা দশ আনা) দিয়ে একখানা টিকিট কিনে একদিন হারুণ-অল-রশিদের বাগ্দাদ ছেড়ে ঐতিহাসিক নগর দামাস্কাসের দিকে রওনা হলাম।

সুন্দর পথ ধরে আমাদের বাস 'ফেলুজা' পর্যন্ত এল। ফেলুজাতে যাবার পর আমি এক মাদ্রাসার শিক্ষকের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলাম। তিনি আরবী ভাষাতে মৌলবী এবং ফ্রেঞ্চ ম্যাট্রিক। একটু আধটু ইংলিশ ভাষাও বলতে পারেন। তাঁর উদারতায় গ্রামের লোক মুগ্ধ। তিনি আমার লেকচার গ্রামবাসীদিগকে অন্য একজন দোভাষীর মারফতে অনুবাদ ক'রে শুনিয়ে দিলেন। দোভাষী বেশ ভাল হিন্দুস্থানী জানতেন, তিনি সে জন্য আমার মনের কথা ঠিকভাবেই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। দোভাষী কখনও ভারতে আসেন নি। অনেক দিন মক্কায় ছিলেন এবং ভারতীয় হাজিদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এতেই এত

সুন্দর ক'রে হিন্দুস্থানী বলতে সক্ষম হয়েছেন দেখে অবাক্ লেগে ছিল। আরব-জাতির মস্তিষ্ক সাধারণতঃই পরিষ্কার, তারপর ভদ্রলোক নানাদেশ বেড়িয়েছেন, একটা বৈদেশিক ভাষা আয়ত্ত করা তাঁর পক্ষে যদিও সহজ ছিল, কিন্তু এমন সুন্দর ক'রে গুছিয়ে বলতে পারবেন, তা আমার ধারণাও হয়নি।

লেকচার দেবার পর মাদ্রাসার ছাত্রেরা ভারতের কথা একটিও জিজ্ঞাসা করল না। চীন দেশে কত মুসলমান আছে তার কথাও ওঠাল না; তারা জিজ্ঞাসা করল—জাপানীরা নিজের জাতের উন্নতির জন্য পেট কেটে মরে, সেই দেশ-প্রেমটা কি ক'রে তাদের মধ্যে জাগল। তারপর জিজ্ঞাসা করল—চীন দেশে 'চুতে' কোন্ শক্তির সাহায্যে চারহাজার মাইল পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। তাদের প্রশ্নের উত্তর পরদিন আমাকে দিতে হয়েছিল। ভারতে ফিরে আসার পর আমাদের দেশের ছেলেরা জিজ্ঞাসা করেছিল—স্বামী বিবেকানন্দ কি আমেরিকার সবাইকে হিন্দু করেছেন? চীন দেশে কত মুসলমান আছে? এখানেই আমাদের এবং আরবদের মধ্যে পার্থক্য।

দামাস্কাসে এসে আমি দিন কয়েক ছিলাম। পৌঁছবার পরদিন রাস্তায় বের হয়ে দেখলাম, পথে পথে ট্রাম লাইন আছে, কিন্তু গাড়ী নেই। শহরটি ছোট বলেই ট্রাম না থাকায় কষ্ট হয় না। কলকাতার মত বড় শহরে ট্রাম না থাকলে আমাদের কত কষ্ট হত, কত লোক বেকার হত তার হিসেব রাখাও মুস্কিল।

দামাস্কাসে একবার ভয়ানক দাঙ্গা হয়। দাঙ্গা প্রথম শুরু হয় সিয়া এবং সুন্নিতে, কিন্তু সুন্নিরা বুদ্ধি ক'রে সেই দাঙ্গা সর্বজনীন ক'রে তুলেন, তারই ফলে এখন বৈদেশিক মূলধনে পরিচালিত ট্রাম কোম্পানী অচল হয়ে গেছে।

দামাস্কাস শহরে রেঁস্তোরার ছড়াছড়ি। পাক করতে কেউ যেন রাজী নয়, সবাই রেঁস্তোরায় খেয়েই তৃপ্ত। রেঁস্তোরা হ'ল পলিটিসিয়ানদের মিলনের স্থান, চোর ডাকাতের পরামর্শের আড্ডা, কূট-নৈতিকদের বিশ্রাম-স্থান। রেঁস্তোরায় চেঁচিয়ে কেউ কথা বলে না। পলিটিক্স নিয়ে বেশ তর্কযুদ্ধ হচ্ছে অথচ অন্য টেবিলের লোক তার সন্ধান পাচ্ছে না। কথাটা অনেকটা আজগুবিই বটে। যারা পলিটিক্স করে তারা ঢাক ঢোল পিটায় না, কাজ করে। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করেছিল, জাপান মান্চুরিয়া দখল করেছিল, ভারতে নন্-কো-অপারেশন জোরের সঙ্গেই চলছিল, সিরিয়া স্বাধীন হবে কি পরাধীন থাকবে তাই আলোচনা হচ্ছিল। হিটলার শক্তিমন্ত হয়েছিলেন। স্ট্যালিন লোকান্তরালে থেকে রুশ দেশকে তৈরী করছিলেন। ট্রটস্কি উচ্চস্বরে স্ট্যালিনের মৃত্যুকামনা করছিলেন। কলোনিয়াল দেশগুলি স্ট্যালিন এবং ট্রটস্কির মতান্তরকে নিজেদের মধ্যে টেনে আনছিল। সিরিয়া সেই টানাটানির মধ্যে পড়েছিল। সুখের বিষয়, আমি এ বিষয়ে নীরব থাকায় ভয়ানক বিপদ থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। আজ যে বন্ধুত্ব করছে কাল এই মতবাদ নিয়ে একের মুখ অন্যে দেখছে না। মারামারি, গুলি-ছোঁড়া অনবরত চলছিল। কে বলে সিরিয়া রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে পিছপাও? ক্রমাগত এগিয়ে চলছিল। বন্যার জলে ভাসিয়ে দিচ্ছিল ধর্মের বৈষম্য। আমি সেই সময়ে সিরিয়ার গ্রামে গ্রামে ঘুরছিলাম। সেই পুরাতন স্মৃতি মনে ক'রে এখনও নিজেকে আনন্দিত মনে করি।

আমেরিকার পথে লণ্ডন

আমেরিকা গণতন্ত্রের দেশ। স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস, জর্জ ওয়াশিংটন ও লিন্‌কনের কথা প্রসিদ্ধ এই দেশটি দেখবার জন্যে আমার অন্তরে অনেকদিন থেকেই একটা তীব্র আবেগ জাগিয়ে রেখেছিল। এতদিন পরে যখন সেই আমেরিকার পথে পা বাড়ালাম, মন তখন আশা ও আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল।

ডার্‌বানে আমেরিকা যাবার টিকিট কেনার চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু টিকিট কেনা আমার দ্বারা সম্ভবপর হয় নি। জাহাজের এজেণ্টরা কেউ বলে, সকল বার্থই ভাড়া হয়ে গিয়েছে, গতকাল যদি আসতেন তবে নিশ্চয়ই একটা বার্থ পেয়ে যেতেন। কেউ বলে আগামী ছয় মাসের জন্য সমস্ত জাহাজটাই ভাড়া হয়ে গেছে। এসব কথা শুনে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। বন্ধুবান্ধবদের কাছে সাগর পার হবার একটা উপায় খোঁজবার ভার দিয়েছিলাম এবং নিজেও খুঁজছিলাম।

রেডিওতে লেকচার দেওয়া তখন আমার একটা পেশা হয়ে গিয়েছিল, কারণ সকলেই বিদেশের খবর শুনতে উৎসুক ছিল। ডার্‌বানে এসে টিকিট কেনার কাজে ব্যস্ত থাকায় সেদিকে মন দিতে পারিনি কিন্তু হঠাৎ একদিন একজন রেডিও ব্রোকার বলল যে, প্রধান এনাউন্সার হলেন একজন প্রাক্তন সৈন্য এবং অনেক জাহাজ কোম্পানীর লোকের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ রয়েছে। হয়ত রেডিওতে লেকচার দিলে তিনি জাহাজের টিকিট কেনার কোনরূপ সুবিধা ক'রে দিতে পারেন। আমি তৎক্ষণাৎ ডার্‌বানের বেতারে লেকচার দিতে স্বীকৃত হলাম। লেকচার দেবার পর প্রধান এনাউন্সার আমায় টিকিট কেনায় সাহায্য করেন। তিনি যদি টিকিট

কিনতে আমাকে সাহায্য না করতেন, তবে আমাকে অন্য কোন উপায়ে বিলাত যেতে হ'ত।

টিকিট কেনা হয়ে গেলে ইস্ট-লণ্ডন হয়ে পোর্ট এলিজাবেথ থেকে কেপ্‌-টাউনে যাই এবং সেখান থেকে ক্যাসেল্ লাইনের যাত্রী-জাহাজে সাউদাম্‌টনের দিকে রওনা হই।

কেপ্‌টাউনে আমাকে অনেক দিন থাকতে হয়েছিল। কেপ্‌টাউন দেখার জন্য অনেক আমেরিকান ও ইউরোপীয়ান লালায়িত। এতে কেউ সফলকাম হয়, আর কেউ হয় না।

ইংলণ্ডের পথে জাহাজে এক ভারতীয় ভদ্রলোককে আমার কেবিনে সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। তিনি তাঁর পরিচয় সংক্ষেপে দিয়ে আমার বোঁচকার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন এবং বললেন, "এরূপ পুঁটলি নিয়ে বিলাত চলেছেন, এটা দেখে লোকে যে হাসবে!" আমি তাঁর কথার কোন প্রতিবাদ না ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাইনিং রুমে আপনি কোন্ দিকে বসে খান?" তিনি গম্ভীর হয়ে জানালেন—কেবিনে তাঁর খাবার এনে দেওয়া হয়। আমি বললাম, "কেবিন তো শোবার জন্য, খাবার জন্য ডাইনিং হল্ রয়েছে, সেখানেই গিয়ে আমরা খেয়ে আসতে পারি।" তারপরই বল্লাম, "চলুন এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে আসি।" ভদ্রলোক দুই চোখ কপালে তুলে বললেন—"যান, অপমানিত হয়ে আসুন।" ভদ্র-লোকের কথার ভাবে বুঝতে পারলাম স্মোকিং রুমে গেলেই অপমানিত হতে হবে; তাই তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'যদি কিছু ঘটে তার জন্য আমি দায়ী হব, আপনি চলুন।' তিনি বিয়ার খেতে রাজী ছিলেন কিন্তু স্মোকিং রুমে যেতে রাজি ছিলেন না, তবু এক রকম জোর করেই তাঁকে বিয়ারের দোকানে নিয়ে গিয়েছিলাম। স্মোকিং রুমে গিয়েই দু'গ্লাস বিয়ারের জন্য আদেশ করলাম। বোধ হয় পনেরো মিনিট পরে বিয়ার নিয়ে একজন

ইংরেজ ছোক্‌রা এল। তাকে বিয়ারের দাম বাবদ এক শিলিং দিয়ে আর একটি শিলিং দিলাম বখ্‌শিস স্বরূপ। অন্যান্য যাত্রীরা তিন পেনীর বেশী কেউ বখ্‌শিস দেয় নি সেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল। এখনও পৃথিবী টাকার বশ। এক শিলিং বখ্‌শিস পেয়ে ইংলিশ বয় আমাদের অনুগত হয়ে পড়ল এবং কোন কিছুর আদেশ দিলেই সর্বাগ্রে আমাদের হুকুমই তামিল করতে লাগল।

আমার কেবিন-সাথীটি হলেন ব্যবসায়ে ধোপা। তাঁর আয় বৎসরে পাঁচ হাজার পাউণ্ড। তিনিও প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনতে পারেন নি। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিন্‌তে পেরেছিলেন, আমারই টিকিটের লেজ ধরে। যাহোক, আমাদের মধ্যে মোটেই মনের মিল ছিল না—কারণ তিনি ধনী আর আমি দরিদ্র। এই যে শ্রেণীযুদ্ধ, আজ পর্যন্ত কেউ তাড়াতে পারেনি, এড়াতেও পারা যায় না। শ্রেণীযুদ্ধের অবসান হয়েছে রুশিয়ায়, লেনিনের ভালবাসায় এবং স্ট্যালিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে। যদিও আমরা দুজনেই ইণ্ডিয়ান, দুজনের একই ধর্ম, কিন্তু আমাদের আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল। ধনী শতকষ্ট সহ্য করতে রাজী, কিন্তু যার রক্ত শোষণে ধনীর শরীর পুষ্ট হয়েছে, তার কাছে বসতেও রাজি নয়। আমার ধনী বন্ধু বুয়ারদের লাঞ্ছনা নিঃশব্দে হজম করে তাদের সঙ্গেই মেলামেশা করবার জন্যে আগ্রহান্বিত কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলতেও রাজী নন—যদিও আমার চামড়া তাঁরই মত কালো!

বিয়ার খেয়েই যেন তাঁর অনেকটা জ্ঞান হ'ল, তখন তিনি আমাকে বললেন স্মোকিংরুমে যেতে কোনদিনই তাঁর সাহস হয় নি। আমি সঙ্গে থাকায় আজ তাঁর সে সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি ডার্‌বানে জাহাজে উঠেছিলেন এবং 'ডি' ডেকে তাঁর দুদিন কেটেছিল। আমি তাঁকে বললাম, পূর্বেও একবার আমি লণ্ডন দেখেছি এবং সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করেছি;

তাই বুয়ারদের দেখে আর আমার ভয় হয় না। আমার সাহস দেখে সহযাত্রী ভারতীয়টির মনে বেশ আনন্দ হয়েছিল। তিনি আমাকে নাবিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। নাবিকরা আমার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অনেক কথা শোনার পর অনেকেই আমার বন্ধু হয়েছিল।

কদিন পরেই আমাদের জাহাজ সাউদাম্‌টন্ গিয়ে পৌছাল। পূর্বেও আমি একবার লণ্ডনে গিয়েছিলাম। সেবারে আমি ছিলাম ক্লান্ত, রিক্ত-হস্ত এবং পেটের ক্ষুধায় জর্জরিত। এবার কিন্তু তা নয়। এবার খেয়ে খেয়ে ডিস্‌পেপসিয়া ধরেছে। পকেটে কিছু টাকা আছে। টাকা মনে আনন্দ এনে দিয়েছে। তাই সে আনন্দকে বাড়িয়ে তোলার জন্য লণ্ডন দেখার একটা ফর্দ ক'রে নিলাম এবং ঠিক করলাম এবার প্রাণ ভরে লণ্ডন দেখে নেব।

দূর থেকে সাউদাম্‌টনের লাইট হাউসের আলোক-রেখা দেখে মন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। আমাদের ও নেটিভদের আনন্দ সমান নয়। তাদের হ'ল মাতৃভূমি আর আমাদের হ'ল বিদেশ।

পিঠ-ঝোলাতে সামান্য জিনিসপত্র চড়িয়ে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে পড়লাম। আমরা সবাই গিয়ে বসলাম রেলস্টেশনে কাস্টম হাউসে। সেখানে জিনিসপত্র পরীক্ষা হবে। কাস্টম হাউসে একটি রেঁস্তোরাও ছিল, তাতে সকলে চা পানে ব্যস্ত। আমিও চায়ের আদেশ করলাম।

সাউদাম্‌টনে একটা সুন্দর নিয়ম আছে। যে-ই বিদেশ থেকে একটা বড় জাহাজ এল, অমনি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। আমাকেও নেটিভদের সঙ্গে স্পেশাল ট্রেনে ওয়াটারলু স্টেশন পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। আমাদের জন্য বসবার স্থানের রিজারভেসন ছিল না বলেই সর্বত্র বসবার অধিকার ছিল। নিশ্চিন্ত মনে একটা কামরাতে ঢুকে পড়লাম। গাড়ী

ছাড়ল এবং চলল লণ্ডনের দিকে। ওয়াটারলু স্টেশনে নামার পর আমার পরিচিত কালা আদমীদের দ্বারা পরিচালিত ওয়াই, এম, সি, এ-তে গিয়ে উঠলাম। এখানে এসে মনে হ'ল দক্ষিণ আফ্রিকার অমানুষিক 'কালার বারের' গন্ধ কিছুটা দূর হয়েছে। এখানে তবুও কতকটা স্বাধীনতা আছে। যাঁরা বলেন ইংলণ্ডে কালার বার নেই, তাঁরাও কিন্তু সত্য কথা বলেন না। এখানেও কালার বার আছে, তবে দক্ষিণ আফ্রিকার মত নয়। আমেরিকার দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে আসছি দেখে মনে বড়ই আনন্দ হয়েছিল।

লণ্ডন নগরের নাম কে না জানে? সকলেই লণ্ডন দেখতে চায়, কিন্তু পেরে ওঠে না। তাই অনেকেই ভ্রমণ কাহিনী পড়ে মনের পিপাসা মেটায়। যারা লণ্ডনে যায়, তারাও সব সময় নগরের সত্য বর্ণনা দিতে পারে না। সেখানে ভালও আছে, মন্দও আছে। মন্দের দিকটা সাধারণত চাপা থাকে কারণ অধীন জাতির পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীব কুৎসা করা অকর্তব্য। যেখানে কথা বলবার ক্ষমতা রয়েছে, ব্যক্তি স্বাধীনতা বর্তমান, সেখানে গিয়ে ভারতবাসী সামান্য দুঃখকষ্টের কথা ভুলে যায়।

দেখবার এবং জানবার প্রবল বাসনা আমার মনকে নাচিয়ে তুলেছিল। লাফালাফি করতে হলে পেট ভরে খেতে হয়, শুতে হয় উত্তম শয্যায়, তবেই চিন্তাধারা ঠিক পথে চলে। এবার আমার খাবারের চিন্তা মোটেই ছিল না, কারণ রেঁস্তোরাতে প্রবেশ করতে আমাকে কেউ নিষেধ করছিল না। কিন্তু কোথায় থাকব এই হয়েছিল ভাবনা।

ওয়াটারলু স্টেশনে পৌঁছলাম বোধ হয় বারটার সময়। তার পর থেকেই ঘরের খোঁজে বার হই। যার হাতে টাকা আছে তার ঘর খোজার দরকার নেই, যে কোনও হোটেলে গেলেই হয়। কিন্তু অনেক দিনের দরিদ্রতার ফলে একটু বেশী রকম মিতব্যয়িতার জ্ঞান অর্জন করেছিলাম এবং সে জ্ঞান সহজে বর্জন করা আমাদের দ্বারা হয়ে উঠছিল না।

ঘরের খোঁজে বার হয়েছি সস্তায় থাকব বলে। ইউস্টন্ স্কোয়ার থেকে এলগেট্ পর্যন্ত ঘর খুঁজেছি কিন্তু কোথাও ঘর পাইনি। এই পথটার মধ্যে অন্তত দুই শত জায়গায় ঝুলছিল ঘর ভাড়ার বিজ্ঞাপন। কিন্তু ঘরগুলি আমার মত কালো আদমির জন্য নয়, সাদা চামড়ার জন্য। এক স্থানে একজন লোক বেরিয়ে এসে অতি নম্রভাবে বললেন, "এই মাত্র সব ঘরই ভাড়া হয়ে গেছে, কি করি বলুন তো?" আমি বললাম, "বিজ্ঞাপনটি উঠিয়ে যদি নিতেন তবে আর আমাকে কষ্ট করতে হত না।" ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ ভদ্রতা ক'রে বিজ্ঞাপনটি উঠিয়ে ঘরে নিয়ে রেখে ফের বাইরে এসে আমাকে বললেন, "এমন ক'রে আপনার ঘর খোঁজা অনর্থক হবে। যে পাড়ায় ভারতীয় ছাত্ররা অথবা মজুররা থাকে সেখানে যান সুবিধা হবে—আপনার জন্য কেউ ব্যবসার ক্ষতি করবে না।" ব্যাপারটা বুঝলাম; আমার কালো-মুখই ঘর পাবার প্রতিবন্ধক ছিল। বিলাত-ফেরতা সুধীজন কি এসব কথা দেশে এসে কখনও কারো কাছে বলেছেন? তাঁরা এসব কথা বলতে পারেন না কারণ এসব কথা বললে যে তাঁদেরই বাহাদুরী চলে যাবে।

ইস্ট-ইণ্ডিয়া ডকে যাবার ইচ্ছা ছিল না কারণ এখন আমি ধনী আর যে সকল ভারতবাসী সেখানে থাকে তারা দরিদ্র। কিন্তু এ অভিমান আমার বেশীক্ষণ রইল না। চললাম ডকের দিকে সর্বহারাদের কাছে। তাদের কিছু নেই, তাই অভিমান তাদের কাছে ঘেঁষে না। ভরসা এই তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে না। নব্বই নম্বর হাই ষ্ট্রীটে একটি হিন্দুস্থানী অ্যাসোসিয়েশন আছে। ভাবলাম সেখানে গিয়ে মুসলমানদের সঙ্গেই রাত্রিটা কাটিয়ে আসি। গিয়ে দেখি দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা রয়েছে, 'চাবি উপরে আছে'। আমি উপরে উঠে চাবি নিয়ে এসে দরজা খুলে তিনটে বেঞ্চ একত্র ক'রে হাতটা বালিশ ক'রে মহানন্দে শুয়ে পড়লাম। পরিশ্রম করলে আপনা থেকে

ঘুম আসে। ঘুম এসে আমার সকল ব্যথার অবসান করেছিল।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম। বোধ হয় রাত্রি তখন এগারটা হবে, একটি মহিলা এসে আমাকে জাগালেন। মহিলার সম্মান রক্ষা করা পুরুষের কর্তব্য। তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে মহিলাকে সম্মান জানালাম। মহিলা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। এভাবে পরিচয় জিজ্ঞাসা করার নিয়ম যদিও তাদের মধ্যে নেই তবুও আমার পরিচয় চেয়েছিলেন এবং আমার পরিচয় পেয়ে মহিলাটি আমাকে বসতে বলেই কাছের বাড়ীতে গিয়ে একটি যুবককে ডেকে এনে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। যুবক অল্প সময়ের মধ্যেই আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে নিয়ে বললেন, "এই তো মোটে সন্ধ্যা হ'ল, চলুন একটু বেড়িয়ে আসি, আজ রাত্রে আর বাসা ভাড়া হবে না।" উভয়ে কাছের ছোট রেঁস্তোরা থেকে চা খেয়ে টিউব স্টেশনে নেমে পড়লাম এবং ট্রেনে হাইড পার্কের কাছে এসে উঠলাম।

হাইড পার্কে অনেক দিন বেড়িয়েছি। হাইড পার্কের যদি তুলনা দিতে হয়, তবে একমাত্র হাইড পার্কই তার তুলনা। লণ্ডনের হাইড পার্ক স্বাধীনতার কেন্দ্রস্থল। ছোট স্ট্যাণ্ডে এর উপর দাঁড়িয়ে যা ইচ্ছে বলে যাও, কেউ কিছু বলবে না। সেখানে যীশু, মোহম্মদ, বুদ্ধ, শঙ্করের যেমন শ্রাদ্ধ হয়, তেমনি হয় চেম্বারলেন, দালাদিয়ের, মুসোলিনী, হিটলার ও স্ট্যালিন প্রভৃতির। শুনতে ভাল লাগে শোন, নতুবা পথ দেখ, কারণ এটা হাইড পার্ক, বাক্‌স্বাধীনতার পীঠস্থান। ভারতের সংবাদপত্র ধর্ম নিয়ে সোজা কথা বলতেও ভয় পায়। ভয় এই যে, হয়তো গ্রাহক কমে যাবে নয়তো ছোরার আঘাতে সম্পাদকের প্রাণহানি হবে। কিন্তু হাইড পার্কে সে ভয় নাই। যারা স্বাধীনচেতা তারা ছোরা মারে না, তারা নীরবে সবই সহ্য ক'রে যায়।

হাইড পার্কের বিজলী বাতিগুলি যেন সভ্যজগতের কলঙ্কের অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে অন্তত একটুখানি জায়গাকে স্বর্গীয় ছটায় আলোকিত ক'রে রেখেছে, সেখানে মানুষ একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে পারে। হাইড পার্কের স্নিগ্ধ মৃদুমন্দ বাতাস নরনারীর মনকে উদার ও নির্ভীক করে। হাইড পার্ক আনন্দময়! যুবক যুবতী জোড়া বেঁধে একে অন্যের কাছে আপন আপন সুখদুঃখের কথা প্রকাশ করে। একে অন্যের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখে এবং যতদূর সম্ভব নিজের কাজের জন্য অপরের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখে। যেখানে সহিষ্ণুতা বিদ্যমান সেখানেই স্বাধীনতার অঙ্কুর গজায়, সেখানে সুখ এবং শান্তি আপনা থেকে এসে দেখা দেয়।

সেই শান্তিময় স্থানে গিয়ে আমি এবং আমার বেকার সাথী একটি গাছের তলায় বিশ্রামার্থে শুয়ে পড়লাম। চিন্তা আমাদের আচ্ছন্ন করল! আমার কাছে অর্থ আছে তবুও ঘর পাচ্ছিলাম না, সাথীর শরীরে প্রচুর শক্তি, মুখে যৌবনশ্রী ছিল—তবুও তার চাকরি জুটছিল না। এটা কি চিন্তার বিষয় নয়! আমি হাইড পার্ককে কেন স্বর্গ বলতে চেয়েছি তাও জানা উচিত। সেই কারণটি হ'ল হাইড পার্কে বসে বা দাঁড়িয়ে, কলে কৌশলে নয়, সরল এবং স্পষ্ট ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। এটা কি কম কথা?

ভারতের বেকারে এবং ইউরোপের বেকারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ভারতের বেকার আপনার কপাল ঠোকে আর বলে, "ভাগ্য মন্দ, তাই খেতে পাচ্ছি না, কাজ পাচ্ছি না।" ব্রিটেনের মজুর ভাবে, 'কাজ করবার অধিকার তার আছে, কাজ পাবে না কেন?' কে তার অন্তরায়? সাথী নেটিভ আমাকে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলল। আমি মন দিয়ে তা শুনলাম। তারপর মন্তব্য করতে বাধ্য হলাম। আমি তাকে বললাম, "মজুর-জগতে যেরূপ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, আমার মনেও ঠিক সেইরূপ পরিবর্তনের

অঙ্কুর অনেকদিন পূর্বে গজিয়ে ছিল; এখন পত্রপুষ্পে শোভিত হয়েছে। পূর্বে আমি ভাবতাম, জীব আপন কর্মফলে কষ্ট পায়, এখন দেখছি কতকগুলি বিশেষ লোকের কথায় নরসমাজে অন্ধ হয়ে তাদের উপদেশ মত চলে। আত্মবিস্মৃত হয়ে যারা অপরের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করে, তারা নিজেদের সর্বনাশ ত করেই, উপরন্তু তারা নিজের সমাজকেও অপরের পদানত করে। গভীর রাত্রে আমরা হাইড পার্ক পরিত্যাগ ক'রে ইস্ট-লণ্ডনের এলগেটের কাছে একটি স্যালভেশন আর্মির বাড়ীতে শোবার ব্যবস্থা করলাম।

সকালে উঠেই নেটিভ সাথীটি আমাকে স্যালভেসন আর্মির বাড়ী দেখাতে লাগল। বাড়ীটা তিনতলা। সকলের নীচের তলায় রেঁস্তোরা, বসবার স্থান এবং সর্বহারাদের সামান্য কাপড চোপড় রাখবার জন্য 'সেল' রয়েছে। অনেক সর্বহারা চা খেতে বসেছে। তাদের শরীরের দুর্গন্ধ উল্লেখযোগ্য। সেই সর্বহারাদের এমন পয়সা নেই যে দু'পেনি খরচ ক'রে সপ্তাহে একবার স্নান করতে পারে। মোজাতে ঘাম লেগে যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় তার কথা বলতে অক্ষম। এই সর্বহারাদের পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই। অন্য একটি থাকলে তবে তো বদ্‌লাবে? দ্বিতীয় মোজা কেনার দু'পেনি পাবে কোথায়? তাদের সঙ্গে বসেই এক পেয়ালা চা খেলাম। চায়ে চিনি অতি অল্পই ছিল। কেন এত কম চিনি দেওয়া হয় জিজ্ঞাসা করলাম। ওয়েটার বলল, "এই ভদ্রলোকেরা গরম জলের বেশী পক্ষপাতী, তাই গরম জল বেশী ক'রে দেওয়া হয়।" মাখনের পরিবর্তে মার্‌গ্যারিন্‌, চর্বি থেকে প্রস্তুত। খেলেই পিত্ত হয়। কিন্তু এই সর্বহারাদের পিত্তের ভয় করতে হয় না, পেটের ক্ষুধায় পিত্ত পর্যন্ত হজম হয়ে যায়। বাড়িটার দুতলা তিনতলা বেড়িয়ে দেখে এলাম। সারি সারি বিছানা সাজানো রয়েছে। প্রত্যেক বিছানার নীচে একটি ক'রে পাত্র রয়েছে। সর্বহারাদের

মোবার পোশাক নেই, তাই তারা খালি গায়ে রেস্ট রুমে যেতে পারে না, রাত্রে ঐ পাত্রে মূত্রত্যাগ করে।

ঘরের খোঁজে অনেক সময় কাটালাম। অনেক দরজার সামনে 'টু লেট' লেখা রয়েছে। নেটিভ সাথী যখন জিজ্ঞাসা করে 'ঘর খালি আছে কিনা' তখন ঘরের মালিক বলে "নিশ্চয়ই খালি আছে।" ঘরের ভাড়া ঠিক হয়, অনেক রকম স্থবিধার লোভ দেখানো হয় কিন্তু যেই নেটিভ সাথী বলে, ঘর ভাড়া করা হচ্ছে আমার জন্যে তখনই সকল চুক্তির অবসান হয়। এই ভাবে অর্ধেকদিন কাটিয়েও যখন ঘর পাওয়া গেল না, তখন আমরা চললাম যথাস্থানে—যেখানে কালো লোকেরা থাকে। মর্নিংটন ক্রিসেণ্ট নামক স্থানে যাবার পর ঘরের স্থব্যবস্থা হ'ল, রান্নার বন্দোবস্ত হ'ল, জিনিসপত্র আনা হ'ল, দস্তুরমত ছোট একটা সংসার পেতে এবার লণ্ডন দেখবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

রিজেণ্ট পার্ক থেকে আরম্ভ ক'রে ছোট বড় অনেক পার্ক দেখলাম। প্রায় সকল পার্কেই বোমা পড়া এবং গ্যাস থেকে রক্ষা পাবার জন্য ছোট ছোট গর্ত খুঁড়ে মাটির নীচে ঘর প্রস্তুত হয়েছে।

নিউইয়র্ক রওনা হবার পূর্বে লণ্ডনে প্রায় আট সপ্তাহ কাটিয়ে দিলাম। প্রত্যেকদিন নানারূপ চমকপ্রদ বিষয়ের আলোচনাতেই কাটত। যেখানে কথা বলবার অধিকার আছে অর্থাৎ স্বাধীন ভাবে কথা বললে পুলিস এসে দরজায় ধাক্কা দেয় না, সেখানে আলোচনায় স্থখ পাওয়া যায়। প্রায়ই নানারূপ লেকচার শুনতাম, আলোচনাতে যোগ দিতাম, এতে মনে খুব আনন্দ হ'ত। এখানকার লোক মুখ লুকিয়ে মোটেই কোন কথা বলে না। মাঝে মাঝে ভাবতাম আইরিশরা এত গণ্ডগোল করছে সেজন্য তাঁদের পক্ষেই সভা হচ্ছে, বিপক্ষের ত কোন কথাই কেউ শুনছে না। যা হোক আমার

রুমের কাছে একজন আইরিশ থাকত এবং সে এসে নানা কথা বলে বিরক্ত করত। সে জন্য স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম ১৬ নম্বর মর্‌নিংটন্ ক্রিসেণ্ট হতে ১৮ নম্বর বাড়ীতে। এই কারণেই সরতে বাধ্য হলাম। এ বাড়ীটার সামনেই এক বিরাট কারখানা। সেই কারখানাতে "ক্রাভান এ" নামক সিগারেট তৈরী হয়। আইরিশরা এই কারখানাকে আতঙ্কগ্রস্ত করতে চেয়েছিলেন। যে বাড়িতে এসেছি তার মালিক হলেন একজন স্ত্রীলোক। তাঁর জন্মস্থান বার্মিংহামে, মিঃ চেম্বারলেনের বাড়ীর কাছে। এই মহিলার স্বামী একজন চীনা ভদ্রলোক, তাই তাঁর গৃহে আমার স্থান হয়েছিল।

পুলিস কারগানা বাড়ীটা যথেষ্ট পাহারায় রাখার বন্দোবস্ত করেছিল কিন্তু সেই পুলিস পাহারার দিকে লক্ষ্য করত না। লোকে কোনরূপ ভয়ও করত না। লোক চলছে নির্বিকার চিত্তে। আইরিশদের কথা কেউ ভুলেও উচ্চারণ করত না। সে ভুল ইচ্ছাকৃত নয়, কারণ সে বিষয়টা তেমন গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। বোমা ফাটছে, লোক মরছে, ঘর ধ্বসে পড়ছে তবুও বিষয়টা গ্রাহ্যের মধ্যে নয়! এই অগ্রাহ্যের ভাব কাদের দ্বারা সম্ভব? লক্ষ লক্ষ আইরিশ লণ্ডনে বাস করছে, তাদের মধ্যে এখন কেউ সংবাদপত্র মারফতে দুঃখও প্রকাশ করছে না। তার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, শুধু বিষয়টা অগ্রাহ্য। যারা বিপদে পড়লে হাউমাউ ক'রে কাঁদতে থাকে, চীৎকার করতে থাকে, তাদের কাছে বিষয়টার গুরুত্ব আছে। ১২ নম্বর গাওয়ার ষ্ট্রীটে এক ভারতীয় সংবাদপত্রে তার প্রচার আছে, কিন্তু লণ্ডনের কোনও ক্লাব তার কথা মোটেই ভাবছে না, সংবাদপত্রগুলিও তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। যারা বীর তারা সামান্য বিষয় নিয়ে হৈচৈ করে না, তারা তৎপর হস্তে বিক্ষোভ দমন করে।

এ অঞ্চলে অনেক সাইপ্রাসবাসী থাকে। তাদের নাক, মুখ এবং

শরীরের গঠন দেখবার মতই। একজন সাইপ্রাসবাসীর সঙ্গে ভাব ক'রে তাকে নিজের ঘরে এনে নানারূপ কথা বলেছিলাম। লোকটি রুটি বিক্রি করত। তার চেহারা দেখলে মনে হয় না সে ফর্‌সা। তার ব্যবসা বেশ ভাল, কিন্তু যদি তার চেয়ে ভাল রংএর কোনো কাশ্মীরী ঐ ব্যবসা করতে আরম্ভ ক'রে, তবে তার ব্যবসা চলে না। অনেক কাশ্মীরী যতক্ষণ নিজেকে ইণ্ডিয়ান বলে পরিচয় না দেয়, ততক্ষণ তাদের সকল ব্যবসাই চলে। যেই তার পরিচয় বের হয় অমনি তার কারবার বন্ধ হয়ে যায়।

আমার ইচ্ছা হয়েছিল, একদিন মিঃ চেম্বারলেনের বাড়ীটা গিয়ে দেখে আসি। ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটের কথা বৃটিশ সাম্রাজ্যের যেখানে সেখানে শোনা যায়। কলোনিয়্যাল অফিস, ইণ্ডিয়া অফিস, এ সবই কাছে কাছে অবস্থিত। তাই সামান্য সময় সেদিকে কাটালে মন্দ হবে না ভেবে ডাউনিং ষ্ট্রীটে গেলাম। তখন বেলা দশটা। লণ্ডনে কোনদিন আমি এত সকালে ঘুম থেকে উঠিনি। আমার নিয়ম ছিল প্রাতে তিনটেয় শোয়া এবং বারটায় শয্যা ত্যাগ করা কিন্তু সে দিন কি জানি কেন ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাই এত সকালে সেখানে যেতে পেরেছিলাম। ভেবেছিলাম ১০নং বাড়ির সামনে অনেক সেপাই থাকবে, ইনফরমার, গুপ্ত পুলিস এ সব তো নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু গিয়ে দেখি সেই গলিটায় একটা লোকও নাই। সেকেলে ধূসর বর্ণের উঁচু বাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে চেয়ে। দেখার মত কিছুই নেই, তাই চলে এলাম।

রাত্রি দশটায় ঘুম থেকে উঠে নেটিভ সাথীটিকে নিয়ে বেড়াতে গেলাম। সর্বপ্রথমই গেলাম একটি চায়ের দোকানে। চা খাওয়া হয়ে গেলে আমরা চললাম টেম্‌স্ নদীর তীরে। রাত তখন গভীর। পথে লোকজনের চলাচল কম। মাঝে মাঝে দু-একটা মোটরকার একটু বেশী জোরে ছুটে চলেছে। সামনেই টেম্‌স্ নদী যেন কলকাতার গঙ্গা। নদী:

জলে আলো পড়ে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। নদীর জল নীরবে সাগরের দিকে চলেছে। দেখলাম, আমাদের মত আরও অনেকে নদীর সৌন্দর্য দেখতে এসেছে। তাদের অনেকের শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ বস্ত্রে আবৃত। শুধু পুরুষ নয় স্ত্রীলোকও আছেন। সবাই নীরবে চলছে।

পুরুষরা সব সময়েই মেয়েদের সম্মান দেখায় এটা ইউরোপীয় সমাজের একটা সুন্দর রীতি। আমি তার অনুকরণ করতে ভুলিনি। যখনই অসাবধানে কোনও স্ত্রীলোক আমার উপর এসে পড়ছিলেন তখনই আমি ক্ষমা চেয়েছিলাম, কিন্তু ফল তাতে সুবিধাজনক হয় নি। রমণীরা ভেবেছিলেন আমার কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। আমি পরাধীন ভারত-বাসী কিনা, তাই দু-একবার আমার নেটিভ সাথীটিকে পথচারী মহিলাগণ সাবধান ক'রে বলেছিলেন "এমন লোকের সঙ্গে চলছ কেন?" তা ওদের দোষ নয়; আমাদের দেশের নাবিক ছাত্র এবং ভদ্রলোকরা অনেক সময় লণ্ডনে গিয়ে ভুলে যান যে তাঁরা লণ্ডনে কি কলকাতায়। অশিষ্টতায় তাঁরা উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। টটেন্‌হাম্‌কোর্ট রোডে যদি কোনও ইণ্ডিয়ান নাবিক এসে বিকেলে দাঁড়ায়, পুলিস অমনি গলাধাক্কা দেয়, কখনও বা ধরেও নিয়ে যায়। সেরূপ নালিশ আমার কাছে অনেকবার অনেকে করেছিলেন। এর প্রতিবাদ করবার জন্য টটেন্‌হাম্‌কোর্ট রোডে একদিন গিয়ে দাঁড়াতে সাহস করেছিলাম, কারণ ভাল করেই জানতাম এখানকার পুলিস অমানুষ নয় মানুষ, আমাদের দেশের পুলিসের মতন তারা নয়। টটেন্‌হাম্‌কোর্ট রোডে পুলিস আমাকে পথে দাঁড়াবার জন্য ধরেছিল! যখন আমি এ বিষয়ে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছিলাম তখন পুলিস আমার কাছে ক্ষমাও চেয়েছিল। পুলিস বুঝতে পেরেছিল আমি অসৎ লোক নই।

ইউরোপীয়দের মধ্যে চোর, লম্পট, ডাকাত সবই আছে কিন্তু তাদের মধ্যে নারীধর্ষণ কমই হয়। "ওয়ার্ল্ড নিউজ" নামক পত্রিকা ব্রিটিশ

জাতির যত দোষ ও নিন্দার বিষয় সর্বদাই প্রকাশ করে। পড়লে দেখা যায় নারীধর্ষণের বিবরণ অতি অল্পই আছে। আমাদের দেশে নারীধর্ষণ তো সমাজের অঙ্গের ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশী রাত্রি পর্যন্ত আর বাইরে থাকলাম না, কারণ আমার নেটিভ সাথীটি কাল পল্টনে ভর্তি হবে। পেটে কিছু দিতে হলে, মাথা গোঁজবার স্থান পেতে হলে, এ ছাড়া আর উপায় তার ছিল না।

এ জগতে প্রগতিশীল জাতি একটা মাদকতার মধ্যেই থাকতে ভালবাসে। জার্মান, ইতালিয়ান, রুশ, জাপানী এই সব জাতির মধ্যে সেই মাদকতা আছে, তাই তারা কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করে না কিন্তু ব্রিটিশ জাতির সে মাদকতা নেই। সেই একঘেয়ে রক্ষণশীল দলের একই ধরণের কথা 'ঐ যায় ঐ ধরি'। আমার ধারণা, বিদ্রোহের ভাব না থাকলে জাতীয়তার অভিব্যক্তি ব্যাহত হয়। যাদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব আছে পার্লামেণ্টে তাদের দল হালকা। বিদ্রোহের ভাব না থাকলে জাতীয় মানসিকতায় উন্মাদনা আসে না। বিদ্রোহের ভাব জাতীয়তায় ঔদার্যও আনে। সেই কারণে মানুষ দেশের জন্য, জাতির জন্য প্রাণ তো দূরের কথা, তার চেয়েও মূল্যবান্ জিনিস যদি কিছু থাকে, তাও দান করবার প্রেরণা পেয়ে থাকে।

রুশিয়ার সঙ্গে প্যাক্ট কর, অতি সত্বর তা কাজে পরিণত হউক, এ কথা সকলের মুখে, সকল সংবাদপত্রে প্রত্যেক দিন লেখা হচ্ছে। মিঃ লয়েড জর্জ থেকে আরম্ভ ক'রে পথের পথিক পর্যন্ত এই মতের পোষক। হাইড পার্কে লাল ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে কত বক্তা রুশিয়ার সঙ্গে প্যাক্টের উপকারিতার কথা প্রচার করছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। হাইড পার্কের বক্তৃতা শোনাটা আমার একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক গণ্যমান্য ভারতবাসী বলে থাকেন হাইড পার্কে নাকি কোনও ইউরোপীয় ভদ্রলোক

উপস্থিত থাকেন না। এ সব লোকের কথা মোটেই সত্য নয়। তথাকথিত ভারতীয় ভদ্রলোকেরা তথায় যান না। অন্ততঃ আমি একজন ইণ্ডিয়ানকেও সেখানে যেতে দেখিনি। সেদিন এক পার্লামেণ্টের সদস্য বক্তৃতা দেবেন, সেজন্য হাইড্ পার্কে অনেক লোক একত্রিত হয়েছিল। আমি ভাবছিলাম এই বুঝি ইংলিশ ভদ্রলোকের প্রথম আগমন। তাঁরই বক্তৃতা শুনতে আগ্রহ ক'রে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি রুশিয়ার সঙ্গে প্যাক্ট করার যুক্তি দেখালেন। তিনি বলেছিলেন, যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করতে হয় তবে রুশিয়ার সঙ্গে মিতালি অবশ্যকর্তব্য। প্রশ্ন করার সময় আমি বলেছিলাম, "এ যে আদায় কাঁচকলায় মিলন, এও কি সম্ভব ?" তিনি বলেছিলেন— "Pact is adjustable because it is nothing but a pact." সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছিলেন, "আদা আর কাঁচকলার মিলকেই বলে প্যাক্ট।"

নেটিভ সাথীটি যাবার সময় আমার জন্য অন্য এক সাথী জুটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। ইনিও বেকার। এঁর পণ্টনে ভর্তি হবার উপায় ছিল না। জাতিতে ইনি গ্রীক। এখনও তিনি বৃটিশ নাগরিক হতে সক্ষম হন নি, তাই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে একরকম বাধ্যই হয়েছিলেন। এঁর মতবাদটাও অন্যরকমের। এঁর পিতা বাধ্য হয়ে এথেন্স পরিত্যাগ করেছিলেন। এঁদের মত হ'ল, গ্রীসে রিপাব্লিক গভর্নমেণ্ট হওয়া চাই। যেদিন রাজা জর্জ এথেন্সে পৌঁছলেন, সেই দিনই মিঃ হরেসিও, এঁর পিতা সপরিবারে ইউরোপের নানা দেশ বেড়িয়ে শেষটায় লণ্ডনে এসে পৌঁছান। ডিমক্র্যাসি এবং হিপক্র্যাসি শব্দ দুটো আজকাল লোকের মুখে মুখে শোনা যায়, যেন একটা ফ্যাশন। আমি কিন্তু এ দুটো কথা ব্যবহার করতাম না কারণ যার দেশ স্বাধীন নয় তার কাছে ডিমক্র্যাসি এবং হিপক্র্যাসি একই কথা। আমার নবাগত বন্ধু হিপক্র্যাসি শব্দটাই ব্যবহার করতেন বেশী।

নূতন বন্ধু আসার সঙ্গেই নূতন আতঙ্কের সৃষ্টি হ'ল। তিনি বরাবর বলতে লাগলেন, "আপনি আমেরিকা যাবার টিকিট কিনে রাখুন। যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় তবে বড়ই বিপদে পড়বেন।" নূতন সাথীটিকে বলেছিলাম, "এ দেশ ছাড়বার আগে একদিন স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ড দেখতে হবে।" কথাটা তিনি বুঝতে পারেন নি, কারণ স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ড সাধারণের কাছে শুধু 'ইয়ার্ড' নামে পরিচিত। অনেক কথার পর যখন বুঝলেন তখন বললেন, "এতে আর কি, গেলেই হ'ল।" এ যেন আমাদের দেশের যাত্রাগানের আসর, কষ্ট ক'রে গেলেই যেখানে হ'ক ঠেসাঠেসি ক'রে বসতে পাওয়া যাবেই। আমি ভাবছিলাম আবেদন নিবেদন করব তারপর পাস আসবে, কত কি হবে, তারপর বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে হয়তো মনের বাসনা পুরোতে হবে। নূতন সাথীটি একদিন ঘুম থেকে উঠেই বললেন, চলুন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড দেখতে যাই।

বাসে যাওয়া ঠিক হ'ল। অটোগ্রাফের বইটা সঙ্গে ক'রে নিলাম, উদ্দেশ্য যদি বড় কর্তার দেখা পাই তবে তাঁর অটোগ্রাফ নিয়ে আসব। আমাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েই আমার নূতন বন্ধু বললেন, "এখানে আপনি একা যান, তাতে ভাল হবে, নেটিভ সঙ্গে থাকলে ওদের সন্দেহ হবে।" হন্‌হন্‌ ক'রে একটা অফিসে গিয়ে টোকা মারলাম। প্রবেশের অনুমতি পেলাম। ঢুকে অভিপ্রায় জানাতেই শুনলাম, "আরে না মশায়, এটা নয়, পাশের দরজায় গিয়ে টোকা দিন।" একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিদেশী। আসার উদ্দেশ্য?

"আসার উদ্দেশ্য—দেখা, এর বেশী নয়।"

"এটা যে মিউজিয়ম নয় চিড়িয়াখানাও নয়, তা কি মহাশয় জানেন?"

"আজ্ঞে হাঁ, তা বেশ জানা আছে। ইংলিশ উপন্যাস পড়লেই স্কটল্যাণ্ড

ইয়ার্ডের কথা পড়তে হয়। আমার ইচ্ছা হয়েছে, একবার স্থানটাকে দেখে আসি, তাতে উপন্যাসের পাতা উল্টোতে স্থবিধে হবে।"

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে সঙ্গে একজন লোক দিলেন, সেই লোকটি আমাকে অন্য এক রুমে রেখে চলে গেল। একে একে সেখানে অনেক অফিসার এলেন। যদিও কেউ কথা বলেন না তবুও তাঁদের চাহনি দেখে বুঝলাম সবাই যেন আমাকে প্রশ্ন করতে উৎসুক। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব না দিতে পেরে সকলেই চলে গেলেন। অনেকক্ষণ পরে একজন লম্বা এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক এসে আমার কাছে বেশ আরাম ক'রে বসে বললেন, "আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য কি?"

"আজ্ঞে সেরূপ কিছু নয়, তবে বাড়ি-ঘরগুলি দেখলে আনন্দিত হব, হয়তো বই লেখার পক্ষে স্থবিধে হবে।"

"তবে আপনি লেখক, তা কি দেখবেন চলুন"—এই বলেই তিনি চললেন, আমি তাঁর পেছনে চললাম। অনেক দেখলাম, কোথাও বিভীষিকা নেই। সর্বত্রই সহজ ও সরল ভাব। ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে থার্ড ডিগ্রি কোথায় দেওয়া হয় সে স্থানটি একটু দেখতে চাই।" ভদ্রলোক বললেন, "থার্ড ডিগ্রির ব্যবস্থা আমাদের শাসিত দেশগুলিতে রয়েছে, যেখানে ভয় দেখিয়ে অসভ্যকে সভ্য করতে হয়।" আর দেখতে ভাল লাগল না। বিদায়ের সময় সেই লম্বা এবং গম্ভীর ভদ্রলোকটির অটোগ্রাফ নিয়ে আসতে ভুলিনি। পথে আসার সময় কেবলই মনে হতে লাগল, সত্যিই তো, অসভ্যকে সভ্য করতে হলে ভয় দেখানো দরকার। আমরা কলোনিয়েল দেশের লোক, তবে কি আমরা অসভ্য?

এবার আমেরিকার টিকিট কেনার পালা। ভেবেছিলাম, টাকা ফেলব আর টিকিট নোব। কিন্তু আমেরিকা কেন, যে কোনও বিশেষ দেশে যেখানে একটু অর্থাগমের পথ খোলা আছে, সেখানকার টিকিট কিনতে ভারতীয়দের

বিশেষ কষ্ট পেতে হয়। বাঙ্গালী ও পলাতক জার্মান ইহুদী দ্বারা পরিচালিত একটা নূতন টুরিস্ট কোম্পানীতে টিকিট কিনতে গেলাম। তারা ত আমাকে পেয়েই খুশী। তারা হয়ত জানত না যে ভারতবাসীর পক্ষে আমেরিকার টিকিট কেনা তত সহজ নয়, নতুবা এমন অনুগ্রহ এবং আগ্রহ দেখাত না। আমি চুপ ক'রে বসে ওদের চলাচল দেখতে লাগলাম। এদিকে জাহাজ কোম্পানীতে টিকিট কেনার জন্য লোক পাঠানো হ'ল। জাহাজের নাম জর্জিক, আটাশ হাজার টনের কম 'রোলিং' এ নড়বে না। কিন্তু টিকিট নিয়ে আসছে না কেন? বেলা তিনটে পর্যন্ত বসে বললাম, "মহাশয়রা টিকিটখানা এলে রেখে দেবেন আমি কাল এসে নিয়ে যাব।" এই বলেই চলে এলাম।

নূতন সাথীটি আমাকে বলতে লাগল, "টিকিট বিক্রি না করার কারণ তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না, যুদ্ধ তো বাধে নি?" ভারতবাসীকে সাম্রাজ্য-বাদীরা কত যে হীন ক'রে রেখেছে, তা সামনে দাঁড়িয়েও ঐ গ্রীক যুবক বুঝতে পারছিল না। ভারতবাসীর দরজা চারিদিক থেকে বন্ধ। যারা লণ্ডনে যায়, তারা একথা হাড়ে হাড়ে বোঝে, কিন্তু সেকথা স্বদেশে এসে বলে না। চড় খেয়ে চড় হজম করে। পরদিন অফিসে গিয়ে দেখলাম তখনও টিকিট আসেনি। আফিসের চাপরাসীকে নিয়ে জর্জিকের অফিসে গেলাম। ম্যানেজার থেকে আরম্ভ ক'রে ছোট কর্মচারী পর্যন্ত বলতে লাগল, ভিসা পেলেই তো হবে না, ফিরে আসার টাকা জমা দেওয়া চাই। এটি না হলে যে টিকিট বিক্রিই হতে পারে না। তাদের কথা শুনে ব্যাংকের জমা একশত পাউণ্ডের একখানা রসিদ দেখালাম। জর্জিক জাহাজে প্রচুর স্থান ছিল। মানচিত্র দেখে জাহাজের মধ্যস্থলে আমার কেবিন ঠিক করতে বললাম। অনেক চিন্তা ক'রে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হ'ল, কারণ তখনও জাহাজে অনেক জায়গা ছিল। স্বর্ণময় চকচকে মুদ্রাকে দক্ষিণ আফ্রিকার জেনারেল

ক্রুগার যেমন পদাঘাত করতে পেরেছিলেন, তেমন আর কেউ পারেন নি। লণ্ডনের জাহাজ কোম্পানীও টাকার গোলাম, তারা স্বর্ণ-মুদ্রাকে মাথায় করার বদলে কি পদাঘাত করতে পারে? অনেক কষ্ট করার পর যখন আমার টিকিট কেনা হ'ল, আমি তখন শান্তিতে নূতন সঙ্গীকে নিয়ে রিজেণ্ট পার্কের দিকে অগ্রসর হলাম। রিজেণ্ট পার্কের ঘাসের উপর বসতে আমি বড়ই ভালবাসতাম। তাই রিজেণ্ট পার্কে গিয়ে বৃক্ষতলে বসে পবিত্র বায়ুতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগলাম। লণ্ডন নগরের অসংখ্য কলকারখানার চিমনি থেকে কয়লার ধোঁয়া বের হয়, তা নিয়তই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মানুষের ফুসফুসে প্রবেশ করে। সেই জন্য লণ্ডনের অধিবাসীরা দুটি ক'রে রুমাল রাখে। রিজেণ্ট পার্কের বাতাসে সেই কদর্যতা ছিল না, সেখানে বসতে ভাল লাগার সেও একটা মস্ত কারণ।

লণ্ডন পরিত্যাগ ক'রে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে একদিন ওয়াটারলু স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। গাড়ী চলল সাউদাম্টনের দিকে। পথে কোথাও থামল না। আমি একাগ্রভাবে পথের দু'দিকের সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। তা ঠিক আমাদের দেশের মতই।

গাড়ী সাউদামটনে গিয়ে দাঁড়াল। আমি ইচ্ছা করেই সকলের শেষে নামলাম। আমি জানতাম কষ্ট আমার পথ আগলে বসে আছে। গাড়ী থেকে নেমে জর্জিক জাহাজের দিকে অগ্রসর হলাম। পাশেই দাঁড়ানো নরম্যান্ডিও আমেরিকায় যাবে। জর্জিকে যারা যাবে, তারা জেটির পথ ভিড় ক'রে বন্ধ করেছে। আমার তাতে লাভই হ'ল, আমি দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগলাম। চীনা যুবকগণ নিজেদের দেশের সৈনিকের পোশাক পরে জাহাজে উঠেছে, তারা চলেছে জাপানীর সঙ্গে লড়তে। তাদের সকলের মুখেই হাসি। অন্যান্য জাতের লোকও বুক উঁচু ক'রে পথে চলেছ। শুধু আমারই মুখ ম্লান। আমি বোধ হয় এত বড় ডক্‌টাতে একমাত্র ভারতবাসী ছিলাম।

সকলে পাসপোর্ট দেখিয়ে জাহাজে গিয়ে উঠল, আমার বেলা কিন্তু অন্য রকমের ব্যবহার। আমার মুখ দেখেই পাসপোর্ট অফিসারের পিলে চমকে গেল। একজন অফিসার আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। আমি গিয়ে একটা বেঞ্চে বসলাম এবং নানা কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবছিলাম আজ হায়দরাবাদের নিজাম যদি আমার মত এখানে এই অবস্থায় পড়তেন, তা হলে তাঁর অবস্থা কেমন হ'ত? অবশ্য জাহাজ

আমাকে ফেলে যাবে না তা আমি ভাল ক'রেই জানতাম। অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, "এ টিকিট কে আপনাকে বিক্রি করেছে?"

"জাহাজ কোম্পানি।"

"আমেরিকার ভিসা আছে?"

"আছে।"

"কৈ দেখি?"

"এই দেখুন।"

"বহু পুরাতন।"

"তা পুরাতন বটে।"

"সঙ্গে কত টাকা আছে?"

"এ কথা তো অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করেন নি, আমার বেলায় কেন?"

"আমার ইচ্ছা। এ জাহাজে হয়ত আপনার যাওয়া হবে না।"

"আপনাদের অনুগ্রহ।"

পাসপোর্ট এবং টিকিট নিয়ে অফিসারটি আর এক অফিসারের কাছে দৌড়াল। উভয়ে মিলে কোথায় টেলিফোন করল, তার পর ফিরে এসে বলল, "আপনি এই জাহাজে যেতে পারেন।" আমি তাদের বললাম, "আপনারা যে আচরণ করেছেন, তা শিষ্টাচার নয়, তবু সেজন্য আপনাদের উপর আমার রাগ হয়নি। দোষ আমারই, কারণ আমি পরাধীন দেশের লোক।"

জাহাজে দশ দিন কাটিয়ে এক দিন নিউইয়র্কের দরজার কাছে এসে পড়লাম। সেদিন বিকেল বেলা জাহাজ নিউইয়র্ক গিয়ে পৌঁছবে। আমি জাহাজের খালাসী থেকে পারসার এবং পারসার থেকে কাপ্তেন পর্যন্ত সকলের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে ডেকে গিয়ে বসলাম। উদ্দেশ্য নিউইয়র্ক নগরীর সামুদ্রিক ট্রাফিক দর্শন।

অনেক জাহাজ বন্দর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার আমরা যেমন বন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি তেমনি আরও অনেক জাহাজ বন্দরের দিকে আসছিল। হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম, দুই ঘণ্টার মধ্যে তেত্রিশটি জাহাজ বেরিয়ে গেল। আর যতদূর দৃষ্টি যায়, গুণে দেখলাম পঁয়তাল্লিশটা জাহাজ বন্দরের দিকে আসছিল। এত জাহাজের আনাগোনা পৃথিবীর অল্প বন্দরেই হয়। সাউদামটন, ডোভার তথা লণ্ডন, সিংগাপুর, ইওকোহামা এবং হামবার্গে প্রায় এই রকম সামুদ্রিক ট্রাফিকের নমুনা দেখা যায় বললে দোষ হবে না। তবু মনে হ'ল নিউইয়র্কের মত সমুদ্র ট্রাফিক আর কোথাও নেই।

জাহাজ ক্রমশই নিউইয়র্ক নগরীর কাছে আসতে লাগল। নানা দৃশ্য একটার পর একটা চোখে পড়তে লাগল কিন্তু এসব দৃশ্য আমার মনে তেমন দাগ কাটতে পারছিল না, আমি ভাবছিলাম এদেশে গিয়ে দেখতে হবে আমেরিকার ডিমক্র্যাটিক গবর্নমেণ্টের স্বরূপ কি। বোধ হয় তখন বিকেল সাড়ে সাতটা, চারিদিকে কুয়াশায় অন্ধকার হয়ে আসছিল, দিনের আলো অতি অল্পই ছিল, দূরের বস্তু কমই দেখা যাচ্ছিল। এমন সময় জাহাজ 'স্ট্যাচু অব লিবার্টির' কাছে এসে গেল। অনেকেই দেখল, আমিও দেখলাম, কিন্তু সে মূর্তি কারও মনের উপর তেমন দাগ কেটেছে বলে মনে হ'ল না কারণ সময়ের পরিবর্তন হয়ে গেছে। যেদিন এই মূর্তি গড়া হয়েছিল সেদিন ইমিগ্রেসন বিভাগের অস্তিত্ব ছিল না।

জাহাজ ধীরে ধীরে হাডসন নদীতে গিয়ে প্রবেশ করল। আমি ডেকে বসে নদীর দুই তীরের দৃশ্যাবলী দেখতে লাগলাম। বাস্তবিক সে দৃশ্য উপভোগ্য। বড় বড় বাড়িগুলির উপর মেঘমালা ঝুঁকে পড়েছে। বিজলী বাতির আলো তাতে পড়ে আঁধারে-আলোর সৃষ্টি করেছে। সেই আঁধারে-আলো দেখবার মত। আজকের দিনটা যে আমাকে হাজতে বাস করতে

হবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম বলেই নামবার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলাম না! একজন আমেরিকান আমাকে আকাশস্পর্শী বাড়ীগুলির পরিচয় দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, "ওই দেখুন ওয়াল ষ্ট্রীট। ওয়াল ষ্ট্রীটই পৃথিবীর, সমুদয় ব্যবসায় এবং আমেরিকার পলিটিক্সের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। বাঁদিকে পড়ল হারলাম, হারলামই হ'ল আমেরিকার প্যারি।" কথা বলতে বলতেই জাহাজ কূলে এসে ভিড়ল। সিঁড়ি পাতা হ'ল, ইমিগ্রেশন অফিসার এলেন, সমস্ত যাত্রীরা ডাক্তারের সামনে যেতে লাগল। যারা আমেরিকা প্রবেশের আদেশ পেল তারা নিজেদের অনেক ভাগ্যবান মনে করল। শেষটায় আমাদের দুজনেরও ডাক পড়ল! আমেরিকান ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁর ডাক্তারী পরীক্ষা হ'ল না, ডাক্তার শুধু 'গুডবাই' বলেই তাঁকে বিদায় দিলেন। আমার ডাক্তারী পরীক্ষা হবার পর ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে হাজির করা হ'ল। অফিসার আমার পাসপোর্ট একদিকে রেখে দিয়ে বললেন, "এখানে বসুন, পরে দেখব।" এ যে ঘটবে তা আমার জানাই ছিল। আমি চেয়ার ছেড়ে দিয়ে পাশে এসে জাহাজ লাগার জায়গাটা দেখতে লাগলাম।

দুদিকে কাঠের দেওয়াল রয়েছে; এই দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পার হওয়া সাধ্যাতীত। একদিকে নদী এবং অপর একদিকে জাহাজ থেকে নামবার গেট। এই গেটে প্রবেশ করতে হলে সকলেরই পাসের দরকার হয়। এমন কড়া ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের খালাসীরা যে কি ক'রে জাহাজ থেকে পালিয়ে সাঁতার কেটে শহরে যায়, তা বলা শক্ত। এসব যখন দেখছিলাম আর ভাবছিলাম তখন হঠাৎ ইমিগ্রেশন অফিসার আমাকে ডেকে বললেন, "একজন ইউরোপীয় মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, বসুন এখানে, এখনই তিনি আসবেন।" নূতন ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম ক'রে চেয়ারে বসলাম।

মিনিট পাঁচেক পরেই সেই ইউরোপীয় মহিলা এসে আমাকে সংবাদ দিলেন যে একজন হিন্দু মহিলা এখনই আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে, আমি যেন এখানেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করি। অপেক্ষা করার সময় হঠাৎ মনে হ'ল তিনি কমলাদেবী মুখার্জি নন তো, উপেন্দ্রবাবু যাঁর কথা আমার কাছে লিখেছিলেন? এতে মনে একটা আশার সঞ্চার হ'ল।

মিনিট দশেক পরেই, পরনে শাড়ি, কপালে সিঁদুরের টিপ, পায়ে ভারতীয় স্যাণ্ডেল, একটি মহিলা এলেন। আমেরিকান ইউরোপীয়ান সকলেই তাঁকে পথ ছেড়ে দিয়ে টুপি খুলে সম্মান জানাতে লাগল। তাঁর পথ পরিষ্কার, তাঁকে আর লোক ঠেলতে হ'ল না। আমার কাছে আসা মাত্র আমিও দাঁড়িয়ে জোড় হাত ক'রে তাঁকে নমস্কার করলাম। আমরা যেমন ক'রে 'বন্দেমাতরম্' গান গাইবার সময় দাঁড়াই বা ইংরাজেরা যেমন ক'রে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গায়, ইমিগ্রেশন অফিসাররা ঠিক তেমনি ক'রে সবাই একসঙ্গে তাঁকে সম্মান দেখাতে দাঁড়ালেন।

মহিলাটির এত সম্মানের কারণ প্রথমে ঠাহর করতে পারি নি। যাই-হোক তিনি আমাকে বললেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের চিঠি পেয়েছেন এবং আমাকে নিয়ে যাবার জন্যই এসেছেন। তিনি আরও বোধহয় কিছু বলতেন, কিন্তু একজন ইমিগ্রেশন অফিসার টেবিলের কাছ থেকে উঠে এসে তাঁকে ডাকলেন এবং আমার সঙ্গে কোনও কথা বলতে নিষেধ করলেন। মহিলাটি যতক্ষণ না কোনও আসন গ্রহণ করলেন সব ইমিগ্রেশন অফিসারই ততক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কমলাদেবী মুখোপাধ্যায় আসন গ্রহণ ক'রেই অফিসারের সঙ্গে নানা কথা আরম্ভ করলেন। তারপর আমার কথা উঠল। কমলাদেবী বললেন, তিনি যে সাপ্তাহিক পত্রের লেখিকা, আমিও সেই সাপ্তাহিক পত্রে লিখে থাকি এবং সেই সূত্রেই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তারপর আর কি কথা হ'ল

তা আমি শুনতে পাই নি, কারণ আমাকে দূরে গিয়ে বসতে বলা হয়েছিল। শেষ কথা শুনলাম "ও, কে," তারপরই পাসপোর্টে সিলমোহর পড়ল এবং অফিসাররা "ও, কে," উচ্চারণ ক'রে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন। কমলাদেবী আমার হাত ধরে বার হয়ে পড়লেন। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম।

আমার লগেজ পরীক্ষা করা হ'ল, তারপর আমরা একটা বড় পথে এসে পড়লাম। পথটি দেখবার মতই। ছত্রপতি শিবাজী যেমন দিল্লী প্রবেশের সময় এদিকে সেদিকে বিশেষ তাকান নি, আমিও তেমনি কোনও দিকে না তাকিয়ে একটি ট্যাক্সি ডেকে সাইকেলটা তাতে বোঝাই ক'রে কমলাদেবী মুখোপাধ্যায়কে ভাল ক'রে বসিয়ে ৪২নং ষ্ট্রীটের ওয়াই, এম, সি এ-এর দিকে রওনা হলাম। লণ্ডনের জাহাজের এজেণ্টও আমাকে নিতে এসেছিলেন। তিনি ওয়াই, এম, সি, এ-এর ম্যানেজারের কাছে আমার আগমনবার্তা জানালেন। ম্যানেজার নীচে এসে আমার মুখ দেখেই বললেন, "বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, আমাদের এখানে একজন লোকও রাখবার স্থান নেই।" আমি বুঝলাম ব্যাপারখানা কি। তৎক্ষণাৎ কমলাদেবীকে বললাম, "আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, এখন আমার থাকার স্থান আমিই খুঁজে বার করব। অতএব যদি অনুমতি দেন ত আপনাকে গিয়ে রেখে আসি।

আমার অপমানে তিনিও বোধ হয় অপমান বোধ করেছিলেন। তাই অপমানের বোঝা আর বইতে না চেয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লেন এবং বললেন, যেখানেই থাকি না কেন কাল সকালে যেন তাঁর কাছে ফোন করি।

অপমান লাঘব করবার জন্যই বোধ হয় কমলাদেবী বললেন, "আপনার বাইসাইকেল নিয়ে এখানে আসা ভাল হয়নি, অন্য একজন বাঙ্গালী

ভূপর্যটক এসেছিলেন, তার সঙ্গে এ বালাই ছিল না।" আমি বললাম, "এই নিয়েই আমি পথ চলি এবং আমেরিকায় এই নিয়েই চলাফেরা করব। যাক এটার জন্য ভাবতে হবে না।"

তিনি চলে যাওয়াতে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম। তারপর অন্য একটা ওয়াই, এম, সি, এ-তে গেলাম এবং সেখানেও সেই 'স্থানাভাব'। সাদা চামড়ার ওয়াই, এম, সি এ-তে স্থানলাভের আশা সুদূরপরাহত বুঝে হারলামের দিকে রওনা হলাম এবং নিগ্রোদের ওয়াই, এম, সি, এ-তে স্থান পেলাম।

রুমের ভাড়া এবং ট্যাক্সির মজুরি দিয়ে নিকটস্থ একটি নিগ্রো হোটেলে খেতে গেলাম। খাওয়া শেষ ক'রে দু সেণ্টের একখানা সংবাদপত্র কিনে বোধহয় নবম তলায় অবস্থিত একটি রুমে এসে দরজা খুলেই মনে হ'ল এটা ওয়াই, এম, সি, এ-ই বটে। তবে হাতে টাকা প্রচুর রয়েছে, দরজাটা ভাল ক'রে বন্ধ করা কর্তব্য। ভিতর থেকে তালা বন্ধ ক'রে দিয়ে এই গভীর রাত্রে সেদিনের প্রভাতী সংবাদপত্র পাঠ করতে আরম্ভ করলাম। অনেকক্ষণ সংবাদপত্র পাঠ ক'রে রাত্রি তিনটের সময় ঘুমোলাম। সকালে আটটার সময় ঘুম থেকে উঠে যখন বাইরের দিকে তাকালাম, তখন দেখলাম অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। ১৩৫নং ষ্ট্রীটের পশ্চিম দিকে ওয়াই, এম, সি, এ অবস্থিত। রাস্তার দু'দিকে বড় বড় বাড়ি তবে বাড়িগুলির অবস্থান আমাদের দেশের বাড়ির মত এলোমেলো ভাবে নয়। 'ব্লক' ক'রে বাড়ি সাজানো। তা সে নিগ্রো পল্লীই হোক আর সাদা চামড়াদের পল্লীই হোক। এই পৃথিবীতে জার্মানী এবং আমেরিকা ছাড়া কোথাও এরূপ 'ব্লক' প্রথায় বাড়ি তৈরী হয় নি। তবে রুশিয়ায় এ নিয়মটি প্রবর্তিত হবে বলে মনে হয়। ব্লক পদ্ধতিতে বাড়ি করলে পিচ দেওয়া বড় পথকে খুঁড়তে হয় না, যেমন আমাদের কলকাতায়

হয়ে থাকে। ব্লক প্রথায় বাড়ি করা হয় বলে জল, গ্যাস, বিজলি বাতি প্রভৃতি এমন সুন্দর ভাবে রাখা হয় যে, তার সঙ্গে পথের সম্পর্কই থাকে না। সবই পেভমেণ্টের নীচে চলছে।

দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে পথের দু'পাশের বাড়িগুলি দেখতে লাগলাম। দেখলাম প্রত্যেকটি বাড়ির জানালা বন্ধ। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না কে কোথায় বাস করছে। পথে স্রোতের মত মোটরকার, মোটরলরি, ট্যাক্সি এবং বাস চলছে। একটু দূরেই এলিভেটরে বাড়ির উপর দিয়ে গাড়ী চলছে। কতক্ষণ এমনভাবে চেয়ে ছিলাম তার ঠিক ছিল না। শুধু চেয়ে থাকতেই ইচ্ছা হচ্ছিল। আকাশে গাড়ী, মাটিতে গাড়ী, মাটির নীচে গাড়ী। এমন দেশ পৃথিবীতে মাত্র একটিই। আমেরিকা ছাড়া কোথাও আজ পর্যন্ত এলিভেটর সিস্টেমে ট্রাম চলার প্রথা প্রবর্তিত হয়নি।

দেখার নেশা একটু যখন মিটল তখন আবার স্নান করলাম। তার পর নীচে নেমে পথের নাম, বাড়ির নম্বর, ষ্ট্রীটের নম্বর নোট বুকে লিখে নিয়ে একটু কফি খাবার ইচ্ছায় সোজা হাঁটতে লাগলাম। একটি কফির দোকানে গেলাম। তাতে দু'জন নিগ্রো এবং তিনজন আমেরিকান বসে কফি খাচ্ছিল আর নানারকম আলোচনা করছিল। এদের দর্শন-ঘেঁষা কথাবার্তা শুনে মনে হ'ল যেন আমি কোন সন্ন্যাসীর আখড়ায় বসে আছি। এরা যে দর্শনের কথা নিয়ে আলোচনা করছিল, ইচ্ছা করলেই তাতে যোগ দিতে পারতাম কিন্তু এরূপ করা মহা অন্যায় এবং আমরা যে রকম সবজান্তার জাত, তাদের সঙ্গে তা চলবে না। বাজে কথা তারা মোটেই বলছিল না। প্রত্যেকটি কথার পেছনে যুক্তি ছিল এবং তারা হাউমাউ ক'রে চীৎকারও করছিল না। কতক্ষণ পরই হয়ত আমি আমেরিকানদের নিগ্রো-বিদ্বেষ সম্বন্ধে গাল দোব কিন্তু এখানে তা পারব না কারণ এখানে সাদা এবং কালো উভয়ে মিলে এমনই এক দর্শনের কথা বলছিল যা আমার

কাছে নতুন এবং তাতে ভাববারও বিষয় ছিল। তাই শুধু কফি খেয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বেরিয়ে এলাম।

পথে যাবার সময় একজন জামাইকাবাসী নিগ্রো রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রমণীটি সুন্দরী এবং ডাক্তার। অপরিচিত মুখ দেখেই রমণীটি আমি পথ হারিয়েছি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি যে পথ হারাইনি তাঁকে জানালাম। তবে বলতে বাধ্য হলাম গত রাত্রে ওয়াই, এম, সি, এ-তে ঘুমিয়ে আরাম পাইনি, যদি কম ভাড়ায় একটি সাজসরঞ্জাম-বিশিষ্ট ঘর পাই এবং তা পেতে যদি তিনি আমাকে সাহায্য করেন তবে বড়ই বাধিত হব। তাঁরই সাহায্যে অন্য আর একজন জামাইকাবাসীর বাড়িতে একখানা ঘর সপ্তাহে আড়াই ডলারে ঠিক করলাম। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সে ঘর। বাড়িওয়ালী বললেন, ভারতীয় খাবার তিনি রেঁধে দিতে পারবেন। জামাইকাবাসী নিগ্রোরা আপনাদের নিগ্রো বলে পরিচয় দেয় না, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান বলে পরিচয় দেয়। তাদের মতে ফিলিপাইন, জাভা আর ভারতবাসীরা ইস্ট ইণ্ডিয়ান। আমেরিকানরা আমাদের হিন্দু বলে, হিন্দু মুসলমান প্রশ্ন এখানে নেই। তবে ব্রিটিশের প্রচার বিভাগের ফলে অনেক ব্রিটিশপরিচালিত সংবাদপত্র সেই ভ্রম আজকাল সংশোধন ক'রে দিচ্ছে। মিঃ সওকত আলি এবং একজন মাদ্রাজী পাদ্রী সেই ভুল সংশোধন করতেই বোধ হয় সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু পেরে ওঠেন নি। ভারতবাসীর হিতাকাঙ্ক্ষীর অভাব নেই, বোধ হয় আমেরিকায় আমাদের ইণ্ডিয়ান না বানিয়ে ছাড়া হবে না। সুখের বিষয় কি দুঃখের বিষয় বলতে পারি না, ক্যালিফোরনিয়াতে আমাদের দেশের পাঠানরা নিজেদের ইণ্ডিয়ান বলে কখনও পরিচয় দেয় না—তারা সদাসর্বদা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে ভালবাসে এবং এরিয়ান বলে গর্ব অনুভব করে। এরিয়ান এবং নন-এরিয়ান কথা নিয়ে বাঙ্গালী মুসলমান ও পাঠানদের মধ্যে অনেক সময়

পিস্তলবাজীও হয়ে থাকে। পাঠানরা বাঙ্গালীদের, সে যে ধর্মেরই হোক,—এরিয়ান বলে স্বীকার করে না।

আমি যে রুম ভাড়া করেছিলাম তার সঙ্গে রান্না করবারও বন্দোবস্ত ছিল। রান্না করবার বাসন চাইলেই পাওয়া যায় এবং গ্যাস যত ইচ্ছা ব্যবহার করা যায়। সেজন্য অতিরিক্ত খরচ দিতে হয় না। রুম ভাড়ার সঙ্গে গ্যাস, লাইট, বাথ, রান্নার বাসন, সপ্তাহে একবার বিছানার চাদর পরিবর্তন এবং দৈনিক একখানা ক'রে ধোয়া নতুন তোয়ালে পাওয়া যায়। এরূপ ঘরের ভাড়া আমেরিকার পূর্বদিকে সপ্তাহে সাড়ে তিন ডলার, উত্তর দিকে তিন ডলার, পশ্চিম দিকে আড়াই ডলার থেকে পাঁচ ডলার, দক্ষিণ দিকে এক ডলার থেকে তিন ডলার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ঘরের আসবাব তু'খানা চেয়ার, তুটো টেবিল, একটা ইজিচেয়ার। পোশাক টাঙ্গিয়ে রাখবার জন্য পাশে একটা ছোট রুম পাওয়া যায়। রান্নার বাসন টেবিলের ড্রয়ারে রাখবার বন্দোবস্ত আছে। এই জন্যই তুটো টেবিলের ব্যবস্থা।

বিকেলে সাতটার ঘুম থেকে উঠে একাকী বেড়াতে বের হলাম। তুটো ব্লক পার হয়ে মাউণ্ট মরিস পার্ক। সেখানেই বেড়াতে লাগলাম আর এলিভেটারগুলি কেমন হুস হুস ক'রে যাওয়া আসা করছে তাই দেখতে লাগলাম। ৮নং এভিনিউএর উপর এলিভেটর আছে এবং তারই নীচ দিয়ে আমাকে উক্ত পার্কে আসতে হয়েছিল।

এলিভেটরগুলির দিকে আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম। মহানগরে যেমন মাটির নীচে রেলপথের দরকার, উপরেও ঠিক সেই রকম দরকার। এলিভেটর না হলে মহানগরের পথে চলা দায় হয়ে ওঠে; নিউইয়র্ক নগর এই দায়ে পড়েছিল বলেই দায়মুক্ত হবার পথ খুঁজে নিয়েছে। পৃথিবীর লোক হাঁ ক'রে চেয়ে দেখছে এত টাকা কি ক'রে খরচ করতে পারে! মানুষই যে টাকা তৈরি করে, এ কথা মানুষ বোঝে না। মজুরীই হ'ল টাকা।

মজুরী ছেড়ে দিলে টাকার অস্তিত্ব থাকে না।

পার্ক থেকে ফিরবার সময় বিকেলের কয়েকখানা সংবাদপত্র নিয়ে এলাম। নিউইয়র্ক নগরে দৈনিক সংবাদপত্রের দাম দুই সেণ্ট এবং তিন সেণ্ট ক'রে হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক, প্রভৃতি এ ধরণের পত্রিকা ছাড়াও অনেক সংবাদপত্র আছে যাতে বিজ্ঞাপন থাকে না। যেমন ডেলী ওয়ার্কার, পিপ্‌ল্‌-ওয়ার্ল্ড' যাতে পয়সা দিয়ে কেউ বিজ্ঞাপন দিতে পারে না। তাদের বিষয় নিয়েই বিনা পয়সায় বিজ্ঞাপন থাকে, সেজন্য প্রত্যেকদিন চাঁদা উঠছে এবং কোন্ জেলার লোক কত চাঁদা দেবে তাও নির্ধারিত হয়েথাকে। আমেরিকার প্রগতিশীল যুবক যুবতী সেই পত্রিকাগুলির গ্রাহক। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদিও ঐ সংবাদপত্রগুলির প্রবেশ নিষেধ, তবুও ঐ সংবাদপত্রগুলিই যুবক-যুবতীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের প্রতীক।

আমেরিকায় যারা এসব সংবাদ রাখে, তাদের বলা হয় "পারসেনটেজ"। আমেরিকার এই 'পারসেনটেজ' পার্টির লোক রোজই বাড়ছে তাই আজ রুজভেল্ট চীৎকার ক'রেও অনেক কাজে অনেকেব সাড়া পান না এবং পাবেন বলে বোধও হয় না। এরা ওৎ পেতে বসে আছে সুযোগ পেলেই আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করবে ব'লে। এই হ'ল আমার ধারণা। কমিউনিস্ট দলের লোককেই উপহাস ক'রে 'পারসেনটেজ' বলা হয়।

ভাবছিলাম আজ রাত্রে বাইরে যাব না। পকেটে একতাড়া নোট রয়েছে। ভয় হ'ল যদি নিউইয়র্কের গুণ্ডার পাল্লায় পড়ি, তবে পথে বসতে হবে। হঠাৎ মনে হ'ল অতীত দিনের স্মৃতি, যেদিন পৃথিবী পর্যটনে বের হয়েছিলাম সেদিন পকেটে একটি পয়সাও ছিল না। আজ টাকা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, চুলোয় যাক টাকা, আমেরিকাকে আমার দেখতেই হবে। তখন রাত প্রায় এগারটা। বের হয়ে পড়লাম পথে।

বিজলী বাতির আলোয় হারলামের প্রশস্ত পথগুলি আলোকিত।

ব্রডওয়েতে বেড়াতে হলে এই শীতেও ঘাম বের হয় বিজলী বাতির উত্তাপে। দূর থেকে মনে হয় যেন আগুন লেগেছে। পঞ্চম এভিনিউ এবং একশত দশ ষ্ট্রীট ইষ্ট যেখানে মিলেছে সেখানে দাঁড়ালাম, সেনট্রাল পার্কের কাছে। আলোকোজ্জ্বল সুন্দর পথ, তারই ওপর অগণিত মোটর গাড়ি ও বাস চলছে। যারা 'জয়রাইড' করতে বের হয়েছে দোতালা বাসে, তাদের হাসির ফোয়ারার উচ্চ কলরবে আকাশ মুখরিত, কাছেই বড় বড় হোটেলে মদের বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সুন্দরী তরুণীর কলহাস্য আনন্দের সৃষ্টি করছে, যুবক যুবতী আপন মনে পথ চলছে এবং সারাদিনের পরিশ্রমের অবসাদ দূর করছে। তারা কখনও কখনও ছোট ছোট রেঁস্তোরায় প্রবেশ ক'রে লাইট্ রিফ্রেশমেণ্ট খেয়েই বের হয়ে পড়ছে। প্রতি মুহূর্তটিকে যেন তারা আনন্দে ভরিয়ে তুলছে। কাছেই একটা সিনেমা-গৃহে নাচ চলছে। আমেরিকায় একদিকে চলেছে ঐশ্বর্যভোগের আয়োজন আর একদিকে চলেছে নিরন্ন বেকার ও ক্ষুধিতের ব্যর্থ জীবনের করুণ দৃশ্য। কিন্তু ঐ যে দৃশ্য আমার সামনে, তা দেখে মনে হয় না আমি আমেরিকার কোথাও ভ্রমণ করছি, মনে হয় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে আছি। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের চারিদিকে সর্বহারা দল বাস করে, তাদের সংবাদ কেউ রাখে না। যাঁরা সেই সংবাদ রাখেন তাঁরা আসুন আমার আমেরিকার বর্ণিত স্থানে। দেখবেন এখানেও সর্বহারার দল নতমুখে বসে আছে। কেউ সারাদিনে এক টুকরো রুটী খেয়েছে আর কেউ অভুক্ত অবস্থাতেই পথের দিকে চেয়ে বসে আছে। আমেরিকার ব্যাঙ্কে প্রচুর স্বর্ণ আছে, বাগানে ফল আছে, মাঠে প্রচুর গম আছে, নদীতে জল আছে, দোকানে কাপড়জুতো সবই আছে কিন্তু ঐ ভিখারীদের কিছুই নেই! পরনে ছেঁড়া কাপড়ের ট্রাউজার, গায়ে ছেঁড়া কোট—কারও গায়ে সার্ট আছে, কারও গায়ে তাও নেই, নেকটাই কিন্তু তবুও ঝুলছে।

ভিয়েৎনাম

এটা কি রকম হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। এখানকার লোকগুলি আমাকে মোটেই ভালবাস্‌ছে না। বরং এমন ভাবে ঘৃণা করছে যে আমি নিজেই অস্থির হয়ে পড়েছি। দেখা যাক আজ রাত্রে কি হয়!

সন্ধ্যা হয় হয়। ছোট্ট শহরটিতে এসেছি। কোথা থেকে একজন পুলিশ এসে আমার পিছন নিল। আমি যেতে চাই শহরে আর সে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ স্টেশনে। প্রায় আশি কিলোমিটার পথ চলে এসেছি, এখন শরীরটা একটু বিশ্রাম চায়। কিন্তু বিশ্রাম করা সম্ভব হচ্ছে না। পুলিশ আমার সঙ্গ কোনমতেই ছাড়বে না। অবশেষে পুলিশটার সঙ্গে যাওয়াই স্থির করলাম। সেখানে গিয়ে অফিসারের কাছে পাসপোর্টখানা রেখে শহরের দিকে চললাম। শহরে কয়েকখানা লজিং হাউস ছিল। ফার্নিচার হিসাবে এবং স্থানবিশেষে ঘরের ভাড়ার তারতম্য হয় সে কথা আমার জানা ছিল, সেজন্য আমি গেলাম একটি অপ্রসিদ্ধ লজিং হাউসে।

লজিং হাউসের মালিক আনামীত, পরিচালিত হয় আনামীতের দ্বারা। যারা লজিং হাউস পরিচালনা করত তারা কেউই কোন বিদেশী ভাষা জানত না, সেজন্য আকারে-ইঙ্গিতে ভাড়া ঠিক করলাম। ঠিক হ'ল রাত্রে শোবার জন্য ষাট সেণ্ট দেব এবং লজিং হাউসের পরিচালক যদি এক পেয়ালা কফি এনে দেয় তবে আরও ত্রিশ সেণ্ট দেব। লজিং হাউসের মালিক একখানা কাগজে বিল এনে দিল। আমি বিল চুকিয়ে দেব ভেবে একটি 'পেসো' —স্থানীয় টাকা—পকেট থেকে বের করেছি দেখে লোকটি তার ঘড়ি দেখিয়ে বলল, আগামীকল্য পাওনা সেণ্টগুলি নেবে—আজ নেবে না। পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে সন্ধ্যার পর শহর বেড়াবার আর প্রবৃত্তি হ'ল না।

না খেয়ে শোবার জন্যই হোক আর পথে বের হবার প্রবল ইচ্ছাতেই হোক, সকাল পাঁচটার সময়ই ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম থেকে উঠেই পুলিশ স্টেশনের দিকে অগ্রসর হলাম। তখনও পূর্বাকাশে সূর্য দেখা দেয়নি, তখনও পাখীর কলরব আরম্ভ হয়নি। শহরটি নীরব নিস্তব্ধ। কিন্তু আমি পুলিশ স্টেশনের যতই নিকটবর্তী হচ্ছিলাম ততই একটি লোকের গোঙানি শুনতে পাচ্ছিলাম। অবশেষে পুলিশ স্টেশনের দরজায় দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম একটি লোককে বেদম প্রহার করা হচ্ছে। লোকটা প্রহারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে। মাঝে মাঝে যখন সে অচৈতন্য হচ্ছে তখন আর শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু যখনই তার জ্ঞান ফিরে আসছে তখন সে আনামীত ভাষায় কি বলছে এবং চীৎকার করছে। এরূপ ভাবে যখন অত্যাচার চরমে উঠেছিল তখন লোকটা হঠাৎ বোধহয় অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিল নতুবা তার আর্তনাদ বন্ধ হয়ে যাবার কোন কারণই থাকতে পারে না।

এদিকে সূর্য উঠে গেছে। পথে লোক চলাচল আরম্ভ হয়েছে। আমিও যেন এই মাত্র এসেছি এরূপ ভান ক'রে সাইকেলটাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে রেখে দিলাম। সাইকেলের বেলটা ক্রিং ক'রে বেজে উঠল। পুলিশ অফিসার বিমর্ষ-বদনে দরজা খুলে দিল। আমি ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই একজন আনামী যুবককে মাটিতে পড়ে আছে দেখতে পেয়ে যেন একটু ভীত হয়েছি ভাবটি দেখিয়ে পাসপোর্টখানা গ্রহণ করলাম এবং সাইকেলটাতে আর একটা ঝাঁকানি দিয়ে মোড় ফিরিয়ে লজিং হাউসের দিকে রওনা হলাম। আমি যখন লজিং হাউসের দিকে যাচ্ছিলাম তখন প্রত্যেকটি পথচারী আমার দিকে বিষদৃষ্টিতে চেয়ে মুখ ফেরাচ্ছিল। আমি তখন গুন গুন ক'রে গাইছিলাম—

দেখে রক্তারক্তি, বাড়বে শক্তি, কে যাবে রে মাকে ফেলে,
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে যায় যেন জীবন চলে।

লজিং হাউসে ফিরে এসে দেখি বয় বিল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিলের দিকে চেয়ে দেখি তাতে আরও কিছু লেখা হয়েছে এবং নব্বই সেণ্টের স্থানে তিন ডলার নব্বই সেণ্ট লেখা হয়েছে। নূতন বিলটা দেখেই আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। আমি চীৎকার ক'রে লজিং-এর লোককে গাল দিতে লাগলাম। আমি যখন চীৎকার ক'রে গাল দিচ্ছিলাম তখন একজন পাঠান সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমার শব্দ শুনে দাঁড়ালেন এবং পথে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে ভাই?" আমি তাঁকে সকল কথা খুলে বল্‌লাম। তিনি বললেন, "চীৎকার ক'রে আর কি লাভ হবে, বিলের টাকা দিয়ে দিন তবেই সকল আপদ চুকে যাবে।" আমি পাঠান ভদ্রলোকটিকে বললাম, "আমার কাছে যদি এতগুলো টাকা থাকত তবে হয়ত চীৎকারও করতাম না।" তখন তিনি নিজের মানিব্যাগ খুলে বিলটা চুকিয়ে দিলেন এবং বললেন, "ভাই আজ থেকে রাত্রে বাইরে থেকো তবুও লজিং হাউসে যেও না। আজকাল আনামীতরা ইণ্ডিয়ানদের মোটেই পছন্দ করে না, তারা ভাবে আমরাও এদের ওপর অত্যাচার করার জন্যেই এদেশে এসেছি। বাস্তবিক পক্ষে আমরা আনামীতদের প্রতি অত্যাচারও করছি। পুলিস-বিভাগে আমাদের দেশের অনেক লোক কাজ করে। তারা ফ্রেঞ্চদের মতই মাইনে পায় এবং ফ্রেঞ্চদের মতই আনামীতদের প্রতি অত্যাচারও করে। লজিং হাউসের মালিকরা হয়ত তোমাকে একজন ফ্রেঞ্চ অফিসার ভেবে এই মিথ্যা বিলটি দিয়েছে। এখানে আর হাঙ্গামা বাধিয়ে লাভ নেই, আজ সন্ধ্যার সময় যাতে আর বিপদে না পড়তে হয় সেদিকেই দৃষ্টি রেখো।" পাঠান ভদ্রলোক আমাকে পাঁচ পেসো দিয়েছিলেন, তা থেকে তিন পেসো নব্বই সেণ্ট

লজিং হাউসের বয়কে দিয়ে যখন পথে নামলাম তখন মনটা যেন ভেঙ্গে পড়ল। সকাল বেলার আনামীত যুবকের গোঙানি আমার কানে আর প্রতিধ্বনি তুললো না, প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল প্রতারণার।

দুপুর বেল্লা ছোট্ট একটা শহরে পেট ভরে খেলাম। তারপর শহরের বাইরে গিয়ে একটা গাছতলায় শুয়ে থাকব ভেবে যেই সাইকেল থেকে নেমেছি অমনি "ফঁ্যাস্" ক'রে একটা শব্দ সাইকেলের টিউব থেকে বের হ'ল এবং বুঝলাম টিউবে এমন কিছু বিঁধেছে যার ফলে টিউবটিতে বড় রকমের ফুটো হয়েছে। আমি আর টিউবটি সারাবার চিন্তা না ক'রে গাছের নীচে শুয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গল। ঘুম থেকে উঠে দেখি কয়েকটি আনামীত যুবক এবং প্রৌঢ় আমার সাইকেলের ফুটো সেরে সাইকেলখানাকে ঘষে মেজে ঝকঝকে করেছে এবং কয়েকটি যুবতী পাশে দাঁড়িয়ে আমার পরিচয়-পত্র পড়ছে। আমি উঠে দাঁড়াবার পরই সকলে একে একে আমার সঙ্গে করমর্দন ক'রে "হুররে গান্ধী" বলে চীৎকার ক'রে উঠল। আমিও "মহাত্মা গান্ধীজিকী জয়" বলে চীৎকার করলাম, তারপর আবার করমর্দন এবং বিদায়-সম্ভাষণ। আমি যখন এদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম তখন আমার মনের পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। সাইকেল প্যাডেল করার সময় চিন্তা করছিলাম, যদি আমাকে এ দেশে ভালভাবে পর্যটন করতে হয় তবে আমাকে পর্যটক বলে পরিচয় দিতে হবে। সন্ধ্যার সময় শহরে পৌঁছেই আমি এক জনাকীর্ণ লজিং হাউসের কাছে একটি ইটিং হাউসে —খাবারের দোকানে প্রবেশ করলাম। খাবারের দোকানের সামনে অনেকগুলি লোক দাঁড়িয়েছিল, তাদের প্রত্যেককে এক একখানা ক'রে পরিচয়পত্র দিয়ে যখন খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম তখন একজন আনামীত যুবক আমার কাছে এসে বসল এবং মালয় ভাষায় বলল, "বন্ধু, এখানে

বিনা পয়সায় খাওয়া পাওয়া যায় না।" যুবককে বুঝিয়ে বললাম, "খাবার পয়সা আছে তবে লজিং চার্জ দেবার মত অর্থ আমার নেই। আমি আগামীকালও এখানে থাকব এবং ভিক্ষা ক'রে রাত্রে থাকার খরচ ওঠাব।" যুবক আর কিছুই বললে না। একটু দূরে বসে আমার খাওয়া দেখতে লাগল। ভাত, মুরগীর তরকারী প্লেটের পর প্লেট নিঃশেষ ক'রে যখন বিল চাইলাম তখন দেখতে পেলাম মাত্র পঞ্চাশ সেণ্ট চার্জ করা হয়েছে। হিসাব মতে আমি প্রায় এক পেসো অর্থাৎ আমাদের দেশের দেড় টাকার খাদ্য খেয়েছিলাম। ইটিং হাউসের বয়ের ব্যবহারে খুশী হয়ে যখন বাইরে এলাম তখন আনামীত যুবক বলল, "এই লজিং হাউসে আসুন।"

যুবকের পেছন পেছন চলে লজিং হাউসের দরজায় পৌঁছানোমাত্র একটি বয় এসে আমার সাইকেলখানা ঘরের ভেতর টেনে নিল। আমি পিঠ-ঝোলাটা কেরিয়ার থেকে খুলে হাতে নিলাম এবং যুবকের পেছন পেছন দোতালাতে উঠলাম ও যুবকের নির্দেশ মতে একটি ঘরে প্রবেশ করলাম। যুবক লজিং হাউসের বিছানা দেখিয়ে বললে, 'এতে হবে?' 'নিশ্চয়ই বন্ধু, এর ভাড়া কত?' 'দৈনিক এক পেসো, তবে আপনার কিছুই দিতে হবে না। এখন আপনি বিশ্রাম করুন, রাত্রে দেখা হবে।' এই বলেই যুবক চলে গেল। আমি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে স্প্রিং-এর খাটিয়ার উপর গদি-আঁটা বিছানায় ধপাস ক'রে শুয়ে পড়লাম। চমৎকার লাগল। এরূপ বিছানায় যদি সারাজীবন শুয়ে যেতে পারি তবে আর কথাই থাকে না। কিন্তু সুখ সকলের জন্য নয়। দপ্ দপ্ ক'রে আওয়াজ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে একটা লোক উপরে উঠে আমার দরজায় টোকা মারল। টোকা মারার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিলাম এ পুলিশের লোক। এত মদগর্বগর্বিত লোক পুলিশের লোক ছাড়া আর কেউ নয়। দরজা খুলে দিলাম। লোকটা রুমে

প্রবেশ ক'রেই হাম্বি-তুম্বি ক'রে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কি বলতে লাগল। আমিও তারই অনুপাতে চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম "তোমার কি চাই ?" সে যতই ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলছিল আমিও ততই ইংলিশে আজেবাজে কথা বলছিলাম। আমার জানা ছিল না ফরাসী ইন্দোচীনে ইংলিশ ভাষায় কথা বলা আইনবিরুদ্ধ, অবশ্য সে আইনটি শুধু আনামীতদের প্রতিই আরোপিত হ'ত। অবশেষে পুলিশটা বললে "মহাশয়কে পুলিশ, স্টেশনে যেতে হবে।" আমি তাকে বললাম "আজ হবে না কোন মতেই, আজ তুমি আমার পাসপোর্টখানা নিয়ে যাও। পাসপোর্টখানা হাতে পেয়ে লোকটার মনের পরিবর্তন হ'ল এবং আমাকে ফ্রেঞ্চ ভাষায় শুভরাত্রি বলে বিদায় নিল।

রাত্রি গভীর। আমার নাসিকাধ্বনি তখন পঞ্চমে উঠেছে। এমন সময় কয়েকটি লোক, আমার ঘরে প্রবেশ ক'রে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করল। তারা আমাকে চেঁচিয়ে কথা বলতে নিষেধ করল এবং আমার চারদিকে বসে কয়েকটি প্রশ্ন করল। প্রথম প্রশ্নটি হ'ল, নন্-কোঅপারেশন কি রকমে করা হয় ? বাস্তবিক পক্ষে এসম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না কারণ ১৯১৮ সাল থেকে আমি ভারতের বাইরেই চাকরি করতাম এবং বাইরে থেকে অন্যে এ বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল আমিও সেই অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছিলাম। ১৯২৪ সালে একবার বেলুচিস্থানের ম্যালেরিয়া নিয়ে বাড়িতে আসি এবং সেই ম্যালেরিয়া আমাকে এমন কাবু করেছিল যে ঘরের বার হবার ক্ষমতাও ছিল না। ঐ সালেই পুনরায় বিদেশে চলে যাই, তারপর মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং-ইণ্ডিয়া ছাড়া আর কোনও দেশী সংবাদপত্রের সন্ধানও রাখতাম না। ইয়ং-ইণ্ডিয়াতে বরদৌলী সত্যাগ্রহের সংবাদ সবিস্তারে বের হত। আমি তারই কিছুটা তাদের কাছে বলেছিলাম।

আমার কথা শুনে এরা একের মুখের দিকে অন্যে চেয়ে রইল। বুঝতে

পারলাম, এতবড় কল্পনা অনুযায়ী তাদের কাজ ক'রে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা কিভাবে কাজ আরম্ভ করতে চান?'

আনামী যুবক বল্‌ল, 'আমরা দুটি পথ ঠিক করেছি। প্রথম পথটি হ'ল, আমাদের যুবসমাজ পুলিশের যে কোন কাজ থেকে বিরত থাকবে, দ্বিতীয় পথ হ'ল, আমাদের দেশের যুবতীরা কোনও মিলিটারী অথবা সিভিল অফিসারকে পতিরূপে গ্রহণ করবে না এমন কি বারবনিতারা পর্যন্ত ফরাসী অফিসারদের থেকে দূরে থাকবে। আমরা কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। অনেক যুবক পুলিশের কাজ গ্রহণ না করার জন্য কারাবরণ ত করছেই অধিকন্তু মৃত্যুমুখেও পতিত হচ্ছে। কেন এবং কিভাবে আনামী যুবকগণ মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হচ্ছে তা বোধ হয় আপনি জানতে চাইবেন। সেকথাই বলছি। আমাদের দেশে একটি জেল-নিয়ম আছে, সেই নিয়মটি হ'ল অমুক জেলে এত কয়েদীর বেশী রাখা যাবে না। আপনি হয়ত ভাববেন যদি কয়েদীর সংখ্যা বেড়ে যায় তবে হয়ত কয়েদীদের অন্য জেলে পাঠানো হয়। তা হয় না। অতিরিক্ত কয়েদীদের যমের বাড়ি পাঠানো হয়। আজকাল যে সকল যুবক পুলিশের কাজ নিতে রাজি হচ্ছে না, তাদের জেলে পাঠানো হয় এবং অতিরিক্ত কয়েদী বলে গিলোটিনে দেওয়া হয়। এতে ফল খারাপ হচ্ছে না। যুবকের দল এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের অনবরত হত্যা করা হচ্ছে। যে সকল বারবনিতা ফরাসী অফিসারদের গ্রহণ করছে না, তাদেরও অন্ধ ক'রে ফেলা হচ্ছে। বন্ধু, সাইগনে গিয়ে এই অন্ধ বালিকাদের একবার দেখবেন এবং পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে গিয়ে ইন্দোচীনের কথা লোকসমাজে প্রচার করবেন।'

তারা যা বললো, তা সত্য না মিথ্যা তা যাচাই করার সুযোগ আমার হয় নি, তবে আমি তাদের কথায় রাজি হয়েছিলাম, কিন্তু প্রচার করার সুযোগ কোথাও পাই নি। যেখানেই গিয়েছি সর্বত্র দেখেছি সাম্রাজ্যবাদীরা

একজনের ঘাড়ে বসে অন্যকে হত্যা করছে। কার কথা কার কাছে গিয়ে বলব? পূর্ব দেশগুলি ভ্রমণ ক'রে আসার পর ইন্দোচীনের কথা কারো কাছে বলতে সাহস করিনি।

পরের দিন, সকাল বেলা পুলিশ স্টেশনে যাবার সময় শহরের যার সঙ্গেই দেখা হতে লাগল সে-ই দেখলাম আমার দিকে তাকাচ্ছে এবং কিছু যেন বলতে চাইছে। আমি কিন্তু কোথাও দাঁড়ালাম না। একেবারে পুলিশ স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং ইংলিশ ভাষার সাহায্য নিয়েই কথা বলতে লাগলাম। পুলিশ অফিসার আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল এবং কিছুক্ষণ পরে বলল, 'মঁশিয়ে আপনি ইংলিশ ভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা কি জানেন না?' 'জানবে না কেন, অন্য ভাষা ত আপনি বুঝবেন না, মালয়, শ্যাম, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী এসব ভাষা আপনি জানেন কি?' অফিসার বললে, 'না মঁশিয়ে, তবে কি না, এখানে ইংলিশ ভাষা বলা নিষেধ আছে, আমরা এই ভাষাটা মোটেই পছন্দ করি না।' আমি পুলিশ অফিসারকে বলেছিলাম, 'বোকার মত কথা বলবেন না। বেকুফী ধারণা পোষণ করবেন না। এখন বলুন আমাকে কেন ডেকেছিলেন? আগামীকল্য সকাল বেলা আমি এখান থেকে রওনা হব, পাসপোর্টের জন্য তখন আসব।'

পুলিশ অফিসার ঘাড় নাড়ল। আমি সেখান থেকে বের হয়ে এলাম এবং সারাদিন শহরে ভিক্ষা ক'রে বেশ দু'পয়সা পেলাম। লক্ষ্য ক'রে দেখলাম আনামীতরা আনন্দের সঙ্গে ইংলিশ ভাষা গোপনে শিক্ষা করছে। ইংলিশ ভাষা শিক্ষা করা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত ইয়ং-ইণ্ডিয়া তারা পাঠ করতে পারবে এবং ইংলিশ ভাষায় প্রকাশিত দেশ-বিদেশের সংবাদও পড়তে জানতে সক্ষম হবে।

আজ যাদের কথা আমরা সংবাদপত্রে ভিয়েৎনাম এবং ভিয়েৎনামীজ

বলে পড়ছি তারাই একদিন এতখানি দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে জাত গঠন করেছিল। সুখের বিষয় মহাত্মা গান্ধীর দানও তাতে অনেক কিছুই ছিল এবং আজ অতীতের সেই যাযাবর দিনগুলির কথা স্মরণ ক'রে, আমিও ব্যক্তিগতভাবে এই আনন্দ পাই যে, আজ যারা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়ছে, সেদিন তাদের সেই সংগ্রাম-বেদনার কিছুটা অংশ নিজের চোখে দেখে এসেছি।

ড্রেসডেন (জার্মানী)

ড্রেসডেন মস্ত বড় শহর। এত বড় শহর প্রথম দিনেই বেড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে হ'ল না। থাকবার স্থানই খুঁজে বের করা দরকার মনে করলাম। অনেকগুলি হোটেলে গিয়ে সস্তায় কোথাও ঘর পেলাম না। অবশেষে একজন পুলিশের শরণাপন্ন হলাম। সে আমাকে হিটলার ইয়ুথ লীগের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেক্রেটারি মহাশয়ের কাছে পরিচয় ক'রে দিল। সেক্রেটারি বেশ ভাল ইংলিশ বলতে পারতেন। তিনি আমাকে পর্যটক রূপেই গ্রহণ করেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে আমেরিকানদের ধরণে আঙ্গুলে তুড়ি দিয়ে বললেন, 'ঠিক হয়েছে। স্থান দিতে পারব কিন্তু আমাদের নিয়ম মেনে চলতে হবে, পারবে ত?' জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাদের নিয়ম কি বলুন?' তিনি বললেন, 'দিনে ঘুমোতে পারবেন না। রুম থেকে সকাল নটার সময় বেরিয়ে যাবেন আর বিকেলে সাতটার সময় রুমে প্রবেশ করতে পারবেন। সিগারেট খেতে পারবেন না। কারো সঙ্গে কোনরূপ মেয়েলোক সম্পর্কিত কথা বলতে পারবে না,—বুঝেছ আমি কি বলতে চাইছি' বলেই চোখের ইঙ্গিতে

কথা শেষ করলেন। সেক্রেটারি মহাশয়কে অতি ভদ্র এবং অতি নম্রভাবে বললাম, 'আমি আপনাদের এখান থেকে তুদিন পরই চলে যাব। আমার শরীর তুর্বল। আপনার শেষোক্ত আদেশই শুধু পালন করতে পারবো, অন্যগুলি পালন, করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।' সেক্রেটারি কি চিন্তা ক'রে বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে' বলেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে রুমের দরজা খুলে দিলেন।

রুমের দরজা খুলে দেবার পর দেখতে পেলাম, ঘরটাতে এক শত কুড়ি জন লোকের শোবার বন্দোবস্ত রয়েছে। ভদ্রলোককে আর কোন কথা না বলেই সাইকেল নিয়ে ভেতরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আমার প্রচলিত নিয়ম মত গা থেকে জামা খুলে বেশ ক'রে ম্যাসেজ করলাম, তারপর কয়েকটা বৈঠক ক'রে একটি বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

তখন অনেক বেলা ছিল। বিশ্রাম ক'রে বাইরে এসে হিটলার ইয়ুথ লীগের বাড়িটি দেখতে আরম্ভ করলাম। আমাকে যে রুমটি দেওয়া হয়েছিল সেরূপ একশ'টি রুম সেই বাড়িটিতে ছিল। স্নানাগার এবং পাইখানার ব্যবস্থা সে অনুপাতেই ছিল। পাচকদের রুমটি বেশ বড়। সেখানে চার জন পাচক চার রকমের খাদ্য তৈরী করছে। স্থপ, মাংস ভাজা এবং প্রচুর পরিমাণে রুটি-মাখন জমা ছিল। এক দিকে একটা প্রকাণ্ড কাঁচের হাঁড়িতে কফি সিদ্ধ হচ্ছিল।

তারপর গেলাম খাবারের ঘরে। সেখানে একটি তের চৌদ্দ বৎসরের ছেলে রুটি-মাখন এবং স্থপ খাচ্ছিল। পাশেই এক পেয়ালা তুধবিহীন কফিও ছিল। ছেলেটিকে দেখে তার প্রতি আমার স্নেহ হ'ল। বেচারী অত্যন্ত তুর্বল। তার সাদা হাতে নীল বর্ণের নাড়ীগুলি ভেসে উঠছিল। ছেলেটি নীরবে খাচ্ছিল এবং আমার দিকে তাকাচ্ছিল। তার দিকে

বেশীক্ষণ না তাকিয়ে বাইরে গেলাম এবং একটি বসবার স্থানে বসে ভাবতে লাগলাম ইউরোপে এরূপ হচ্ছে কেন।

সাতটা বেজে গেছে। দলে দলে কিশোর এবং যুবক হিটলার ইয়ুথ লীগে ফিরতে আরম্ভ করেছে। তারা সবাই পরিশ্রান্ত এবং অভুক্ত। এদের মলিন মুখ দেখে প্রাণে বেশ আঘাত লাগছিল। বেশীক্ষণ বাইরে বসে থাকতে ভাল লাগল না, রুমে ফেরার পথে সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি দেখলেন ?'

ক্লান্ত কিশোর এবং যুবকের দল ফিরে আসছে। তাদের মুখ শুকিয়ে গেছে, তারা খাদ্য চায়, তাদের জন্য কি খাবার তৈরী হয়েছে ? তারা কি পেট ভরে খেতে পাবে ?

পেট ভরে খেতে না পাক, কিছুটা পাবে, শোবার উত্তম বিছানা পাবে, এর বেশী আর কি ?

আপনাদের দেশ এত দরিদ্র কেন ?

আপনাদের প্রভুদের অনুগ্রহে।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। ধন্যবাদ বলে অন্য কথার অবতারণা করলাম। কথার মোড় ফেরাতে দেখে সেক্রেটারি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হঠাৎ কথার মোড ফেরালেন যে ?' আমি নিরুপায় হয়ে তখন বললাম, 'আপনি বৃটিশ স্পাইও হতে পারেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের বন্ধু নয় এটা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, এখন দেখছি আপনিও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিপক্ষেই কথা বলছেন।'

সেক্রেটারি বললেন, 'সাধে কি আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। জগতের যত ভাল ভাল জিনিস তৈরী করব আমরা আর বিক্রি করবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। আমাদের তৈরী মাল দেড়া দামে বিক্রি ক'রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ফেঁপে উঠেছে, আর আমাদের দেশের

লোক না খেতে পেয়ে মরছে।'

সেক্রেটারি মনের দুঃখে আধমরা হয়ে ছেলেদের খাবারের ঘরে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। দেখলাম হাজার ছেলে একত্রে বসে খাচ্ছে কিন্তু একটু শব্দ হচ্ছে না। ছেলেদের উদ্দেশে সেক্রেটারি গোনা দশটি শব্দ উচ্চারণ ক'রে হেইল হিটলার বলে বিদায় নিলেন। আমি বিদায় না নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বসে খেলাম এবং পেট-ভরা খাদ্যের জন্য অর্ধ মার্ক দিলাম। এখানে "টিপ" দেওয়া নিষেধ, সেজন্য "টিপ" দেই নি। আধমার্ক দিয়ে যে খাবারটুকু পেয়েছিলাম, বাইরে কোনও রেঁস্তোরায় তত সস্তা খাদ্য পাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

সকলের খাওয়া আটটার মধ্যেই শেষ হ'ল। শেষ ক'রে ছেলেরা যাকেই সামনে পেল তাকেই হেইল হিটলার বলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। রাত সাড়ে নটার মধ্যে বাড়িটা নিস্তব্ধ হ'ল। দেশলাই জ্বালালে পাছে পাশের রুমের ছেলেদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় সেজন্য আমি একটা সিগারেটের আগুন দিয়ে অন্য সিগারেট ধরিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম, তারপর কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। মন দিয়ে লিখছিলাম। গভীর রাত্রে হঠাৎ দরজায় কে টোকা মারল। যে অবস্থায় আমি লিখছিলাম সেই অবস্থায় কাগজগুলি রেখে দরজা খুলে দিলাম। সেক্রেটারি চোরের মত রুমে প্রবেশ ক'রে বললেন, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য কিছু মনে করবেন না। আমি আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। প্রশ্নগুলির জবাব দু-এক কথার মধ্যে দেবেন। আমাদের পুলিশ বিভাগ আপনার কাছ থেকে সেই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা ক'রে আজই তাদের জানিয়ে দিতে বলেছে।'

প্রথম প্রশ্ন ঃ—জার্মানীতে প্রবেশ করার সময় আপনার কাছে কত মার্ক ছিল এবং এখন কত আছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ—আপনার ডায়েরীতে

সেথা যে সকল দেশ ভ্রমণ করেছেন—সেই দেশগুলিতে যে গিয়েছেন এবং ভ্রমণ করেছেন তার অন্য কোন প্রমাণ আছে কি না? তৃতীয় প্রশ্ন :—আপনার ভ্রমণের খরচ কোথা থেকে পান?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর—চৌদ্দ মার্ক, এক পাউণ্ডের চার খানা নোট। তিনটি অষ্ট্রিয়ান শিলিং, দুটি হাঙ্গেরীয় পেঙ্গা, পাঁচ রিয়েলের একখানা ইরানী নোট, দশ ডলারের একখানা চীনা নোট, একটি ভারতীয় চার আনার সিকি, সিঙ্গাপুরের এক ডলারের একখানা নোট এবং জারের আমলের একশত রুবেলের একখানা নোট।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—অটোগ্রাফ বই এবং প্রেস কাটীং।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর—ভিক্ষা।

অটোগ্রাফ বইখানা সেক্রেটারি মহাশয় অনেকক্ষণ দেখে মন্তব্য করলেন—এতে একটিও বড় লোকের অটোগ্রাফ নেই, এমন কি ভারতের নেতা মহাত্মা গান্ধীরও অটোগ্রাফ নেই। মন্তব্যের উত্তর আমি দিই নি। তারপরই সেক্রেটারি আমার মুখের দিয়ে চেয়ে বললেন, ফুরারের অটোগ্রাফ পাবার জন্য বোধ হয় চেষ্টা করবেন?—না মহাশয়, আমি কোনও বড়লোকের অটোগ্রাফ নেবার জন্য সময় নষ্ট করি না। বড় লোকের কাজ দেখে যাওয়া পছন্দ করি। আমার কথা শুনে সেক্রেটারি মহাশয় কি ভেবেছিলেন তা জানি না, শেষকালে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি কমিউনিষ্টদের মত পোষণ করেন? চটপট ক'রে জবাব দিলাম, এ সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নেই। সেক্রেটারি মহাশয় উত্তর শুনে খুশী হলেন।

পরের দিন সকাল বেলা, কুড়ি লক্ষ নরনারীর অধ্যুষিত ড্রেসডেন নগর ভ্রমণে বের হলাম। একজন নাজী অফিসার আমাকে শহর দেখাতে বের হয়েছিল। অনেক বড় বড় গির্জা এবং বিল্ডিং দেখালেন। একটি

গির্জা অথবা বিল্ডিংয়ের ভেতর গেলাম না। শহর-গঠনের পারিপাট্য দেখেই খুশী হলাম। দুপুর বেলা আমরা একটি বাগিচায় এলাম। বাগিচায় অনেক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা আরাম কেদারায় বসে কফি খাচ্ছিলেন। বৃদ্ধারা গল্প করছিলেন বটে কিন্তু তাদের হাতে উলের সূতা ছিল এবং তাঁরা কিছু কিছু বুনছিলেন। আমাকে দেখা মাত্র সকলেই আমার দিকে তাকালেন। আমার পরিচয়-পত্র সকলকে দিলাম। প্রত্যেকেই আমাকে কিছু দান করলেন। দানের অর্থে দুটো পকেট ভরে গেল। অনেকগুলি বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ ইংলিশ জানতেন না সেজন্য তাদের সামনে সামান্য হেসে এবং কেশেই বিদায় নিতে হ'ল। ভাবছিলাম হয়ত সঙ্গের নাজী সেপাই আমার কাছে কিছু চাইবে কিন্তু ইয়ুথ লীগের সামনে এসে, সে-ই প্রথম আমাকে হেইল হিটলার বলে বিদায় নিল। অন্যান্য দেশে কিন্তু সেরূপ দেখতে পাই নি। যে-ই আমাকে সাহায্য করেছে সে-ই আমার কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিয়েছে।

অনেকগুলি জার্মান মুদ্রা হাতে পেয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা হ'ল না। বাইরে গিয়ে খেয়ে এলাম। ফেরার পথে অনেকগুলি ইংলিশ ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। আমি যে একজন ভারতবাসী ইংলিশ ছেলেরা জানত না। তাদের সঙ্গে একটি দক্ষিণ আফ্রিকার ছেলে ছিল। সে-ই ইংলিশ ছেলেদের জানিয়ে দেয় আমি ভারতবাসী। ইংলিশ ছেলেদের ধারণা ছিল ভারতবাসীরা ধনী এবং দাতা। আমার কাছে কিছু চাইলেই পাবে। ইংলিশ ছেলেরা আমার কাছে শুধু হাত পাতলো না, রাত্রে কোথায় থাকবে তার ব্যবস্থা করতেও প্রার্থনা করল। ইংলিশ ছেলেদের মুখপাত্র হয়ে যে ছেলেটি কথা বলছিল সে-ই করল, সে 'স্যার' অথবা 'প্লিজ' দুটি কথা বাদ দিয়ে কথা বলছিল! তার ভাষায় অভদ্রতা দেখে বললাম, "আগে ভদ্রতা শিখে বিদেশী লোকের

কাছে সাহায্য পাবার জন্য আবেদন নিবেদন করো, বুঝলে? এখন পথ দেখ।"

আমার কথা শুনে নিকটে দাঁড়ানো অন্য ছেলেরা কাছে এসে বললে, 'স্যার, এই ছেলেটা দক্ষিণ আফ্রিকাতে জন্মেছে, ভদ্রতা এখনও শেখেনি, ওকে ক্ষমা করবেন।' অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে একটি ডেনিস ছেলেও ছিল। সে বললে, "দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে আসার পর ওর হুঁশ হয়নি যে ইউরোপে এসেছে। খরচ চালাচ্ছে ভিক্ষা ক'রে, আর স্বপ্ন দেখছে হীরা-মুক্তার।"

ইংলিশ এবং ডেনিস ছেলেটির কথায় রাগের উপশম হ'ল। তাদের আমার অনুসরণ করতে বলায় তারা আমার সঙ্গে এসে হিটলার ইয়ুথ লীগের সামনে দাঁড়াল। ভেতরে গিয়ে ইয়ুথ লীগের সেক্রেটারিকে ডেকে আনলাম এবং কুড়িজন নব যুবকের থাকবার স্থান করে দিতে বললাম। সেক্রেটারি প্রথমে আপত্তি করলেন এই বলে যে, এরা ভাল ছেলে নয়, সিগারেট এবং বিয়ার খায়। এদের কি গরীব ছেলেদের সঙ্গে থাকা সম্ভব হবে? সেক্রেটারির কাছে এদের স্বভাব ভাল থাকবে বলে আমি জামিন হবার পর, আমার রুমেই ওদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হ'ল।

ছেলেরা প্রত্যেকে তাদের নাম ধাম এবং জাত লিখিয়ে দিয়ে বিশ্রামার্থ যখন ঘরের দিকে রওনা হ'ল তখন সেক্রেটারি আমাকে বললেন, এত ছোট ঘরটাতে যদি সকলে মিলে সিগারেট খেতে আরম্ভ করে তবে সমস্ত বাড়িটাই বিষাক্ত হয়ে যাবে। আপনাকে সিগারেট খাবার অধিকার পূর্বেই দিয়েছি এবার আর তিনটি যুবককে সিগারেট ব্যবহার করার অধিকার দিচ্ছি। যাদের সিগারেট খাবার অধিকার দেওয়া হ'ল তাদের দেখিয়ে দিলেন। এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম তাদের মুখ শুকিয়ে গেছে, ভাবছিলাম বিশেষ অধিকার পেয়ে এরা সুখী হবে, কিন্তু হ'ল বিপরীত। একটু পরেই তিনটি ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম তাদের

মুখ শুকিয়ে যাবার কারণ কি ? তিনটি ছেলেই বল্‌লে তারা হ'ল ইংলিশ জু। সেজন্যই সিগারেট খাবার অধিকার পেয়েছে। অনিষ্টকারী সিগারেট ইংলিশরা যদি খায় তবে অ্যাংলো সেক্‌সন জাতের ক্ষতি হবে, ইহুদীরা এই বিষাক্ত জিনিষ খেয়ে যদি মরে তবে দুঃখ করার কিছুই নেই। হিটলার ইয়ুথ লীগের সেক্রেটারী মহাশয়ের বৃহত্তর জাতীয় ভাবের পরিচয় পেয়ে দুঃখিত হয়েছিলাম।

ইয়ুথ লীগে থাকা আমার পক্ষে পোষাচ্ছিল না। থাকার কথা যেমন তেমন, খাওয়াটাই একটু কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্য সেক্রেটারি মহাশয়কে অন্য সুবন্দোবস্ত করতে বললাম। সেক্রেটারি মহাশয়ও আমার কথায় রাজি হলেন। যুবকগণ বিদায় নেবার পর সেক্রেটারি মহাশয়কে সেকথাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আগামীকাল সে বিষয়ে তিনি একটা হেস্তনেস্ত করবেন।

সেক্রেটারি মহাশয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খাবারের ঘরে এসে দেখি কুড়িজন যুবকই খেতে বসেছে। আমিও তাদের কাছে বসে কিছু খেলাম। কিন্তু তাদের মত আকণ্ঠ আলু সিদ্ধ খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। সামান্য মাখন রুটি এবং এক গ্লাস গরম দুধ খেয়েই সন্তুষ্ট হলাম।

দক্ষিণ আফ্রিকার যুবকটি ইংলণ্ডে এসে ইংলিশ যুবকদের সঙ্গে ইউরোপে ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিল। তারা সকলেই ভিক্ষা করত। তাদের কাছে ফিরে যাবার মত অর্থ ছিল, কিন্তু খেয়ে এবং শুয়ে থাকবার মত অর্থ ছিল না। এদের আর্থিক দুর্দশা দেখে এদের নিকট ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থার কথা, হোটেল ভাড়া এবং খাবারের দামের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং আরও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, জার্মাণীর মত তাদের দেশেও পর্যটককে তারা আর্থিক সাহায্য করে কি না। প্রত্যেকটি যুবক আমার প্রশ্নের উত্তরে "না"-ই বলেছিল। "শুধু ডেনিস যুবকটি বলেছিল, 'মহাশয়, আমি ইংলিশ

নই, আমি জাতে ডেনিস। আমাদের দেশে যদি আপনি যান তবে অর্থের অভাব হবে না। বৃটেনে আমি গিয়েছিলাম, দেখেছি সেখানে কেউ কারোকে ভিক্ষা দেয় না। যদি ভিক্ষা পেতে হয় তবে সময়ের অপব্যবহার যথেষ্ট করতে হয়। ছয় পেনি ভিক্ষা পেতে হলে ছয় ঘণ্টারও বেশী সময় লাগে।' যুবকটির কথা শুনে আমার জিহ্বা শুকিয়ে গিয়েছিল।

রাত হয়ে গেছে। আমাদের রুমের সকলেই এসে গেছে। আমি তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে কি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করলাম। হঠাৎ মনে হ'ল সিগারেট খাবার কথা। দেখলাম সকলেই সিগারেট ফুঁকছে আর নানারূপ গল্প করছে। বাতি তখনও জ্বলছিল। হঠাৎ দরজায় এসে কে বেশ জোরের সঙ্গে আঘাত করল। যাদের সিগারেট ব্যবহারের কথা ছিল না তারা সকলেই সিগারেট নিবিয়ে অর্দ্ধভুক্ত সিগারেটের টুকরো লুকিয়ে রাখল। আমরা চারজন সিগারেট ফেলিনি। অন্য এক জন গিয়ে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলে দেওয়া মাত্র দুজন জার্মান যুবক রুমে প্রবেশ করল। দক্ষিণ আফ্রিকার যুবকটি জার্মান ভাষা বেশ বলতে পারত। সে-ই জিজ্ঞাসা করল যুবকদ্বয় কি চায়। জার্মান যুবকদ্বয় ঘরে সিগারেটের এত ধোঁয়া হবার কারণ জিজ্ঞাসা করল। ইতিমধ্যে একজন ইংলিশ যুবকের লুক্কায়িত সিগারেটের টুকরো থেকে পালকের লেপে আগুন ধরে গিয়েছিল। যুবক লাফিয়ে উঠল। জার্মান যুবকদ্বয় তাড়াতাড়ি ক'রে আগুন নিবিয়ে দিয়ে সেই যুবকটিকে বেশ করে কয়েকটা ঘুষি মেরে রুম থেকে সরিয়ে দিল। প্রহৃত যুবক অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে বললে তাকে আগামীকল্যই জার্মান ছেড়ে চলে যেতে হবে। সে কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করায় সবাইকে বলল চেকোশ্লোভাকিয়াই এখন তার গন্তব্য স্থান। সেখানে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না।

এই যুবকদের নিজের রুমে স্থান দিয়ে লজ্জিত হতে হয়েছিল। সেই-

জন্য আগামীকল্যই স্থান ত্যাগ করা ভাল হবে বলে ইয়ুথ্ লীগের সেক্রেটারির সঙ্গে পুনরায় অসময়ে দেখা করলাম। সেক্রেটারি বললেন, দৈনিক যদি তিন মার্ক ক'রে দিতে রাজী হই তবে তিনি শহরের মধ্যস্থলে কোনও প্রুশিয়ান্ রমণীর গৃহে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। আমি তাতেই রাজী হলাম।

পরদিন সকালবেলা ইয়ুথ্ লীগের সেক্রেটারির একখানা চিঠি নিয়ে প্রুশিয়ান্ রমণীর বাড়ির দিকে রওনা হলাম। তখনকার দিনে ড্রেস্‌ডেনে কুড়ি লক্ষ লোক বাস করত। এতেই বুঝতে পারা যায় ড্রেসডেন একটি বৃহৎ নগরী, এত বড় নগরীতে বাড়ি খুঁজে বের করা সহজ কাজ ছিল না। তবুও দুপুরের পূর্বেই যথাস্থানে পৌছতে পেরেছিলাম।

প্রশস্ত রাজপথের একপাশে প্রকাণ্ড বাড়ি। বাড়ির মালিক হলেন সেই প্রুশিয়ান্ মহিলা, তাঁকে খুঁজে বার করতে হয় নি। নিচেই বসে ছিলেন। চিঠিখানা তাঁর হাতে দেওয়ামাত্র পত্রখানা ভাল ক'রে পড়ে আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন এবং সুন্দর ও সজ্জিত একটি ঘরের দরজা খুলে দিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এ ঘরে থাকবে—বুঝলে ?

—হাঁ মেম, আপানার কথা বুঝতে পেরেছি।

—না বোঝনি, বলে আবার মহিলা আমার কাছে বললেন, ব'সো ত এই চেয়ারে। চেয়ারে বসবার পর একটু চেয়ে বললেন, তোমার দেশ কোথায় ?

—ইণ্ডিয়াতে, মেম।

—হাঁ তাই বল, তুমি ইন্দো-এরিয়ান, ব'সো, তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি। এই বলেই মহিলা চলে গেলেন। ইতিমধ্যে তার ঘরখানা ভাল ক'রে দেখে নিলাম। মহিলা আমার জন্য এক পেয়ালা

কফি, কিছু রুটি এবং মার্গেরেন (চর্বি) নিয়ে এলেন। অন্যান্য খাবার খেলাম কিন্তু মার্গেরেন খেলাম না।

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মার্গেরেন খেলে না যে ?'

—মার্গেরেন আমরা খাই না, আমরা মাখন খাই, মেম।

—মাখনের অভাবে কি কখনও মার্গেরেন খাও না ?

—কখনই না, মেম। এটা আমাদের অখাদ্য।

—তুমি কি বলতে চাও মার্গেরেন খাওয়া তোমাদের ধর্ম মতে নিষিদ্ধ ?

—না মেম, তবে কখনও খাই নি এবং বোধহয় কোনদিন খাবও না।

—সে জন্যই তোমার স্থান এখানে হয়েছে, আচ্ছা এর পরে কি খাবে।

—এই রুটি, মাখন, সব্জি, ভেড়ার মাংস, এসব।

—ভেড়ার মাংস বলছ, না ?

—হাঁ মেম।

—কেন গোমাংস খেলে ক্ষতি আছে ?

—কোন ক্ষতি নেই। তবে অভ্যাস নেই মেম।

—হাঁ বুঝতে পেরেছি, দ্রাবিড় রক্ত শরীরে রয়েছে, সে জন্যই গোমাংস খাবার অভ্যাস নেই। যাকৃগে তোমার জন্য কোন মাংসেরই ব্যবস্থা করব না।

অনেকে হয়ত বলতে পারেন, একজন জার্মান মহিলা আপনাকে তাচ্ছিল্য ক'রে কথা বললে, আর আপনি নীরবে সহ্য করলেন ? কথাটার উত্তরে বলছি, মায়ের জাত, যে কোন জাতের হউক, তাদের তাচ্ছিল্য-সূচক কথাও নীরবে সহ্য করব।

মহিলা চলে গেলে একটি সুন্দর ছবির দিকে দৃষ্টি পড়ল। ছবিটি ছিল একজন যুবতীর। যুবতী ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা। তার গলার মুক্তার হার কয়েক লক্ষ টাকার হবে বলে মনে হ'ল। অনেকক্ষণ

ছবিটি দেখে শুয়ে পড়লাম। দ্বিপ্রহরে প্রৌঢ়া এসে আমাকে জাগালেন। সেদিন আমার স্নানের দিন ছিল, সেজন্য প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্নান করতে পারব কি ?—কেন পারবে না, বাথরুমে গিয়ে স্নান ক'রে এস, কিন্তু মনে, রেখো স্নানের পর স্নানের টাবটি তোমাকেই পরিষ্কার করতে হবে, খবরদার কখনও অপরিষ্কার রেখে এসো না।—না মেম, তা কি কখনও হয়, বলেই স্নানাগারে প্রবেশ করলাম। পৃথিবীর অনেক স্থানেই অনেক রকমের স্নানাগার দেখেছি কিন্তু প্রুশিয়ান্‌দের মত সুন্দর স্নানাগাব আর কোথাও দেখি নি। স্নান করে বেশ আরাম পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু স্নানাগার পরিষ্কার করে রেখে আসতে ঘাম বের হযেছিল।

স্নান ক'রে এসেই বেশ ক'রে খেয়ে নিয়ে বের হতে যাব এমন সময় প্রৌঢ়া এসে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। প্রৌঢ়া বললেন, তিনি জাতে প্রুশিয়ান্‌, জার্মানদের মত ছোট লোক নন, হিটলার তার যথাসর্বস্ব হরণ করেছে। আজ তিনি আমার পরিত্যক্ত নোংরা বাসনগুলি পরিষ্কার করছেন। তাঁদের বংশের কেউ নাকি এমন ছোট কাজ করেনি। তাঁর ব্যাঙ্কে মস্ত বড় একাউণ্ট ছিল। টাঙ্গানো ছবিটা দেখিয়ে বললেন, এটা তাঁরই ছবি। তাঁর গলার হার নাৎসীরা কেড়ে নিয়েছে। এই যে এত বড় বাড়িটা এটাও তাঁরই। নাৎসীরা বাড়িভাড়া আদায় ক'রে তাঁরই নামে ব্যাঙ্কে ভাড়া জমা দেয় বটে কিন্তু তাঁকে এক পয়সা ওঠাতে দেয় না। মহিলা চীৎকার ক'রে বললেন, কত বড অন্যায ! তারপরই আবার বলতে আরম্ভ করলেন, অন্যায়ই বা বলি কি ক'রে ? পূর্বদিকে বল্‌শেভিক্‌রা জার্মানী আক্রমণ করার জন্য তৈরী হচ্ছে এবং পশ্চিমদিকে বৃটিশ এবং ফ্রান্সীরা আমাদের রক্ত মাংস চুষে খাচ্ছে। আমার ইচ্ছে ছিল আমেরিকায় গিয়ে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দিই, কিন্তু এখন আর সে সুযোগ পাব না। চারদিকে অরাজকতা আরম্ভ হয়েছে। সেক্‌সনী, চেক্‌

এবং অন্যান্য জাতের লোককে পিষে মারবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। তারপরই প্রৌঢ়া একদম সিংহীরূপ ধারণ ক'রে বললেন, এসব অপকর্মের পেছনে রয়েছে বৃটিশ। বৃটিশের সাহায্য পেয়েই হিটলার এত বড় হতে পেরেছে। আমার শরীরেও ইংলিশ রক্ত রয়েছে, কিন্তু তা হলে কি হয়, ইংলিশ জার্মানীর শত্রু পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। বৃদ্ধা আর কিছু না বলেই ঘর থেকে বের হয়ে ফের এসে বললেন, 'শোন, যখনই আমি তোমার ঘরে আসব তখনই তুমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াবে, দাঁড়িয়ে থাকবে, বুঝলে, নতুবা আমার দুঃখ হবে। আমি প্রুশিয়ান্ ঘরের মেয়ে হয়ে একা বৃটিশ প্রজার নোংরা বাসন পরিষ্কার করছি, সে আমাকে সম্মান দেখাবে না ত কে আমাকে সম্মান দেখাবে? বুঝলে, বুঝলে ত?'

—হাঁ মেম, বুঝতে পেরেছি।

স্ত্রীলোকটির মানসিক অবস্থা দেখে বাস্তবিকই দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু সান্ত্বনা দেবার মত কিছু ছিল না। তাঁর ঘরে আরও দুটো দিন ছিলাম দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে সম্মান দেখাতাম আর সেই সম্মানিত মহিলা সকাল-বেলা এসে যখন রাত্রের পরিত্যক্ত মূত্র পরিষ্কার করতেন তখন মুখ ফিরিয়ে হাসতাম। লণ্ডনে পৌছানোর পর বুঝতে পেরেছিলাম, আমার পক্ষে এরূপ ভাবে হাসা অন্যায় হয়েছিল। প্রুশিয়ান্ মহিলার উদ্ধত ভাবের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না, দায়ী ছিল প্রুশিয়ান্ সভ্যতা। আমাদের দেশেও সেরূপ উদ্ধত ভাব দেখা যায় এবং আমরা তা সহ্য করি।

ড্রেসডেন সেক্সনীরই একটা অংশ। ড্রেসডেন থেকে সেক্সনীদের প্রকৃত পক্ষে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে জার্মান কলোনী তৈরী হয়েছিল। সেক্-সনী, চেক্ এবং অন্যান্য জাতের লোক যখনই ড্রেসডেনে আসত তখনই তারা মনে করত এটা তাদের বিদেশ, কারণ তাদের নিজের জাতের লোককে ড্রেসডেন থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ড্রেসডেন ছাড়বার সময় এসেছিল। যে সকল ইংলিশ যুবক আমার সাহায্যে হিটলার ইয়ুথ লীগে স্থান পেয়েছিল তারা এসে আমার সঙ্গে কথা বলত। বাস্তবিকই তারা আমাকে আপনজন ভাবত। সন্ধ্যার সময় আমার রুমে এসে আমার শরীর ডলে দিত, পায়ে সাদা ক্রিম মাখিয়ে দিয়ে বলত, এখন পায়ের শক্তি বেড়েছে কি ? আমি তাদের ধন্যবাদ দিতাম।

ড্রেসডেন থেকে রওনা হবার দিন ইংলিশ যুবকগণ এসে আমাকে বিদায় দিল। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বার্লিনের দিকে সুন্দর পথটি ধরে অগ্রসর হলাম।